পরাজিত নায়ক

অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা·

পরাজিত নায়ক

বলিওয়াডা কান্তরাও

অনুবাদ
বোম্মানা বিশ্বনাথন

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

1990 (শক 1912)

মূল্য : 21·00 টাকা
Original Telugu Title : DAGA PADINA TAMMUDU
Bengali Translation : PARAJITO NAYAK
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, A-5 গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত।

ভূমিকা

যে আখ্যায়িকা কাব্যের বাঁধনে বাঁধা যায় না সাধারণত সেই ধরণের আখ্যায়িকা গদ্যে রচিত হয়ে কাহিনীর রূপ ধারণ করে। শুধু ছন্দই নয়, কয়েকটি আলঙ্কারিক শৈলী বিসর্জন দিয়েও চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে ঘটনার ইতিবৃত্তি পরিবেশিত হলে—তাকেই উপন্যাস বলা হয়। বিগত দিনের মানুষের জীবনের ঘটনাগুলি পড়ে অবকাশ বিনোদনের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে উপন্যাস।

স্বর্গত কোক্কণ্ড ভেঙ্কট রত্নম্ পাস্তলুর 'মহাশ্বেতা' (1864) ও গোপালকৃষ্ণ সেট্টির 'রঙ্গরাজু চরিত্র' (1872) সালে রচিত হলেও 'ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড' অবলম্বনে কান্দুকুরী বীরেশ লিঙ্গম্ পান্তলু রচিত 'রাজশেখর চরিত্রমু' (1878) কাহিনীটিই তেলুগু সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে ধরা হয়। এই উপন্যাসটিকে তৎকালীন সামাজিক জীবনের দূরবীক্ষণ যন্ত্রও বলা যেতে পারে। অন্ধ্রের সামাজিক উপন্যাসের জনক কান্দুকুরী বীরেশ লিঙ্গম্ প্রধানত মানবতাবাদী ছিলেন। অন্ধ্রদের সুপ্ত চৈতন্যের যে যে দিকগুলি গুড়িপাটি ভেঙ্কট চলম্ জাগ্রত করতে পারেন নি সেই সব দিক কান্দুকুরী বীরেশ লিঙ্গমু জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবার অন্ধ্রবাসীর হৃদয়তন্ত্রীর সুরের সঙ্গে যেখানে তিনি সুর মেলাতে পারেন নি সেখানে ইনি মেলাতে পেরেছেন।

রচনা শৈলীতে ও পরিবেশ রচনায় স্কট, মেডোস্টেলার ও ডিকেন্সকে ছাড়িয়ে গেছেন 'অন্ধ্রের স্কট' নামে খ্যাত লক্ষ্মী নরসিংহম্। তাঁর অবদানের ফলে অন্ধ্রের উপন্যাসে সংলাপ, নাটকীয়তা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কল্পনার বিস্তার, রহস্যসৃষ্টি, হাস্যপরিহাস প্রভৃতি তিনি উপন্যাসে আনয়ন করেছেন।

অপ্রকাশিত উপন্যাসের প্রকাশক 'অন্ধ্র প্রচারিণী গ্রন্থমালা' অপরাধ ও রহস্যধর্মী, সামাজিক, জীবনীভিত্তিক উপন্যাসও প্রকাশ করলেন। সেইভাবে ভোগরাজু নারায়ণ মূর্তির সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'বিমলাদেবী' প্রকাশ করলেন 'বিজ্ঞান চন্দ্রিকা মণ্ডলী'। তাঁরা আরও কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন।

'অস্তময়মু' 'আংগ্ল রাজ্যস্থাপনমু' 'ধরণীকোটা' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করে, 'ভোগরাজু অন্ধ্ররাষ্ট্রমু' নামে বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস রচনা করে যথেষ্ট যশলাভ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক প্রতিফলন যে কটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে পাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্মীরাজুর 'টিপ্পু সুলতানমু' 'ভেঙ্কটশাস্ত্রী'-কৃত 'রায়চুরু যুদ্ধামু' ; রাঘব চন্দ্রাইয়ার 'বিজয়নগর সাম্রাজ্যামু', শ্রীভেঙ্কট পার্বতীশ্বর কবিদ্বয়ের 'প্রমদাবনমু', পেলালসুব্বারাওয়ের 'রাণী সংযুক্তা' প্রভৃতি। সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের

মধ্যে বেঙ্কট পার্বতীশ্বর কবিদ্বয়ের রচিত মৌলিক চারটি উপন্যাসের মধ্যে 'মাতৃমন্দিরামু' উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রাক্‌গান্ধী যুগে রচিত উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ও মদ্য পানের সমস্যা। সংস্কারের বিরুদ্ধে তৎকালীন হরিজনদের সংগ্রাম, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অন্ধ্রদের মধ্যে যেসব সামাজিক সমস্যা ছিল সেই সব সমস্যার কিছুটা এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হওয়ায় তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের কদর কমে গেল। এই শতকে আধুনিক উপন্যাসের জন্মলগ্নে 'অন্ধ্র প্রচারিণী গ্রন্থমালা' 'বিজ্ঞান চন্দ্রিকা মণ্ডলী', 'বেগুচুক্ গ্রন্থমালা', 'সরস্বতী গ্রন্থমণ্ডলী', 'অন্ধ্র ভাষাভিবর্ধিনী সঙ্ঘমু', 'সাধনা সমিতি' প্রভৃতি প্রকাশক সংস্থা উপন্যাস-রচনা প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করেন। এ ছাড়া বাংলা ও কন্নড় ভাষা থেকে গল্প উপন্যাস বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অনূদিত হতে লাগল। মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতির ক্ষেত্রে পদার্পণের ফলে অন্ধ্রে তথাকথিত সাহিত্যধর্মী উপন্যাস ক্রমশ ক্ষীণ আকার ধারণ করতে থাকে।

বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের উপন্যাস 'একবীরা' তেলুগু উপন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা দিল। যেহেতু যুগটি ছিল তেলুগু উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম লগ্নের যুগ সেই হেতু এই উপন্যাসটিকে ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরা হয়েছিল। এই উপন্যাসটি প্রকাশের ফলে পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাসে দোষগুণ সম্পন্ন মানুষের চরিত্র স্থান পেয়েছে। তাদের প্রেম ভালবাসা চিত্রিত হয়েছে নির্ভীকভাবে বিভিন্ন কাহিনীতে।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় 'বন্দে মাতরম—এদেশ আমার'—এই রাজ-নৈতিক ধ্বনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলন তীব্র গতি পায়। এর ফলে আনুমানিক চার দশক ধরে অন্ধ্রের সাহিত্যে ক্রমাগত পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। সেই মহা উদ্যোগের ভগীরথগণের মেধা থেকে বহির্গত স্রোতস্বিনী ধারা প্রবাহিত হয়ে সেকালের অন্ধ্রের আন্দোলনের স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্ধ্রত্বকে অখণ্ড ভারতীয়ত্বের অভিমুখীন করে তাকে মহামানবের সাগরতীরে পৌঁছে দিয়েছিল। সেই ভগীরথদের মধ্যে গুরজাডা আপ্পারাও, রায়প্রোলু সুব্বারাও, বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। একদিকে দেশপ্রেম ও দেশভক্তি মূলক রচনা-সম্ভার যেমন প্রকাশিত হতে লাগল অন্য-দিকে সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনও উপন্যাস সাহিত্যে স্থান পেল।

সংস্কৃতির ধারা বহনকারী অন্ধ্রের প্রথম উপন্যাস হিসাবে নাম করা যায় 'ওয়েয়ি পডগলু।' এর হিন্দী রূপান্তরের নাম 'সহস্র ফণ।' রূপকধর্মী উপন্যাস হিসেবে এই সুবৃহৎ উপন্যাসের বিশিষ্ট স্থান আছে। উনিশ শতকের জীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকেই যেন ধরে রাখা হয়েছে 'ওয়েয়ি পডগলুতে'।

স্বর্গীয় অডিবি বাপীরাজুর উপন্যাস 'হিমবিন্দু' অন্য এক ধারার উপন্যাসের পথ খুলে দিল। এই উপন্যাসে ঐতিহ্যশালীধারা যেমন আছে তেমনি আছে চিত্রকলার প্রভাব। তাঁর রচিত 'নারায়ণ রাও' হল আধুনিক যুগের অন্ধ্রবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাক পর্বের কাল্পনিক চিত্রণ। বাপীরাজু তাঁর রচিত উপন্যাসের জন্য যেমন গদ্যকাব্যের

শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন তেমনি বিশ্বনাথ তাঁর রচনা শৈলীর জন্য ধর্মপ্রবক্তা—কাব্যশ্রেণী ভুক্ত হয়েছেন।

আজকের প্রগতিশীল সামাজিক জীবনের চিত্রশিল্পী হিসাবে উল্লেখযোগ্য উন্নব লক্ষ্মীনারায়ণের নাম। তাঁর 'মালাপল্লী উপন্যাসের জন্যই তাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য করা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণই প্রথম তাঁর উপন্যাসে লিখে জানালেন কি ভাবে উচ্চবর্ণের বা জাতির লোক হরিজনদের উপর অত্যাচার করে। এই উপন্যাসেই হরিজনদের আর্থিক জীবন ও অধিকারের প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। যাদের আছে তাদের সঙ্গে, যাদের নেই তাদের সম্পর্কে যে কি ধরণের তাও এই উপন্যাসে নিখুঁত ও নির্ভীকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক অসাম্যের জন্য যে বাদ প্রতিবাদ হয় তা নিখুঁত-ভাবে চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। যাই হোক, একালের উপন্যাসগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন 'একবীরা' 'ওয়েয়ি পড়গলু' 'নারায়ণ রাও' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম অন্ধ্রের আধুনিক উপন্যাসের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তেমনি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য 'মালাপল্লী' উপন্যাসের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষা হওয়ায় উপন্যাসের চরিত্রগুলি আরও বেশি করে জীবনধর্মী হয়ে উঠেছে।

এখানে 'চেলিয়ালিকাট্টা' সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামীর জীবনের সমস্যাবলী সম্বলিত এই উপন্যাস তেলুগু উপন্যাস সাহিত্যে পরিষ্কার দুটি ধারার সৃষ্টি করেছে। (১) সীতারামাইয়ার মত বিরুদ্ধ নায়ক (Anti Hero) সৃষ্ট হয়েছে। (২) রত্নাবলীর মত বুদ্ধিদীপ্ত নায়িকা সৃষ্টি করে বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ তথাকথিত নায়ক ও শৃঙ্গার সৃষ্টিকারিণী নায়িকা সৃষ্টির ঐতিহ্য বর্জন করেছেন। 'অসমর্থুনি জীবযাত্রা', 'অল্পজীবি' প্রভৃতি উপন্যাসে যে বিরুদ্ধ নায়কের বৃত্তান্ত (Anti Hero theme) পাই তার প্রেরণা কিন্তু বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ। তাঁর রচনাবলীতে কামশাস্ত্রের প্রয়োগ এমন মুন্সীয়ানার সঙ্গে ঘটেছে যা অন্য কারও রচনায় নজরে পড়ে না।

বিভিন্ন বিষয়ে বাদ প্রতিবাদের অবকাশ থাকলেও একটা বিষয়ে সবাই একমত যে শিল্প সম্মত সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা একালের উপন্যাসেই প্রতিফলিত হয়েছে। এরই বিকশিত রূপ বুচ্চিবাবুর 'চিবরকু মিগিলেদি' এবং শ্রীদেবীর 'কালাতীত ব্যক্তিলু' প্রভৃতি আত্মমুখীন উপন্যাসে দেখতে পাই মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। মনোবিজ্ঞানের আলোকে বিচার করলে উপন্যাসের তালিকাভুক্ত না করা গেলেও খাঁটি সামাজিক উপন্যাস হিসাবে কাহিনীর গঠন, চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতির বিচারে ত্রিপুরানেনি গোপি চন্দের 'অসমর্থুনী জীবযাত্রা' উপন্যাসের নাম উল্লেখ করতে হয়। এই উপন্যাসে শুধু যে বিবেকের প্রাধান্য আছে তাই নয় বৈষয়িক বিষয়ে (Materialism) ও দৈনন্দিন জীবনের পূর্ণ অপূর্ণতার দিকগুলোও অঙ্কিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে বলতে বক্তা কখনো সেই চরিত্রে নিজেকে লীন করে ফেলেছে আবার সেই চরিত্রই কখনো কখনো নিজের মধ্যে

লীন হয়ে অন্তের কথা বলেছে। 'অসমর্থুনী জীবযাত্রা'র নায়ক সীতারাম এই ভাবেই তাঁর সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গোপিচন্দের উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাঁর গল্প বলার চমৎকার ভঙ্গী। অপূর্ব শিল্প চাতুর্যের পরিচয় বহন করে তাঁর এই ভঙ্গী।

'চিবরকু মিগিলেদি' যেন মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের একটি স্মারক প্রস্তর। এর নায়ক হল তত্ত্বজ্ঞানী। কিন্তু যৌন জীবন সম্পর্কে তার তীব্র আকর্ষণ, সঙ্কীর্ণ ও সন্দিহান দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকার ফলে সে আত্ম বিশ্লেষণ করে নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উপন্যাসের শেষ পর্বে নারীর প্রতি দুর্বলতা দূর করে আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এগিয়ে গেল। সমাজকে পরিবর্তন করার আগে, এই নায়ক উপলব্ধি করে যে নিজেকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। উপন্যাসের নায়কের এই ধরণের মনোভাব সৃষ্ট হওয়ার ফলে এই দশকে সামাজিক উপন্যাস থেকে মনোবিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস রচনা সুরু হল। এই আলোকে বিচার করলে বীরেশ লিঙ্গম্ থেকে গোপিচন্দ বুচ্চিবাবু পর্যন্ত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা চলে এসেছে বলা চলে।

কাল্পনিক জীবন চিত্রণের পরে তেলুগু উপন্যাস সাহিত্যে প্রগতিশীল ধারা দেখা দিল। বিশ্বে প্রবাহিত মার্কসীয় অর্থনৈতিক চিন্তাধারার একটি ধারা অন্ধ্রেও প্রবাহিত হল। এই মতবাদের ভিত্তিতে রচিত হল কয়েকটি উপন্যাস। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বৈষম্যের প্রতি শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে কটাক্ষ করে 'কীলু বোম্মালু' নামক বুদ্ধিদীপ্ত উপন্যাস রচিত হল। এই উপন্যাসের রচয়িতা ডাঃ জি. ভি কৃষ্ণারাও। রাচাকোণ্ডা বিশ্বনাথ শাস্ত্রী ও বলিওয়াডা কান্তরাও রচিত যথাক্রমে 'অল্পজীবী' ও 'গোডামীদা বোম্মা' মূলত চরিত্র প্রধান উপন্যাস। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম হল 'বেদারিনা মানুষ্যুলু।' রচয়িতা কোডাওয়াটি গান্টি কুটুম্বরাও। এই সমস্ত উপন্যাসে তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক জীবনের প্রতিফলন গভীর ভাবে পড়েছে।

তেলেঙ্গানার ইতিহাসে নিজাম সরকারের শাসনকাল একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। সেখানকার নিজাম বিরোধী সংগ্রামী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে 'পুলুলা সত্যগ্রহামু', 'রথচক্রালু', 'ওনামালু', 'দাবানলম্', 'মৃত্যুঞ্জয়ুলু', 'সিংহগর্জনম্', 'কত্তুলা ওয়াত্তেনা', 'প্রজলামনিষি', 'যুগসন্ধি', 'ওয়েল্লাওয়ালো পূচিকা পুল্লালু', প্রভৃতি উপন্যাসে তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক জীবনকে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসগুলো পড়ার সময় রক্ত টগবগ করে ওঠে।

বিজ্ঞানের কাছ থেকে উপদেশের প্রত্যাশায় ছিল আধুনিক তেলুগু সাহিত্য। কিন্তু বিজ্ঞান তাকে আধ্যাত্মিক জীবন থেকে সরিয়ে কঠোর বাস্তবতার সামনে এনে ফেলেছে। ফলে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক জীবনের স্রোত ব্যাহত হয়েছে। তাই আজকের যুব জীবন নিয়ে উপন্যাসের নায়ক বেশিক্ষণ ভাবে বিভোর হয়ে থাকতে পারে না। বিশ্লেষণ করে। উপন্যাসে বিজ্ঞানের প্রভাব বা সামাজিক উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিনের

পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানের অবদানের ফলে প্রতিদিন আরও বেশি করে গল্প উপন্যাস মুদ্রিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদেই আকাশবাণীর মাধ্যমেও গল্প উপন্যাস প্রচারিত হচ্ছে।

বিবেক বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তিগ্রাহ্য উপন্যাস গত দশকের আগে ছিল না বলা চলে। তবু বুচ্চিবাবু, গোপিচন্দ, শ্রীদেবী এবং যশস্বী রাজকণ্ডা বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, জি. ভি. কৃষ্ণরাও প্রমুখ রচিত উপন্যাস যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য স্বীকার করতেই হবে।

শ্রীবলিওয়াডা কান্তরাও রচিত 'পুণ্যভূমিতে' (1969) মূলত ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁর 'গোডামীদাবোম্মা' ও 'দাগাপডিনাতাম্মুডু' সামাজিক জীবন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মনোবিশ্লেষণ এই 'ত্রিগুণ' সম্বলিত জীবনবোধের সত্যসন্ধানী উপন্যাস।

'গোডামীদাবোম্মা' উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের নাম ভদ্রম্। সে বদমেজাজী, কথায় কথায় তার রাগ। সে রঙ্গাইয়া নাইডুর একমাত্র ছেলে। নাইডুর বৌমার নাম পার্বতী। সেই পুণ্যবতীর ধারণা ছিল, স্ত্রী হল গৃহলক্ষ্মী। প্রশ্ন দেখা দিল নারীর কাছে পাতানো ভাই বড় না স্বামী বড়। সারা জীবন স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে শেষ জীবনে তার মনে সংশয় জেগেছিল। রাস্তার উপর কাঠ কয়লা দিয়ে লেখা ছবি দেখে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। পার্বতীর পাতানো ভাইয়ের নাম রামম্। পার্বতীর মুখ দেখে রামম্ বুঝতে পারে তার স্বামী ভদ্রম্ কি ধরণের অত্যাচার তার প্রতি করছে। রামমের শান্ত সৌম্য আচার আচরণ যে কি ভাবে ভদ্রমের উগ্র চরিত্রকে প্রভাবিত করল এবং কি ভাবে যে ভদ্রমের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন আনল—তাই এই উপন্যাসে চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামমের সুকৌশল চেষ্টায় রঙ্গাইয়ার শেষকৃত্য ভদ্রম্‌কে দিয়েই করানো গেল।

আনন্দ ও বিষাদের মধ্যে পার্বতীকে বাড়িতে পাঠিয়ে রামমের বাড়ি ছেড়ে পথে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হল। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন রঙ্গাইয়া। যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ রামমের চরিত্রটি সম্ভাবনাপূর্ণ। এই ধরণের চরিত্রের কাছ থেকে সমাজ সাহায্য পেয়ে থাকে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি যে ভাবে, যে ধরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে এবং যে মুন্সীয়ানার সঙ্গে লেখক চরিত্র-গুলিকে এনেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 'গোডামীদাবোম্মা' উপন্যাসটির পকেটবুক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে (1974)। পাঠকদের চাহিদার এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই উপন্যাসটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বাংলায় নাম রাখা হয়েছে 'দেয়ালের ছবি'। অনুবাদ করেছেন বোম্মানা বিশ্বনাথম্।

'ইদেম্বর্গম—ইদেনরকম'-নামক কান্তরাওয়ের আর একটি উপন্যাস (1974) প্রকাশিত হয়। ডাঃ আই. পাণ্ডুরঙ্গারাও এই উপন্যাসটিকে হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন। হিন্দী অনুবাদের নাম রাখা হয়েছে 'গিরা অনয়ন-নয়নবিনুবাণী' এই উপন্যাসটি জি.

সত্যরাও ইংরেজীতেও অনুবাদ করেছেন।

এই উপন্যাসের জন্মান্ধ চরিত্রটি হল কান্তম্। সে জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। সমাজের অত্যাচার সহ্য করেছে সারা জীবন ধরে। এই উপন্যাসটিকে উৎপীড়িতের গাথা হিসাবে উল্লেখ করা যায়। মুখ্য চরিত্রটি বার বার ব্যর্থ হয়েও নিরাশ হয়নি। তার এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে এই পৃথিবীতে তারও প্রয়োজন আছে। বুচ্চি এবং মঞ্জুলা এই উপন্যাসের দুটি বিশেষ চরিত্র। যারা বকে ঝকে, লোভ দেখিয়ে, বিরক্ত করে, ঘা মেরে মেরে, সাজিয়ে গুছিয়ে ও সেবা করে কান্তম্‌কে টেনে এনেছিল জগৎসংসারের সামনে। উপন্যাসের শেষ পর্বে কান্তমকে দেখতে পাই বিখ্যাত গায়ক হিসাবে। সে বিয়ে করল কল্যাণী নামে এক মূক মেয়েকে। তার মনটাই ছিল তার কাছে বিরাট সাম্রাজ্য। তার মন স্বর্গে বসে নরক দেখতে পায় আর নরকে বসে স্বর্গের সুখ খুঁজে পায়। উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

বলিওয়াডা কান্তরাও-এর 'প্রবাহম', 'ইদেদারি', 'পুণ্যভূমি', 'সম্পঙ্গি', 'নালুগু মঙ্গালু' প্রভৃতি উপন্যাস যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর 'পুণ্যভূমি' অন্ধ্রপ্রদেশের সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক 1972 সালে পুরস্কৃত হয়। তাঁর 'সম্পঙ্গি' উপন্যাসটির নাট্যরূপ আকাশবাণীর হায়দরাবাদ কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দাগাপডিনা তাম্মুড়ু' (পরাজিত নায়ক) উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ। উপন্যাসটির এই নামকরণের মূলে আছে শ্রী শ্রী রচিত 'মহাপ্রস্থানম্' কাব্য গ্রন্থের প্রভাব। শ্রীবলিওয়াডা কান্তরাও আদর্শ ও শুভবুদ্ধি জীবনের পর্বে পর্বে যে কি ভাবে বাধা পায় তা এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। জীবনের বাস্তব রূপ যে কত গভীর এবং নিবিড়ভাবে রূপায়িত করা যায়, জীবনকে কথা সাহিত্যে যে কত শিল্প সম্মত ভাবে চিত্রিত করা যায়, অভাবের চিত্র যে কত নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করা যায় তা এই উপন্যাসটি না পড়লে বোঝা যায় না। শহরের মুখোশপরা মানুষের সভ্যতা যে কি ভাবে গ্রামীণ পরিবেশকে দিনের পর দিন জটিল ও কলুষিত করছে, গ্রামের সহজ সরল মানুষের বাঁচার অনুপযোগী হয়ে উঠেছে তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। একালের সংকীর্ণ নীচ মনের লোকগুলো, রাজনীতির ক্ষেত্রে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করছে, তাদের কূট-কচালির ফলে গ্রামের সহজ সরল জীবন যে কি ভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছে তার নিখুঁত ছবি পাই এই উপন্যাসে। কৌশলীদের কাছে পরাজিত হয়ে গ্রামের মানুষ তার জাতিগত পেশা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। এদের কাছে পরাজিত হওয়ার ফলেই যে গ্রামের মানুষ নিজেদের জাত ব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে তা নিপুণ কথাশিল্পী কান্তরাও রচিত 'গোডামীদাবোম্মা', 'দাগাপডিনা তাম্মুডু' ও 'পুণ্যভূমি' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই অস্থির ভাঙ্গাগড়া যুগের জ্বলন্ত সাক্ষর হয়ে থাকবে এই তিনটি উপন্যাস। মদ্যপান প্রভৃতি বদ অভ্যাসগুলো যে শুধু আইন করে বন্ধ করা যায় না তা তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই সব বিষয় নিয়ে রচিত

তাঁর 'দোঙ্গালু' নামক গল্পে। যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে এই গল্পটি।

শিল্প ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ 1945 সালের শেষ ভাগে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ অন্ধ্রের গ্রামের মানুষের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তারই ইতিবৃত্তি 'দাগাপডিনা তাম্মুড়ু' (পরাজিত নায়ক)-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই উপন্যাসের নায়ক পুল্লাইয়া সকলের স্নেহ ভালবাসা পেয়ে অনুকূল পরিবেশে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু তাকেই একদিন গ্রামের নীচ কুৎসিৎ রাজনৈতিক অবস্থার বলি হতে হল। চাষী পুল্লাইয়া চাইত পরিশ্রম করে ন্যায়ের পথে চলতে। শুধু পরিশ্রম করার গতর ও ন্যায়ের পথে চলার ইচ্ছা নিয়ে আমাদের দেশে চলার পথ যে নেই তা এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। পুল্লাইয়ার পরিণতি আমাদের মনকে স্তিমিত করে দেয়। সততার পরাজয় চিহ্নিত করে। ফলে মনকে প্রভাবিত করে বিষণ্ণতা ও অসাফল্যের ব্যর্থতা। সৎ পুল্লাইয়াকে গ্রামের মোড়ল, মহাজন ও নাইড়ুদের চক্রান্তের ফলে প্রায় ভিক্ষুকে পরিণত হতে হল। সাধারণ চাষীকে যে কতখানি নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রইল পুল্লাইয়া। গ্রামের কঠোর ও কুটিল রাজনীতিবিদদের নিখুঁত চিত্রণ পাই এই উপন্যাসে।

আমাদের শরীর পঞ্চভূতের আধার। এই পঞ্চভূতকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সকলের। একটি শরীরকে শেষ করা যায় কিন্তু জগৎ সংসার থেকে পঞ্চভূতের অস্তিত্বকে শেষ করা যায় না। কাহিনীর শেষের দিকে পুল্লাইয়াকে একটি চোর এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলেছিল। বর্তমান ঔপন্যাসিকও এই পঞ্চভূতের বিষয় বিশ্বাস করেন। এবং বিশ্বাস করেন বলেই তাঁর এই মনোভাব বার বার ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কথা সাহিত্যে। যে কোন সাহিত্যের নৈতিক দিক হল তার মেরুদণ্ড। এটা ভুলে যাওয়ার নয়। কান্তরাও তা মনে রাখেন। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল অস্থির অর্থনৈতিক পটভূমিকায় সৃষ্ট রাজনৈতিক অবস্থার শিকার হল এই উপন্যাসের নায়ক পুল্লাইয়া।

মানুষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি ও দরদ কান্তরাওয়ের রচনার ছত্রে ছত্রে স্বতন্ত্র সত্ত্বায় চিহ্নিত। এই দরদ দিয়েই তিনি পুল্লাইয়ার চরিত্রটি অঙ্কিত করেছেন। বিশেষ অবস্থায় পড়ে পুল্লাইয়ার মত চরিত্র যে প্রকৃতি এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় সেটাই সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

কাহিনীর শুরুতে পুল্লাইয়াকে দেখে মনে হয় সে যেন নদীর অপ্রতিরোধ্য জোয়ার আর নীলি যেন সেই নদীর তটভূমি। কাহিনীর গোড়ায় যে পুল্লাইয়া ছিল সিংহশাবকের মত তেজী, অন্তে তাকে দেখতে পাই ছাগল ছানার মত। কৃষক কন্যা নীলিকে পরিণতিতে দেবকন্যা রূপে দেখতে পাই। উৎসাহী পুল্লাইয়াকে অন্তে পাই নিরুৎসাহী ব্যর্থ নায়ক হিসাবে। প্রবহমান নদীর জলের মত যে নীতিকে কাহিনীর গোড়ায় দেখতে পেয়েছি অন্তে তাকে পাই জলভরা কলসীর মত জুবুথুবু। বিবাহিত জীবনে নীলি ও পুল্লাইয়া একে অন্যের দুঃখ বুঝত, একে অন্যের অভাব পূরণ করত। লেখাপড়া-

না-জানা সংস্কারাচ্ছন্ন নীলি মৃদুভাষিণী। তার মন মানবদরদী। এই উপন্যাসের আগাগোড়া সজীব পাত্রী হল নীলি। সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হল এই নীলি।

চাষের কাজ করে, শীতের ঠাণ্ডা সহ্য করে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পারিবারিক জীবনযাপন করে পুল্লাইয়া চেয়েছিল রাজপুত্রের মত একটি ছেলের বাবা হতে। সে চেয়েছিল তার ছেলে যেন চোর ধরার মত সৎ ক্ষমতাবান ছেলে হয়। পুল্লাইয়া বাপের নামে ছেলের নাম রেখেছিল মল্লু।

জীবনের উন্নতি ইচ্ছে মত হয় না। মনের বাসনা বারে বারে বাধা পায়। পুল্লাইয়ার জীবনে বারে বারে এই বাধা তাকে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে তার দ্বন্দ্ব সম্বলিত ইতিহাস। দুষ্ট ও কুচক্রী রাজনীতিবিদরা নির্মল গ্রামীণ জীবনকে করেছে কলুষিত। গ্রামের যেদিকে তাকাই দুর্ভিক্ষ, অভাব, নিপীড়ন, দুর্মূল্যতা। দেশ শাসনকারী সরকার এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সরকার ধান সংগ্রহ করে, গ্রামে ধান ভাঙ্গার মেশিন বসায়। হোটেল, রেষ্টুরেন্ট গ্রামে গড়ে ওঠে। চোরাপথে মদ বিক্রি হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে নবিরি গ্রামেও এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকে। গায়েগতরে খেটে যে পুল্লাইয়া রোজগার করতে চায়, বাঁচতে চায় সে এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে নি। জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে সে বলে ওঠে, 'এই যুগ ন্যায়ের যুগ নয়, টাকা পয়সা যাদের আছে তারাই সম্মান পায়।'

ঘরদোর যা কিছু ছিল সব বিক্রী করে পুল্লাইয়া পথে পা বাড়াল। শহরের দিকে তাকে পা বাড়াতে হল। শহরে এসে পরিবারের লোকজনের পেট ভরানোর জন্য তাকে চোর হতে হল। যে ছেলে তার কাছছাড়া হত না কখনো, যে ছেলেকে সে চেয়েছিল চোর ধরার মত ছেলে হিসেবে সেই ছেলের সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতেই পুল্লাইয়াকে চোর হিসাবে ধরা পড়তে হল। ছেলের মাধ্যমে পুল্লাইয়ার ইচ্ছা পূরণ হল বটে কিন্তু তার জন্য তাকেই প্রথম মূল্য দিতে হল।

শহরের দিকে পা রাখাই পুল্লাইয়ার মস্ত বড ভুল হতে পারে, আবার শহরে পা রাখার ফলেই হয়তো তার পরিণতি অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। নবিরি গ্রামের দেবীর নাম নীলাম্মা। ঐ দেবীর নামেই এই উপন্যাসের নায়িকার নাম হল নীলি। নীলাম্মার মন্দিরের সঙ্গে নীলির জীবনের মিল আছে। নীলি শান্ত স্নিগ্ধ এমন কি প্রতিকূল পরিবেশেও ধৈর্যশীলা হওয়ায় সে যেন মহাকাব্যের নায়িকা হয়ে উঠেছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও সে পাথরের প্রতিমার মত স্থির ও অচঞ্চল। স্বামীর জেলে যাওয়ার পরেও সে তার নীতিতে অটল ছিল। তার পরের চরম কষ্টের দিনেও নীলি সহনশীলতা হারিয়ে ফেলেনি। তার মতে সূর্য-চন্দ্রের মত ভাল মন্দও চিরকাল থাকবে।

স্বামী যখন জেলের কয়েদ ঘরে ছিল বাচ্চাদের পেটে তখন ফ্যানও জোটেনি।

নীলির গর্ভে ছিল শিশুর অস্তিত্ব। কোথাও মাথা গোঁজার ছাউনি ছিল না। সহানুভূতি তাকে কেউ দেখায় নি। যে নীলি সারাজীবন অন্যকে যথাসাধ্য দিয়ে গেছে, যে জীবনে কারও কাছে হাত পেতে কিছু চেয়ে নেয় নি, পরিণতিতে সেই নীলি বাধ্য হল ভিক্ষে করতে। এখন এর জন্য দায়ী কে? আমরা? আমাদের সমাজ? আমাদের পেশা? আমাদের ক্ষুধা? আমাদের লজ্জা? যে আইন এক মুঠো ভাত চুরি করলেও শাস্তি দেয় সেই আইনের চোখে ধুলো দিয়ে হাজার মুঠো চাল যারা চুরি করে তারাই সমাজের মাথা হয়ে, নেতা সেজে, আরাধ্য হচ্ছে। দায়ী কি আমাদের আইন? বহু ঢাক ঢোল পিটিয়ে তৈরি করা আমাদের সংবিধান কি দায়ী? কে দায়ী? কাকে প্রশ্ন করা যায়?

অন্ধ্রদেশের ঘটনা সম্বলিত এই উপন্যাসের চরিত্রের নাম পাল্টে দিলে এই কাহিনী ভারতের যে কোন প্রান্তেরই কাহিনী হতে পারে।

এই কাহিনীতে বর্ণিত দুটি দলের মধ্যে একটি দল ঘোষণা করছে যে আমরা প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, অন্য দলের মত হল স্বার্থপর লোকগুলো আমাদের দেশকে কুরে কুরে শেষ করে দিচ্ছে। পুল্লাইয়া এক সময় নিজের গ্রামের লোককে ভয় পায়নি। সেই নির্ভীকতা তার ছিল এক ধরণের সত্যাগ্রহ। তখন পশু শক্তির উপর নৈতিক শক্তির জয় ঘোষিত হয়েছিল। এই নৈতিক শক্তির জয়গান আমরা দেখতে পাই কান্তরাওয়ের প্রতিটি লেখায়।

গুড্ডিভেঙ্কাম্মা, রাজু, সুরাম্মা, আদেম্মা, চন্দ্রাইয়া পিসা, বঙ্গারাইয়া (সোনাবাবু) প্রভৃতি চরিত্রগুলো সজীব ও সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। শ্রীকাকুলমের গ্রামীণ জীবনের একটি পূর্ণ চিত্র সুন্দর ভাবে এতে অঙ্কিত হয়েছে। তার ফলে এই উপন্যাসে অন্ধ্রের যে কোন গ্রামের চিত্র যেন পেয়ে যাই। এই উপন্যাসের জন্য অন্ধ্রের গ্রামের মানুষ নিঃসন্দেহে কান্তরাওয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

উপরে উল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের অনেকেই সেকালের। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ জগতে নেই। ফিরে আসবেনও না। তবে বহু নতুন ঔপন্যাসিক আছেন যাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অসীম। 'ত্রাগুবোতু' উপন্যাসের রচয়িতা শ্রীনাগরাজুর নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

চীন ও পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের পরবর্তীকালে (1969 ও 1972) স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্ররাজ্য গঠনের পটভূমিকায় এখনও কোন উপন্যাস রচিত হয়নি। যে কোন যুদ্ধ বা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তাড়াতাড়ি কবিতা লেখা যায় কিন্তু উপন্যাস লেখা যায় না। সংক্ষেপে বলা যায় যে গত তিন দশকের মধ্যে তেলুগু উপন্যাস-সাহিত্য-নদীর প্রবাহে তেমন গতি নেই। নেই কোন জোয়ার। এই নদীতে চড়া পড়ে গেছে। তারই ফলে বর্তমানে অসংখ্য উপন্যাস প্রকাশিত হলেও 'দাগাপড়িনা তাম্মুড়ু' বা 'পরাজিত নায়ক'-এর মত উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে না। পাঠক চায় ঘটনা, শিল্প প্রয়োগের সাধনা যেন তার কাছে তত গ্রহণ যোগ্য নয়। এই শ্রেণীর পাঠকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে

লেখকদের সাধনা কমে গেছে। তাঁদের অলসতা গেছে বেড়ে। তা সত্ত্বেও কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে যে গুলির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি। কয়েকজন লেখিকাও জীবনধর্মী সাহিত্য রচনার কাজে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

নারী যে তার সমস্যার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে তার সাক্ষ্য বহন করছে, 'বলিপীঠম', 'সমতা', 'মাত্রিমনিষী' প্রভৃতি উপন্যাস। এগুলি মহিলা সাহিত্যিকদের রচনা। এটা সত্য যে ইদানীংকালের লেখিকাগণ ব্যক্তিগত আশাআকাঙ্ক্ষা, সাংসারিক জীবনের ঝগড়াঝাঁটি, দৈহিক কামনা বাসনা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই মূলত বেশি সংখ্যক লেখা লিখছেন। সবগুলিকেই যে প্রথম সারির বলা চলে তা নয়। রুশ সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের লেখক লেখিকারাও বিশেষ অঞ্চলের সীমিত সীমার মধ্যে নিজেদের উপন্যাস (Relay Novels) রচনা করছেন। এ সব লেখাগুলো এমন কি চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হচ্ছে।

মোট কথা, তেলুগু উপন্যাস ও তার গতি প্রকৃতির ভবিষ্যৎ উজ্জল। এক কথায় বলতে গেলে, শ্রীবলিওয়াডা কান্তরাও রচিত উপন্যাসগুলির আলোক রশ্মির ছটায় অন্ধ্রের উপন্যাসের বিকাশ দ্রুততর হতে পারে।

বি. ভি. কুটুম্বরাও

কোন এক সভ্য শিক্ষিত মানুষ জাপানের হিরোসিমা শহরের নাইকুণ্ডলের উপর যেদিন এ্যাটমবোমা ফেলেছিল, ঠিক সেই দিন রাত্রেই অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরে বংশধারা নদী-তীরের নবিরি গ্রামে কোন এক গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষ পনেরশো পল্লীবাসিদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

সেই লোকটির শিক্ষা এ্যাটমবোমাটিকে কোন এক সমুদ্রের মাঝখানে না ফেলে, দু'লক্ষ ষাট হাজার মানুষকে মেরে ফেলে, এক লক্ষ তেষট্টি হাজার মানুষকে আহত করে, তিন হাজার তিনশ একর আবাদী জমি ধ্বংস করে, চৌষট্টি হাজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে ছিল।

নবিরি গ্রামের সেই অশিক্ষিত লোকটি পনেরশো মানুষের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, যে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল, তার ভরসা ছিল সেই গ্রামেরই দেবী নীলাম্মা। তারই ফলে একদিন সমস্ত গ্রামের মানুষকে এই দেবীর পূজা ও উৎসবে মিলিত করতে পেরেছিল।

বংশধারা নদী-তীরের গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত নীলাম্মার মন্দিরে সেদিন রাত্রে রামুভগত ঘন ঘন মাথা নাড়াচ্ছিল। তার উপর নীলাম্মা ভর করার ফলে শুধু যে সে মাথা নাড়াচ্ছিল তাই নয়, গগনভেদী চিৎকারও করছিল।

লোকটার নাক চ্যাপ্টা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, না আঁচড়ানো এলোমেলো চুল, শিংএর মত বাঁকানো কাঁচাপাকা গোঁফ, তোবড়ানো মুখ, কালো ছিপছিপে চেহারা। পরনে এক চিলতে কাপড় ছাড়া অন্য কিছু তার গায়ে ছিল না। গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাদের অনেকেই তার সামনে মাথা নত করল, বেশ কিছু লোক দেবী ভর করা রামুর পায়ে মাথা ঠেকাল। "হায় হায় মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে!" বলে বিড়বিড় করে দুঃখ করছিল আরও কয়েকজন।

যারা তার পায়ে পড়েছিল রামু তাদের ভালভাবেই চেনে। এই রামুই হল সেই রাম যে এক সময় 'রাম-নাপিত' নামে পরিচিত ছিল। ছেলে বড় হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে তার চামড়ার ব্যাগ নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্ষৌর কর্ম করত। ছেলে বড় হয়ে কিন্তু তার মত চুল কাটা দাড়ি কামানো শিখল না। "আমার ছেলে শহুরে বাবুদের চুল কাটবে।" গর্ব করে রাম বলে বেড়াত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে গ্রামের মোড়লের সঙ্গে ঘুরে কলাটা, মুলোটা জোগাড় করতে পারত।

একবার মোড়লের বাড়িতে নতুন রেভেনিউ ইনস্পেক্টর এসেছিল। এর আগে সে

বহু লোকের পা টিপে দিয়েছিল, গায়ে হলুদ আর সরষে বাটা মাখিয়েছিল, মাথায় তেল দিয়ে মর্দনও করেছিল। ঐ ইনস্‌পেক্টরের আসার আগেও সে ভেবেছিল এইভাবে ক্ষৌরকর্ম করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু সেই ইনস্‌পেক্টর আসার পর থেকে তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। যেন নতুন গ্রহের উৎপাত শুরু হল। সেদিন তার গায়ে জ্বর ছিল। "ব্যাটা পা টিপে দিতে বললাম, টিপে দিচ্ছিস না কেন?" বলে ইনস্‌পেক্টর লম্ফ ঝম্ফ শুরু করে দিল। জোড় হাত করে, রামু বারবার ইনসপেক্টরকে নিজের শরীরের অবস্থা যে খারাপ তা সবিনয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল। ইনস্‌পেক্টর আরও গলা তুলে বলল, "তোমার এসব ভড়ং; আমি তোমাকে সোজা জেলে পুরে দেব।" অগত্যা রামু তার পায়ে হাত দিল। পায়ে হাত দিল বটে কিন্তু তার বুকে আগুন জ্বলে উঠল।

সেই মুহূর্ত থেকেই তার মধ্যে কেমন যেন বৈরাগ্য ভাব দেখা দিল। সে নীলাম্মার মন্দিরের কাছে বসে পড়ল। শুধু একবার যদি ঐ বড় কর্তার উপরে লাঠি ঘোরানোর মত ক্ষমতা পেত তাহলে খুব ভাল হত। ওকে বলা যেত, পায়ে ধর।...এত কষ্ট করলাম কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে একটা পয়সাও দিল না। বড় একটা কিছু হয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুরে মন্দিরের দিকে মুখ করে দুটো হাত উপরের দিকে তুলে, "মা, নীলাম্মা, মাগো আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে মা, আমার কষ্ট বুঝে আমাকে দয়া কর মা! এই নাপিত রামুর কথা মনে রেখো মা!" এইভাবে বলল বটে কিন্তু কি যে তার চাই তা সে বলতে ভুলে গেল।

মন্দিরের দেয়াল দেখে মনে হয় না যে কোন দিন তার গায়ে চুনকালি পড়েছে। মন্দিরের দ্বার পাথরে গড়া। কিন্তু তার কোন দরজা নেই। ভেতরে একটা বেদীর উপর চারটে কাঠের বিগ্রহ ছিল। মাঝখানের দুটির মধ্যে একটি হল নীলাম্মা, দ্বিতীয়টি নীলাম্মার দাদা এয়ারব্রান্নার, বাকি দুই প্রান্তের দুটি নীলাম্মার দিদি ও বোনের। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে প্রায় প্রত্যেকে একবার নমস্কার করে যেত। সেই দেবীকে পূজো করার ধরা বাঁধা কোন নিয়ম ছিল না। রামের বাবাও জানত না কে সেই মন্দির গড়ে তুলেছিল। তবে তার বাবা নীলাম্মা দেবীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করত। রামুর মনে অবশ্য এসব ছিল না।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে মন্দিরের অবস্থা দেখে, রামুর মনে করুণা জাগল। নীলাম্মার মন্দিরটা কি বিশ্রী দেখাচ্ছে! ধুলোতে মন্দিরের ভেতরটা ভরে রয়েছে। মাকড়সার জাল, ঝুল। রামু তাড়াতাড়ি বাড়ি গেল। ঝাঁটা এনে মন্দিরের মেজেটা পরিষ্কার করল। ঝুল ঝাড়ল। তারপর সে ভাবল, "মূর্তিগুলোতে রং লাগালে মন্দ হয় না। মন্দিরটা একটু চুণকাম করা দরকার। নীলাম্মা দেবীর যে পুজোর কোন নিয়ম টিয়ম নেই। বিশেষ বিশেষ দিনে পুজো হলে, পুজোর বাঁধাধরা নিয়ম থাকলে গোটা গ্রাম গমগম করত। এসব যদি শুরু করতে পারতাম বেশ হত। কিন্তু আমার কাছে অত

টাকা কোথায় ? বাড়ি বাড়ি ঘুরে যা কাজ হয় তাতে তো ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। গাঁয়ের লোককে নীলাম্মার উৎসবের কথা বললে কেমন হয় ?"...যা ভেবেছিল তা দু চার জনের কাছে প্রকাশ করল। কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। ঠাট্টা করে ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিল অনেকে। কেউ বলল, "বাপঠাকুর্দার আমল থেকে যা কোনদিন হয়নি তা আমাদের আমল থেকে শুরু করলে না জানি কি হবে। দেবী চটে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।" এক বুড়ি বলল, "দেবীর নামে কেবল মানত রাখা হয় এই তো এতদিন শুনে আসছি। নতুন করে পুজো টুজো করার কথা তো কোনদিন শুনিনি। এসব করলে দেবী নীলাম্মা চটে যেতে পারেন।"

এসব কথা রামের ভাল লাগল না। দেখতে দেখতে নীলাম্মার প্রতি কিন্তু রামের ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়েই যেতে লাগল। এক একদিন সে অনেক রাত পর্যন্ত ঐ মন্দিরে বসে থাকত। কোন কোনদিন দেবীর সামনে ছোট প্রদীপ ধরিয়ে হাত জোড় করে বসে থাকত। মাঝে দুদিন ইনস্পেক্টর এসেছিল। কিন্তু রামকে পা টিপতে বলেনি। তার ফিরে যাওয়ার পর রাম মনে মনে বলল, "মা, নীলাম্মা তাহলে আমার দুঃখ বুঝেছেন।"

দেখতে দেখতে রামের দাড়ি বেড়ে গেল। তার চোখে এক আশ্চর্য ঘোর লেগে রইল। প্রত্যেকদিন ভোরে নদীতে একটা ডুব দিয়ে সোজা নীলাম্মার মন্দিরে চলে আসত। সে যে ভাষায় পারত সেই ভাষায় নীলাম্মার সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করত। মাঝে মধ্যে কেউ তাকে চুলকাটা বা দাড়ি কামানোর জন্য ডাকলে সে বলতো তার সেদিন ব্রত আছে। ব্রতের দিন ক্ষুর কাঁচি ধরলে নীলাম্মা দেবী রাগ করবেন।" দু তিন বার মনে মনে বলে দু চার দিন পরেই প্রকাশ্যে বলা শুরু করে দিল। পাশের গ্রামের একটা লোকের উপর প্রায়ই কোন না কোন দেব দেবী ভর করত। রামু তার কাছে গিয়ে ভর করার পর সে কি করে তা ভাল করে দেখে নিল। মন্দিরের ভেতরে একা একা সে অভ্যেস করল। শুধু অঙ্গভঙ্গি নয়, কণ্ঠস্বরের ওঠা নামাও চর্চা করল।

হঠাৎ একদিন সকালে গ্রামের সবাই জানতে পারল নাপিত রামের উপর নীলাম্মা দেবী ভর করেছে। যাদের মাথার চুল অর্ধেক ঝরে গেছে তারাও হাঁ করে রামের দিকে তাকিয়ে নিল। কেউ কেউ বলাবলি করল, "আমি তো দেখেছি, আজ দু'তিন মাস রাম মন্দিরেই পড়ে আছে। টানা মায়ের ধ্যান করে যাচ্ছে। এত করলে ভর করবে না! ধন্য রামু।"

এই ভাবে দিনের পর দিন রামের ভক্তি বেড়ে যেতে লাগল। ভর করার পর যা করতে হয় তা সে আরও নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে লাগল। যা যা সে চেয়েছিল সবই হল। মূর্তিগুলোতে রং লাগাল। মন্দিরের গায়ে চূণকাম হল। দেবীর জন্য সিংহাসন তৈরি হল। এছাড়া গাঁয়ের সবাই জানল, 'নাপিত রাম' নীলাম্মার সেবক হয়েছে। শুধু তাই নয়, নীলাম্মা দেবীর দিকে লোকে যে ভাবে ভক্তি ভরে তাকাত সে ভাবেই রামুর দিকেও

তাকাতে লাগল। তাকে 'নাপতে রাম' না বলে রামু বলা শুরু করে দিল। ঐ রেভেনিউ ইনস্পেক্টর পা টিপে দেবার জন্য ডেকে পাঠালে সে "যাব না" বলে পাল্টা জবাব পাঠিয়ে দিল। তারপর ইনস্পেক্টর গর্জে উঠেছিল, "রামুকে দিয়ে পা টেপাতে বাধ্য করব!" কিন্তু গ্রামবাসীদের বারণ শুনে তাকে নিরস্ত হতে হল। এখন রামু ঐ গ্রামের সকলের কাছে সম্মানিত ও পূজনীয় হয়ে দাঁড়াল।

গ্রামবাসীদের মনে এরকম একটা স্থান করে নেওয়ার পর আশেপাশের গ্রামের কলেরা লেগেছে শুনে রামু তার সুযোগ নিল। হঠাৎ সেদিন সবাই তার গলা শুনতে পেল। সে কি গলা! একেবারে গগনভেদী গলা!

মন্দিরে প্রদীপ জ্বলছিল। সে ছোট্ট থালায় ধূপ ধুনো দিয়ে রেখেছিল। মন্দিরে মহাজন, মোড়ল এবং কয়েকজন নামকরা চাষী এসেছিল। মন্দিরের বাইরে বহু লোক চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। যে রামু চোখ বুজে নীলাম্মার সামনে বসেছিল সে, "উ-উ-উ" করে নাকে দীর্ঘ শব্দ করে উঠল। এতক্ষণ সে গম্ভীর হয়ে বসেছিল। তারপর সে কি বীভৎস রূপ তার। সমস্ত দেহের আড়মোড়গুলো ভাঙতে ভাঙতে সে জোরে "উ-উ-উ" বলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যারা সেখানে ছিল তারা বলে উঠল, "কে? কে তুমি?" তাদের প্রশ্নের জবাবে টান দিয়ে জোরে জোরে রামু বলল, "ওরে বোকা ছেলেরা, গ্রামের দেবী চলে যাচ্ছেন। ভূত পেত্নীগুলো এঁকে বিরক্ত করছে। ওদের দাপাদাপি শুরু হয়েছে। আমি একা এই গ্রামকে কতদিন পাহারা দেব। উ-উ-উ। ভূত পেত্নীগুলো গোটা গ্রামটাকে গ্রাস করতে চাইছে! ওরে বোকা ছেলেরা, আমি যে আর পাহারা দিতে পারছি না। সাবধান! সাবধান না হলে গোটা গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে। ওরা গিলে খাবে। ছেলেরা তোরা খুব সাবধান!"

হাতীর মত বিশালদেহী মোড়ল রামুর পায়ে পড়ে বলল, "মা, মাগো, তুমি তো গোটা গাঁটাকে পাহারা দাও। তুমি পাহারা না দিলে আর কে দেবে মা?"

রামুর গলা আবার গগনভেদী হল, "ওরে পাগল, আমি যদি চাই এই ভূমণ্ডল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, দিন রাত হয়ে যাবে!"

"সত্যি হবে, মা! সত্যি হবে! তুমি তোমার এই সন্তানদের রক্ষা কর মা!" বুড়ো মোড়ল তার পায়ে পড়ে বলতে লাগল।

রামু হেসে বলল, "ওরে পাগল, আমি আমার ছেলেদের রক্ষার জন্যই তো পাগল। তোরাই তো সব। তোদের গায়ে একটি মাছি বসলে আমার শরীর রাগে ফুলতে থাকে। তোদের একটি পিঁপড়ে কামড়ালে আমি কষ্ট পাই। পাশে ছোট ভাই এয়াব্রান্না আছে। দিদি বোনদের ও একটি মাত্র ভাই। যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই খেয়ে ফেলতে চায়। আমার জন্য নয়রে বাবা! অন্তত এয়াব্রান্নার···অনেক-দিন সহ্য করেছে। আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি···গাঁয়ের লোক নানান কাজে ব্যস্ত আছে। কিন্তু আর তো পারছি না! ঘটা করে একটা পুজোর ব্যবস্থা কর, উৎসব

কর। তা যদি করিস তবেই তো এই এয়ারুরান্নার সাহায্যে আমি ভূত-পেত্নীদের তাড়াতে পারব। পাগল ছেলেরা আমার দেরি করিস না বাবা···ঘটা করে পুজো দে··· উৎসব কর।"

টেনে টেনে সুর করে রামু জোরে জোরে বলে যেতে লাগল। ও যতক্ষণ বলছিল ততক্ষণ সবাই কানখাড়া করে শুনছিল। একটি কথা বলারও কারও সাহস ছিল না। কাঠ হয়ে ভয়ে ভয়ে রামু যা বলছিল, তাই ওরা শুনছিল। নীলাম্মা দেবী তাহলে স্বয়ং দুর্গা। এই গ্রামটাকে তিনিই পাহারা দিচ্ছেন। সবাই একবাক্যে ঠিক করল, ঘটা করে পুজো করতে হবে, উৎসব করতে হবে। মোড়ল মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলল, "আগামী গৌরী পূর্ণিমার দিন, ছোট বড সবাই মিলে মা নীলাম্মা দেবীর উৎসব করতে হবে।"

"হোক হোক, তাই হোক।" সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

দুই

গৌরী পূর্ণিমার দিন এগিয়ে এল। গ্রামবাসীদের মধ্যে সে কি উন্মাদনা। পূর্ণিমার পাঁচদিন বাকি থাকতে ছোট ছোট তালপাতার চুবড়িতে বালি দিয়ে পাঁচ'ছ রকমের গোটা ডাল ছড়িয়ে ছায়ায় ওরা রেখে ছিল। গোটা ডাল থেকে গজিয়ে উঠল চারা গাছ। দিনের দিন মেয়েরা উপোস করল। খোঁপায় ঐ চারাগাছ গুঁজে নিল।

সন্ধ্যার সময় রামু মন্দিরের দরজায় দাঁড়াল। তার চাউনিতে খুশী খুশী ভাব। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস ছিল। আবহাওয়া ছিল চমৎকার।

মুখে পুরু করে হলুদ মেখে কলসীতে হলুদ গোলা জল নিয়ে মেয়েরা সার বেঁধে তালে তালে হেঁটে রামুর কাছে এসে তার পায়ে ঢালছিল।

ঐ হলুদ গোলা জল (মুরুরাটা) ঢেলে পায়ে দু হাত দিয়ে প্রণাম করছিল ওরা। গোটা ব্যাপারটা রামু সগর্বে দেখতে দেখতে ভাবছিল, আমি কি ছিলাম, কি হলাম। কিছুদিন আগে এদের সবাইকে মা মাগো মা বলে দু মুঠো চোল্লুর (অন্ধ্রে সরষের মত এক ধরনের ফসল হয়। নাম চোল্লু। এর আটা দিয়ে রুটি হয়, সেদ্ধ করে গরিবরাও খায়।) জন্য অনুরোধ করতাম। ঐ তো মোড়লের বউ আসছে। নায়ডুর মেয়েও আসছে। বাবা আর তো পারি না। এ তো দেখছি দলে দলে মেয়েরা কলসী কলসী হলুদ জল আনছে। সব তার পায়ে পড়বে।

নদী আর মন্দিরের মাঝখান দিয়ে নানা রঙের শাড়ি পরে সারি সারি মেয়েরা ভরা কলসী মাথায় করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। পাহাড়ের চূড়ায় গোধূলির আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারের বুক চিড়ে আকাশে চাঁদ উঠল। শরৎকালের জ্যোৎস্না। মানুষগুলোর মনে যেন আনন্দের ঢেউ তুলেছে। হাসি ঠাট্টা মিলিয়ে সারা গ্রামে যেন আনন্দের জোয়ার বইছে।

খাওয়াদাওয়ার পর কাছের শহর থেকে আনা দুটো পেট্রোম্যাক্স জ্বলে উঠল। আর তখনই ঢাক বেজে উঠল। বাজনার তালে তালে যেন সমস্ত বিশ্বে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাদক যেন তার বাজনার তালে তালে চাঁদের আলো বাড়ানোর মন্ত্র জানে।

সকাল থেকেই রামু উপোস করেছিল। এক একটা মূর্তি পুষ্পকমে (পাল্কী, চাকা বিহীন রথ যা কাঁধে করে পরিক্রমা করা হয়।) রাখল। লোকের মধ্যে দারুণ উৎসাহ। ফুল, পাকা কলা পুষ্পকমের উপর ছুঁড়তে লাগল। বাজি পোড়াতে লাগল। পুষ্পকম্ বেহারাদের কাঁধে উঠল।

বিগ্রহগুলো রং করা হয়েছিল। সেগুলোকে লাল পুষ্পকমে রাখার ফলে সুন্দর দেখাচ্ছিল। গাঁয়ের লোকের পয়সায় কেনা মেরুণ রং-এর পট্টবস্ত্র রামুকে দেওয়া হয়েছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় চুণকাম করা মন্দিরটা ঝক্ঝক্ করছিল। সব মিলিয়ে সে এক উৎসবের সমারোহ। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য।

সকলের চোখে মুখে জ্যোৎস্নার আলোর ছটা তাদের চোখে মুখে খুশী খুশী ভাব। রামু মন্দিরের প্রধান পুরুত ঠাকুরের মত পুষ্পকমের সামনে দাঁড়াল।

নীলাম্মা মন্দিরের সামনে বছর দুই আগে একটা নারকেল বাগান ছিল। ১৯৪৩ সালে প্রচণ্ড ঝড়ে চারটে বাদে সমস্ত গাছ পড়ে যায়। ঠিক সেই জায়গায় এখন ঢাক বাজছে। শুধু ছেলেমেয়ে যুবকদের মধ্যেই নয় বুড়োদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। কিছু কিছু বাচ্চা মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছিল না। ওরা বড়দের কাঁধে বসে দেখতে লাগল। আশপাশের গ্রাম থেকেও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নীলাম্মার উৎসব দেখার জন্য এসেছিল। ওদের আসার ফলে গ্রামবাসীদের উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল।

"তাক-ধিনা-ধিন্, ঝিনাক্-ঝিনাক্-ঝা" ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে। একটা পাঁচ বছরের ছেলে ডিগবাজি খাচ্ছিল বাদকদের মাঝখানে। ঐ ডিগবাজির তালে তালে ঢাকের বাজনা বাজছিল।

আর একটা বুড়ো ভিড় ঠেলে এগিয়ে বাদকদের কাছে এসে "ধান্ জিনা কড়ি, ধান জিনা কড়ি" বলে বাদকদের উৎসাহ দিচ্ছিল।

"এই যে এসে গেছে!" এই কথাটাই যেন ভিড়ের ভেতরে থাকা সকলের মুখ থেকে বেরুচ্ছিল। তার শরীরটা যেন ইস্পাতের তৈরি। ধুতিটাকে ল্যাঙ্গটের মত বেঁধেছিল সে। গোঁফ পাকিয়ে বিড়ালের মত ডিগবাজি খেয়ে এক লাফে ঐ বাদকদের মাঝখানে পড়ল সে। সেই জ্যোৎস্নারাতে তার কালো পাহাড়ী চেহারাটা আরও যেন ফুটে

উঠেছিল। উঁচু নাকের সঙ্গে মানানসই তার মুখমণ্ডল। তার চোখ চকচক করছে। গলায় কাশীর কালো সুতো। কোমরে বাঁধা রয়েছে পাকানো কালো সুতো। সে যে ওস্তাদ লেঠেল সেটা তার চাল চলন ও চেহারা দেখেই বোঝা যায়। তার হাতের পেশীগুলো যেন লোহার এক একটা বল। পা দুটো যেন দুটো থাম। অতবড় চেহারার লোকটা এক লাফে অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় বাতাসে ভর করে সে কিছুক্ষণ উপরেই থাকতে পারে। শুধু বাঘের খেলাই নয়, লাঠি ঘোরানোর ব্যাপারেও তার নাম ডাক ছিল। লাঠির কত খেলাই না সে জানে। আগলবাড়ি, হারুয়াঝাপটা আর মাঝে মাঝে সে বাঁওড় খেলাও দেখিয়েছিল। এসব খেলা দেখানোর সময় লোকে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকত, যেমন এখন তার বাঘের খেলা হাঁ করে দেখছে। লোকটার নাম পুল্লাইয়া।

পুল্লাইয়ার সেখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাদক একযোগে বাজাতে লাগল, "ঝনক্-ঝনক্-লব-বিমকারী।" আশেপাশের দশ-বারোটা গ্রামের লোক পুল্লাইয়ার লাঠি খেলা দেখার জন্য আগ্রহী ছিল। ওদের অনেকেই সেদিন রাত্রে সেখানে ছিল। ওর খেলার তালে তালে সমস্ত বাজনা বাজছিল আর থামছিল।

পুল্লাইয়ার সবচেয়ে নামকরা খেলা ছিল বাঘের খেলা। সারা গায়ে বার্নিশ রং লাগিয়ে বাঘের চামড়ার রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিত। বাঘের মত লাফাত। বনের বাঘ যে ভাবে ছোটে, যেভাবে শিকার ধরে এবং ধরে নিয়ে যায় এ সব কিছুই সে বাজনার তালে তালে দেখাত। তার হাঁটা চলা লাফানোর তালে তালে বাদকরা ঢাক বাজাত। পুল্লাইয়া থেমে গেলে সমস্ত বাজনা থেমে যেত। তার নাচ দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে কেউ না কেউ বলে উঠত, "বাঃ, দারুণ হচ্ছে! বেঁচে থাকো পুল্লাইয়া।"

মাঝে মাঝে দু একজন বাদক ঢাকের চামড়া শিথিল হয়ে গেলে অদূরে খড় পুড়িয়ে চামড়াটাকে গরম করে নেয়। আবার টং টং করে আওয়াজ হতে থাকে। ইতিমধ্যেই দুটো ঢাকের চামড়া ফেটে গিয়েছিল। এতক্ষণ যে পুল্লাইয়া দারুণভাবে নাচছিল সে হঠাৎ থেমে গেল। তার এই ভাবে থেমে যাওয়াতে লোকে থমকে গেল। বাদকদের চোখে মুখে প্রশ্ন, "পুল্লাইয়া কি ক্লান্ত হয়ে গেছে?"

পুল্লাইয়া এমন ভাবে জিভ কাটল যেন বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে। অপরাধ তো বটেই। নীলাম্মা দেবীকে প্রণাম না করে সে মন্দিরের সামনে ডিগবাজী খেয়েছে। তাড়াতাড়ি নীলাম্মা দেবীর সামনে এসে সে মাথা ঠুকল। রামুকেও প্রণাম করল সে। রামু মুখ টিপে হেসে বলল, "চালিয়ে যাও পুল্লাইয়া।" তার কথা শুনেই পুল্লাইয়া আবার একটা ডিগবাজী খেল। পরক্ষণেই এক লাফে অনেক উপরে উঠে গেল। বাদকরা হাঁ করে পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে ওদের মনে পড়ল যে ওরা বাজনা বাজাচ্ছে না। ওদের হাত থেমে গেছে। ঢাকের বাজনা বেজে উঠল। যত জোরে, যত দ্রুত বাজানো উচিত তাদের হাত যেন তত জোরে বাজাতে পারছে না।

পুল্লাইয়ার নাচের সঙ্গে তাল রেখে বেশিক্ষণ বাজানো যায় না। হাত অবশ হয়ে আসে। "পুল্লাইয়া একাই একশ। ওকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মত লোক এখনও আশপাশে কেউ জন্মায়নি। আর হয়ত জন্মাবেও না।"—কে যেন বলে উঠল।

সগর্বে ভিড়ের মধ্যে একটা লোক চিরুনি দিয়ে গোঁফ আঁচড়াচ্ছিল। একটা ছোট্ট ছেলে, পুল্লাইয়ার চেলা, লোকের প্রশংসা কানে যেতেই খুশী হয়ে বার দুই কাঁধটাকে নাচিয়ে নিল।

পুষ্পকম্ নড়ে উঠল। লোকেও নড়াচড়া করতে লাগল। সকলের সামনে যারা ছিল তারা বাজি পোড়াচ্ছিল।

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে পুষ্পকম্ (পাল্কী) থামছিল। তুবড়ি ও নানা রকমের বাজি পুড়ছিল। বাড়ির মেয়েরা ভেজানো মুগডাল গুড় পাকা কলা দিয়ে নীলাম্মা দেবীর পুজো দিচ্ছিল। বাড়ি বুঝে রামু নিজের ভাগ রেখে বাকিটা ফেরত দিচ্ছিল। কয়েকটি পরিবার নীলাম্মা দেবীকে মানত করা নতুন শাড়ি দিয়ে প্রণাম করছিল।

মোড়লের বাড়ির সামনে আবার অনেকক্ষণ পুষ্পকম্ দাঁড়াল। "ধান্ জিনা কড়ি, ধান জিনা কড়ি" শব্দে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম হয়েছিল। কারণ পুল্লাইয়া তখন লাঠি চালানোর খেলা দেখাচ্ছিল। তার লাঠি ঘোরানোর তালে তালে জোরে জোরে বেজে উঠছিল ঢাকের বাজনা। পুল্লাইয়ার হাতে লাঠি তো নয় যেন রকেট ঘুরছিল। মাঝে মাঝে সবাই চেঁচিয়ে উঠছে, "বাঃ, বাঃ চমৎকার।"

মোড়ল, গ্রামপ্রধান, মহাজন প্রভৃতি প্রত্যেকের বারান্দায় বহু যুবতী দাঁড়িয়ে পুল্লাইয়ার খেলা দেখছিল, তার খেলা দেখে ওরা চমকে উঠছিল। ওদের মন রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। অন্য এক অনুভূতিতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ওরা পুল্লাইয়ার খেলা দেখছিল।

পুষ্পকম্ এগিয়ে চলল। লোকে তাকে অনুসরণ করল। বড় রাস্তায় আরও দুটো জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে খেলা দেখাল পুল্লাইয়া। তার চেলারা তার নাম রেখেছে। বড় রাস্তার শেষে পুষ্পকম্ থামল। সামনেই আছে কোলকাতা থেকে মাদ্রাজ যাওয়ার ট্রাঙ্ক রোড। এ রাস্তার দু পাশে দুটো পাড়া রয়েছে। পুষ্পকম্ রাস্তা পেরুনোর আগে বাদকরা আর একবার নিজের শক্তির পরিচয় দিল।

পুল্লাইয়া রাস্তার পাশ দিয়ে বিড়ালের মত ডিগবাজি খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেদিন অদূরেই হাট বসেছিল। হাটে যারা এসেছিল ফেরাপথে তারাও নীলাম্মা দেবীর উৎসব দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ল। গরুর গাড়ির চালকরা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছিল। বাচ্চা ছেলেরা গরুর গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। খেলা দেখানোর জায়গায় হঠাৎ হাজির হল একটি ছেলে। ছেলেটার তিনটে দাঁত নেই। উরুতে হাত ঠুকতে ঠুকতে লাফাতে লাফাতে এসে সে আসরের মাঝখানে দাঁড়াল। ওদিকে বাদকরা যেন বাতাসে উড়ছিল। মুখ চেপে ছেলেটা ওদের চেয়ে দ্রুত লাফাচ্ছিল। তার গাল

ছিল ফোলা। মাঝে মাঝে তার কাছা খুলে যাচ্ছিল। ছেলেটার বয়স বছর ছয়েক হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার হাতের পেশী, শরীরের গড়ন দেখলে মনে হয় যেখানকার পেশী সেখানেই থাকবে। তার মুখে বাচ্চা ছেলের ছাপ ছিল। বেশ কচি মুখ, আসরে আসার পর থেকেই সকলের চোখ তার উপর পড়েছিল।

পুল্লাইয়া তাকে দেখেই মনে মনে, "বাহবা!" বলে উঠল। হঠাৎ বিড়ালের মত ডিগবাজি খেতে গিয়েও পুল্লাইয়া মাঝপথে থেমে গেল। সব চুপচাপ। একটি ছুঁচ পড়লেও যেন শোনা যাবে। চোখের পলকে ঐ বাচ্চা ছেলেটা পুল্লাইয়ার শরীর বেয়ে, খেজুর গাছে ওঠার মত উঠে পড়ল। মাঝপথে পুল্লাইয়া এমন ভাব করল যেন যেদিকে ছেলেটা উঠছে সেদিকে তার শরীরটা ঢলে পড়ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ছেলেটাও এমন ভাব করল যেন তার পা হড়কে যাচ্ছে, সে পড়ে যাবে। তারপর আবার উঠতে লাগল। তার যাত্রা শুরু হল পুল্লাইয়ার মাথা থেকে পায়ের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চা ছেলেটা নিজের ছোট ছোট পা পুল্লাইয়ার পায়ের পাতার উপর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

চারদিকে নিস্তব্ধ। সকলের মুখ হাঁ করা আছে। তাদের চোখগুলো বাচ্চাটার উপর নিবদ্ধ।

তারপর মুখে আঙুল দিয়ে বাচ্চাটা সিটি বাজাল। পালোয়ানের মত হাতের পেশীর উপর চাপড়ে আওয়াজ করে হো হো করে হাসছিল। যেন এসব তার কাছে কিছুই নয়।

লোকের চোখে মুখে তখন একটি মাত্র ভাষা, "বাঃ চমৎকার!" ওদের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। ওদের ধারণা যে কোন মুহূর্তে বাচ্চাটা ধপাস করে পড়ে যেতে পারে। ভিড়ের ভেতর থেকে কয়েকটি শব্দ ভেসে এল। সেই শব্দ কানে যেতেই পুল্লাইয়ার মন আনন্দে ভরে গেল। ওরা বলাবলি করছিল, "ছেলেটা কে? সাহস তো কম নয়।" কিছুক্ষণ পরে কে যেন বলে উঠল, "আবার কে। বাপ কা বেটা। নিচে যে লোকটা আছে তার ছেলে।"

পুল্লাইয়া আর ঠিক থাকতে পারল না। তার ভীষণ ইচ্ছে করছিল যে এই কথা-গুলো বলেছিল তাকে দেখার। দেখতেই হবে। ছেলেটা নেবে গেল। হ্যাঁ ঠিক তাই, সামনের গরুর গাড়িতে একটা বুড়ো দাঁড়িয়েছিল। সে বয়সে বুড়ো হলেও তার উচ্ছ্বাস দেখে তাকে বুড়ো মনে হচ্ছিল না। কথাগুলো সেই বলেছিল। লোকটা বয়সে বুড়ো। হো হো করে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে সে হাসছিল। গরুর গাড়ির উপর দাঁড়িয়েও গোড়ালি তুলে দেখছিল সে।

খেলার শেষে গরুর গাড়িগুলো নড়েচড়ে উঠল। হাঁক পেড়ে নিজের গাড়ির গরুগুলোকে এগোতে বলে বুড়োটা আপন মনে বলল, "এই না হলে ভাগ্য! বাপ কা বেটা। ব্যাটা বাপের নাম রাখবে।"

গাড়িগুলো সব এগিয়ে যেতে লাগল। পুষ্পকম্ এগোল। লোকে তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে। সবাই এগোল। পুল্লাইয়া কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল!

"ছেলে! আমার ছেলে থাকতে নেই? কেন থাকবে না! আমার একটা ছেলে হলে ভাল হত! নিজের একটা ছেলে না থাকলে ঠিক··· ।"

আপন মনে পুল্লাইয়া স্থান কাল পাত্রের কথা ভুলে বলে যেতে লাগল, "সুন্দর ছিম-ছাম ছেলে হবে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করবে। যেখানে যাবে মানুষের চোখে সে পড়বে। লোকে তাকে দেখেই প্রশংসা করবে। হ্যাঁ, তবে যেন ছেলেটা কোন কিছুতে ভয় না পায়। বনে বাদাড়ে যেন নির্ভয়ে সে ঘুরে বেড়াতে পারে। জান গেলেও কথা যেন সে রাখতে পারে। তার যেন চোর ধরার ক্ষমতা, দু হাতে দান পুণ্যি করার মন থাকে। মাটির উপর দাঁড়িয়ে ছেলেটা যেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমার নাম রাখতে পারে। ঠিক এ রকম একটা ছেলে আমার চাই-ই চাই-ই···।"

তিন

বউয়ের কথা নয়, পুল্লাইয়ার ভাবতে ভাল লাগছে ছেলের কথা। ঐ বুড়োর কথা বার বার মনে পড়ছিল। হঠাৎ পুল্লাইয়ার মনে পড়ল বলদগুলোকে জাব দেওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্য সে আলের পথ ধরল। পশ্চিম দিকের আলের পথ ধরে তাড়াতাড়ি সে হাঁটছিল। আবার সে বলদের কথা ভুলে গেল ছেলের কথা মনে পড়তেই।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে নীলাম্মা দেবীর মন্দিরের দিকে তাকাল। চাঁদ রয়েছে অনেক উঁচুতে। মেঘগুলো সব রং হারিয়ে সাদা হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রাতটা দিন হয়ে গেছে।

সেই জ্যোৎস্নায় তিন ফার্লং লম্বা বাঁধ সাদা চকচকে দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবুজ ধানের শিষ দুলছিল। "মা-মাগো, বাঁচাও মা। লক্ষ্মী মা আমার!" বলতে বলতে দু হাত তুলে নমস্কার করল পুল্লাইয়া। মাঝে মাঝে গাছের ছায়াগুলো জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। হাওয়ায় একটা শব্দ ভেসে আসছে। সেই শব্দ যেন মা লক্ষ্মীর চুড়ির রিনিঝিনি।

সে হেসে উঠল আপন মনে। খুশীতে তার শরীর মন ভরে ছিল। এক পা এক পা করে এগিয়ে সে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল।

সোনার জমি। এ গ্রামে কিসের অভাব। দুধ, দই, ঘর বাড়ি, সবই আছে। লাঙ্গলহীন, চরকাহীন বাড়ি একটিও গ্রামে নেই।

আমার গ্রাম। আমার দেশ। পুল্লাইয়া আপন মনে বলতে বলতে নিজের

অজান্তেই দ্রুত পা চালিয়ে চলতে লাগল।

ফসলে ভরপুর সোনার মাটি। মাটি যেন তার সমস্ত শক্তি ফসলে ভরে দিয়েছে। দু হাতে ফসল তুলে দিতে চায় সে মানুষের হাতে। বর্ষায় যেমন ডোবা ও পুকুরের জল ভরে উপচে যায় তেমনি জমিতে যেন ফসল উপচে রয়েছে।

এই গ্রামে মা গঙ্গার আশীর্বাদ আছে—জলের কোন অভাব নেই। পাহাড়ের বুকে বৃষ্টি পড়ে। সেই জল গড়াতে গড়াতে নিচে নামে। খাল বিল ভরে দেয়। চাষ আবাদ না হওয়া এই গ্রামের লোকের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। বছর দুয়েক আগে, ধানকাটার মুখে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। সব ধান ধুয়ে মুছে ভেসে গেল। তবু এই গ্রামের লোক কারও কাছে ধানের জন্য হাত পাতেনি। বরং আশপাশের গ্রামে অভাব অনটনে যারা পড়েছিল তাদের এরা সাহায্য করেছিল।

এই ধরণের গ্রামের মানুষ পুল্লাইয়া। এত সম্পদশালী তার গ্রাম। পুল্লাইয়া এসব কথা ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে তাকাল। ছোট একটা মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিয়েছিল। স্নিগ্ধ বাতাস যেন পাকা ধানের উপর বয়ে যাচ্ছে। একটি ধান একটি গাছের সৃষ্টি করে। একটি গাছ থেকে কত ধান সৃষ্টি হয়। ধানের কথা ভাবতে ভাবতে পুল্লাইয়ার মনে পড়ল ছেলের কথা। এমন একটি ছেলে যে সসম্মানে চার জায়গায় ঘুরতে পারে, যার চোর ধরবার ক্ষমতা থাকবে, হীরের টুকরো ছেলে হবে। একটা ছেলে না থাকলে চলে না। ঠিক সময়ে যেমন বৃষ্টি না হলে ফসল ফলে না ছেলের বেলায়ও তাই খাটে। ঠিক সময় ছেলে না হলে সেই ছেলেকে দিয়ে কোন কাজ হয় না।

বউ না থাকলে ছেলে আসবে কোত্থেকে। বউএর চেয়ে নিজের শরীরটা অনেক দামী। শরীরের প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নিতে গিয়ে পুল্লাইয়া বিয়ের কথা ভাবল না। বিয়ে করার ইচ্ছে যে তার মনে জাগেনি তা নয়, কিন্তু বিয়ে করলে শরীর ভেঙ্গে যাবে এ ধরণের একটা ধারণাও তার ছিল।

এগিয়ে চলল সে।

কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে এক মধুর গান।

"চাঁদ মামা ও চাঁদমামা···"

পুল্লাইয়ার সমস্ত শরীরে পুলক জাগল। দূর থেকে গানের কলি ভেসে আসতে লাগল। শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাতে ভেজাতে আপন মনে বলল, "কে জানে কত সৌন্দর্যবতীর কণ্ঠস্বর রূপায়িত হয়ে একটা চাঁদ তৈরি হয়েছে।" আবার সেই গলা শুনতে পেল।

পুল্লাইয়ার মনে হল সেই কণ্ঠস্বর যেন তাকে ডাকছে, টানছে। তার ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে ঐ গান যে গাইছে তার সঙ্গে গলা মেলাতে। নিজেকে লীন করে ফেলতে সেই গানের সুরে।

শুধু সে কেন। ঐ গান শুনে স্বয়ং চাঁদও দ্রুত এগোতে পারছে না।

যে চাঁদ এত তীব্রবেগে তার স্নিগ্ধ আলো ছড়ায় সেই চাঁদ তার চলা ভুলে গেছে।

"চাঁদমামা," এক সঙ্গে অনেকগুলো স্বর সমস্বরে গেয়ে উঠল। তালিও একসঙ্গে বাজছিল।

আবার প্রথমে শোনা মধুর গলার গান শোনা গেল: "তার হাত যে লম্বা তাই সে কুলো কিনতে দেবে না···চাঁদমামা, চাঁদমামা।"

পুল্লাইয়া ঝপ্ ঝপ্ করে লাফাতে লাফাতে এগোতে লাগল। মন্দির পেরিয়ে গেল। নদীর তীরে পৌঁছে গেল সে। পুল্লাইয়ার সব কিছুই যেন ভুলিয়ে দিচ্ছে সেই কণ্ঠস্বর। রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে তার মন ভরে গেল।

নদী সমস্ত জ্যোৎস্নাকে যেন নিজের বুকে রেখে দিয়েছে। জ্যোৎস্নার আলো নদীর জলে যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

ঐ দেখা যাচ্ছে নদীর তীরে তেঁতুল গাছটা নুয়ে পড়েছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো। ঐ আলোতে দেখা যাচ্ছিল সাদা শাড়ি পরা কয়েকটি তরুণীর নাচ।

গানের মূর্ছনায়, নদীর জলের কুলুকুলু ধ্বনিতে গোটা পরিবেশ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। পুল্লাইয়া আস্তে আস্তে গাছের আড়ালে দাঁড়াল। আড়াল থেকে যুবতীদের দিকে এমন ভাবে তাকাল সে যেন ওদের গিলে ফেলছে। তার মনের গভীরে, আনন্দের রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে আলাদা এক জগৎ তৈরি হচ্ছিল।

তালি বাজাতে বাজাতে তালে তালে আটজন যুবতী গাইছিল আর লাফাচ্ছিল। কয়েকবার গাওয়ার পর নতুন কথা জুড়ে দিল এক যুবতী। যে যুবতী কথা জুড়ে জুড়ে গান শুরু করছিল তার নাম নীলাম্মা। লোকে তাকে "নীলি" নামেই ডাকে।

নীলি কখনও নুয়ে, কখনও এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে গাছের আড়ালে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইছে। পুল্লাইয়ার ধমনীতে রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে গরম রক্ত বইতে শুরু করল। তার ইচ্ছে করছিল, খপ করে নীলিকে ধরে, হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে তার সব কিছু এলোমেলো করে দিতে।

পরনে তার সাদা লাল পেড়ে শাড়ি—উজ্জ্বল জ্যোৎস্না—মনমাতানো চেহারা—উন্নত যৌবন—ঠাণ্ডা হাওয়া—মনোরম চমৎকার গান—কি অপূর্ব! কি সুন্দর!

জামা-না-পরার ফলে তার যৌবনের দাপাদাপি!

মুখে, হলুদ মাখায়, পাকা সোনার রং। চুলে তার গোঁজা ছিল গোটা ডালের সবুজ চারা। আবার গান ধরল নীলি:

"চাঁদমামা······চাঁদমামা
তার হাত যে লম্বা তাই সে কুলো কিনতে দেবে না!
চাঁদমামা······চাঁদমামা।"

পুল্লাইয়া নিজের হাতের দিকে তাকাল। হাতটা বেশ বড়ই। গান গাইতে গাইতে ঘুরতে ঘুরতে নীলি মাঝে মাঝে ঐ গাছেরই আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ছিল।

কি অপূর্ব! নীলির সমস্ত যৌবন যেন তার বুকে এসে জমা হয়েছে। তা দেখে পুল্লাইয়ার মনে আরও দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। নীলি গাইল :

"তার ভুঁড়ি বড় বলে সে যে হাঁড়ি
দেয় না কিনতে।···চাঁদমামা···চাঁদমামা—"

সেই হাততালি ছন্দে ছন্দে পায়ের ধ্বনি। পায়ের তালে তালে গানের কলি। ঘুরতে ঘুরতে নীলি এল আবার সেই গাছের আড়ালে। নীলির রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তার মুখে সেই আলোয় ফুটে উঠেছিল চমৎকার ঔজ্জ্বল্য। মুখ দেখে মনে হয় তার কোন শত্রু নেই। নাচতে নাচতে শরীরের আড়মোড় ভেঙ্গে আবার সে গলার স্বর বাড়িয়ে গাইতে লাগল :

"তার পা লম্বা বলে সে যে কিনতে দেয় না
মই। চাঁদমামা—চাঁদমামা—"

তার শরীরের আড়মোড় ভাঙ্গা তার চোখের চক্‌চকে দৃষ্টি, পুল্লাইয়ার মনে গেঁথে গেল সেই মুহূর্তে।

"তার দাঁত লম্বা বলে সে ডাল রাঁধতে দেয় না।
চাঁদমামা—চাঁদমামা—"

তরুণীরা সেখানেই ঘোরাঘুরি করছিল। পুল্লাইয়ার ভেতরটা উন্মাদনায় অস্বস্তিতে ভরে গেল। নীলিকে জাপ্‌টে ধরার জন্য সে হাত বাড়িয়েও শেষ পর্যন্ত থেমে গেল। গান চলল। পুল্লাইয়া ঢোক গিলতে লাগল। নীলি গাইল :

"তার ফোকলা দাঁতের জন্যে চাই বাঁধানো দাঁত,
তার টাক মাথায় চাই পাগড়ী। চাঁদমামা—চাঁদমামা—"

"সে কি! অমন ব্যাটাছেলেকে কে চায় গো?" বলে আটজন তরুণী এক লাফে পূবদিকে ঘুরে গেল। নীলির বাড়ি ছিল গ্রামের দক্ষিণ দিকে। নীলি থেমে গেল। "নীলি দাঁড়িয়েছে। বাঃ এই তো নীলি দাঁড়িয়ে আছে!" নিম্ন স্বরে পুল্লাইয়া আপন মনে বলে উঠল।

নীলি এগোতে যেতে না যেতেই পুল্লাইয়া ঝট্ করে তার আঁচল ধরে টান দিল। চমকে উঠে নীলি পেছনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, "চোর!"

পুল্লাইয়া তার মুখ চেপে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার চোখে চোখ রেখে পুল্লাইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "আমি চোর কি সাধু আগে ভাল করে চেয়ে দেখ। তারপর চেঁচাবে।"

"ছাড়ো ছাড়ো। এ তোমার অন্যায়। ভগবান তোমায় ক্ষমা করবে না। ছাড়ো ছাড়ো বলছি।" মুখ চাপা থাকা সত্ত্বেও নীলি এই কথাগুলো বলে গেল। তার কথা

বাইরে শোনা গেল কিনা তা সে জানে না।

নীলি ছটফট করতে লাগল। দু হাত ছুঁড়ে চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু পুল্লাইয়ার থাবা থেকে সে নিজেকে ছাড়াবে কি করে? অসহায়া বালিকার মত সে শুধু গোঁ গোঁ করতে লাগল।

নীলির আটসাট বাঁধা খোঁপা খুলে গেল। সে তার শরীর ছেড়ে দিল। পরমুহূর্তেই তার সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

"উফ্!" পুল্লাইয়ার মুখ থেকে বেরুল। পুল্লাইয়াকে কামড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নীলি ছুটতে লাগল। দাঁত বসানো হাতটা উপরের দিকে তুলে পুল্লাইয়া বলল, "তোমাকে যদি ধরতে না পারি তো···"

ছুটে পালাতে পালাতে নীলি বলল, "অসভ্য, লজ্জা করে না?"

চার

পুল্লাইয়া মাথা নেড়ে চার পা এগিয়ে গেল। পিছনের দিকে ফিরে তাকাল। নীলিকে দেখা গেল না। দেখা না গেলেও তার মনে হল যেন নীলি তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল সে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ভাবল হয়ত সে বাড়ি ফিরে গেছে।

পুল্লাইয়ার পায়ের শব্দ শুনে গাই গরুগুলো মাথা তুলে তার দিকে তাকাল। দড়ি ছিঁড়ে তার কাছে আসার জন্য ছটফট করতে লাগল। ওদের টানাটানি দেখে সে তাড়াতাড়ি খিড়কির দরজার দিকে গেল। খড়ের গাদা থেকে খড় নামিয়ে ওদের সামনে ফেলল। ওরা এক সঙ্গে অনেকখানি করে খড় মুখে পুরে নিতে লাগল। ওদের কাছে দাঁড়িয়ে খাওয়া দেখতে লাগল সে। ওদের গায়ে সে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত স্নিগ্ধ সাদা রং যেন ভরে রয়েছে। গাইগুলো খড় খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে আওয়াজ করছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। পুল্লাইয়া দাওয়ায় খাটিয়া পেতে বসল। খিড়কির দরজার কাছে অশ্বত্থ গাছ ছিল। সেই গাছের পাখিগুলো মাঝে মাঝে একসঙ্গে ডেকে উঠছিল।

ওদের ডাক শুনেই তার মনে পড়ল 'চাঁদমামা' গান। আকাশের দিকে সে তাকাল। চোখ পড়ল চাঁদের উপর। সমস্ত মন ভরে গেল আনন্দে। নীলি যেন একটা পাখি। কেমন সুন্দর পাশ কাটিয়ে উড়ে গেল।

নিজের অজান্তে পুল্লাইয়া গোঁফের ওপর হাত বুলিয়ে দু'একটা পাক দিয়ে নিল। ভাবলো, ওকে যদি নিজের করে না নিতে পারি তাহলে আমি মল্লনাইডুর ছেলে নই।

গাই গরুগুলো তার কাছে এগিয়ে এল। তার গা চাটতে শুরু করে দিল। পুল্লাইয়া

খাটিয়া তুলে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় ফেলল। খড়ের ছাউনির মাটির ঘর। মাথার দিকে চাঁদ এগিয়ে এল।

মাঝে মাঝেই পুল্লাইয়ার চোখ ঐ চাঁদের দিকে পড়ছিল। খাটিয়ায় শুয়ে বার বার সে এপাশ ওপাশ করছিল। কিন্তু চোখে ঘুম এল না। তখনও ঢাক-ঢোলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। সেই আওয়াজ তার কানে সমানে বাজছিল। এক সময় পুল্লাইয়া আপন মনে বলে উঠল, "কত বদলে গেছি। গরুগুলোকে খড় দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এ বেলা নীলাম্মাদেবীকে পুজো করতেও ভুলে গেছি। সব কিছুই ভুলে গেছি।"

পুল্লাইয়ার ভুল হয় না কোনদিন। সে ভোলে না কখনও। সব সময় সে মেয়েদের থেকে দূরে দূরেই থাকে। আজ সে মেয়েছেলের সামনে কেমন যেন হয়ে গেল। "ছিঃ, কি বিচ্ছিরি ব্যাপার! মেয়েছেলেটা মুখের ওপর 'অসভ্য' বলল! সত্যি তো, আমার তখন লজ্জা করল না কেন!" এই ধরণের কথা সে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে গুমরোতে লাগল। ছটফট করতে করতে ভাবল, কখন সকাল হবে। ভাবতে ভাবতে ভোরের হিমেল হাওয়ায় তার চোখের পাতাগুলো ভার হয়ে এল। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হলো। পাখির কলরবে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ক্ষেতের দিকে বেরিয়ে পড়ল পুল্লাইয়া। আলের উপর দিয়ে সে হাঁটতে লাগল। তার চোখে, মুখে, দেহে, সূর্যের ভোরের আলো পড়তে লাগল। ক্ষেতে জল গড়ানোর শব্দ ভেসে আসছিল। সোনালী ধানের ক্ষেতে ভোরের আলোর ঢেউ। সঙ্গে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। ধানগাছে লাগে বাতাস। গাছে গাছে ছোঁয়াছুঁয়ি। বাতাসের ছোঁয়ায় গাছে গাছে শব্দ। সব মিলিয়ে সে এক বাহার।

ধানগাছগুলো এক এক জায়গায় বেশ লম্বা হয়েছে। গাছে গাছে সবুজের মেলা। প্রতিটি গাছ নুয়ে পড়েছে ধানের ভারে। মনে হয় এবছর ধানের গোলাগুলো ভরে যাবে।

পাশের ক্ষেত থেকে পিসা নরসিংহ বলে উঠল, "এ বছর কোথাও পঙ্গপালের উপদ্রব হয়নিরে ভাই!"

"পঙ্গপাল, একটা পোকা এলেও মেরে শেষ করে ফেলবো না!" বলল পুল্লাইয়া। তার বলার দৃঢ়তায় সমস্ত ক্ষেত যেন নুইয়ে দুলে সম্মতি জানাল। ভুট ভুট শব্দ হল। মাটি মাঝে মাঝে জল গিলছে। মাটি তুলে গর্তগুলো ঢেকে দিল পুল্লাইয়া। গর্ত বুজে গেলে মাটি আর জল গেলে না। কাঁকড়াগুলোও জ্বালাতে পারে না। ইতিমধ্যে পিসা তার আলের উপর দাঁড়িয়ে বলল, "কি হে, আলের উপর ঘাস গজিয়ে উঠছে যে, কেটে ফেল।"

"কেটেছিলাম। আবার গজিয়ে উঠছে। গজাক। গজাক। এই গাঁয়ের পশুগুলো দুদিন আনন্দে চড়তে পারবে। এসব ঘাস ওরা কত ভালবাসে। ওদের কাছে এটাই

সোনা, খাঁটি সোনা।"

পুল্লাইয়ার কথা শুনে পিসা হেসে ফেলল। মনে মনে তার ভালই লাগল।

"নিচু জমিতে গিয়েছিলে ?"

"আরে বাবা, সেখানে এ বছর যা ফসল হয়েছে না, একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে।"

"তাহলে আর তোমার কিসের অভাব···অভাব অবশ্য তোমার একটাই আছে।"

"আমার ? আমার আবার কিসের অভাব ? আমার অভাব আছে এমন কথা বলার সাহস আছে কোন পুরুষের ?"

"শহরের মহাজনের দু'একর জমি তো ভাগে চাষ করছো। তাছাড়া, তোমার বাপ-দাদার আধ একর জমি সে তো আছেই। সব সময় তুমি যদি 'পেট ভরাতে পারি না বউ এনে কি করব' বলে কাঁদতে থাক তাহলে আর···তোমার এই শরীরটা কিসের জন্য ? চিরকাল এটাকে লোহার মত রেখে দেবে ? মনে রেখো, লোহায়ও জং ধরে। একবার জং ধরলে লোহার দাম কমে যায়। সেই লোহার কদর থাকে না।"

শুধু আজকেই নয়, আরও অনেকবার পিসা বিয়ে করতে বলেছিল। নতুন কিছু নয়। তার কথা শুনে পুল্লাইয়া অন্যদিনের মত তার দিকে কটমট করে তাকায়নি। শুধু মুখ টিপে হাসল। সামনে দাঁড়াল সে। তার গোঁফ জোড়া নড়ে উঠল। মিটমিট করে তার দিকে তাকাচ্ছিল পিসা। তার চোখে মুখে একটা গর্ব ফুটে উঠছে। সে যেন বুক ঠুকে বলতে চাইছে, "দেখ আমার পাঁচটা মেয়ে আর ছটা ছেলে।"

পিসার পরণে হাঁটুর উপর কাপড় গায়ে কিছু নেই। কাঁচা পাকা চুল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে সে বলল, "দেখ, আমি ভেবেছিলাম আমাদের দেশে জাপানীরা এসে যাবে। শুনেছিলাম ছেলে-মেয়েদের মাথাপিছু হিসাবে জমি ভাগ করে দেবে। সেদিক থেকে আমার এগারোটা ছেলেমেয়ে। কিন্তু সেদিন শহরে গিয়ে শুনলাম জাপান নাকি হেরে গেছে। আমার বিশ্বাস হল না। তুমি তো জানো, বেঁটেরা খুব বুদ্ধিমান হয়। তাই ভেবেছিলাম ওরা তুকতাক করে বুদ্ধি খাটিয়ে সাদামুখোদের ঠকাতে পারবে। আর আমাদের দেশটাকে হাতিয়ে নেবে। যাক ওরা হেরে গেলে কি হবে ! কংগ্রেস তো আসছে। সেও নাকি জাপানীদের মতই যাদের বেশি ছেলেমেয়ে আছে তাদের বেশি জমি দেবে।

পুল্লাইয়া হেসে ফেলল। পিসা শহরের উকিলবাবুর চার একর জমিতে কাজ করে। দশ বছর ধরে ঐ ক্ষেতে সে কাজ করছে। এর মধ্যে দু'বছর সে ফসলের ভাগ ওদের দিতে পারল না। দিতে না পারায় তার মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু উকিল-মহাজন নাছোড়বান্দা। উকিল তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল। সে হেরে গেল। নিজের যে সামান্য জমি ছিল সেটা বিক্রি করে উকিলকে টাকা দিতে হল। তারপর থেকে পিসার চোখ খুলে গেল। বুঝল জগতে বাঁচতে হলে সোজা পথে চলা যাবে না। তারপর

থেকে সে বলতে লাগল, "জগৎ সংসার যে কি জিনিস তা আমার বোঝা হয়ে গেছে।" এখন গাঁয়ের অনেকের ধারণা হয়েছে কূট বুদ্ধিতে পিসার সমান কেউ নেই।

"পুল্লাইয়া, চল যাই।"

"আমি একটু উঁচু জমিতে ঘুরে যাব" বলে দু পা এগিয়ে পিসা আবার বলল, "বুঝলে হে, শহরে আর একটা কথা শুনে এলাম। মহাত্মা গান্ধী নাকি বিরাট মহারাজ— ভগবানের সমান!"

"ও বাবা, একেবারে ভগবান!" পুল্লাইয়া বলল।

"এই ভগবান নাকি খুব জোর একটা জিদ ধরেছে। তুমি দেখো, কংগ্রেস দেশ হাতে না নিয়ে ছাড়বে না। কংগ্রেস এলে নাকি লাঙ্গল যার জমি তার হবে। বুঝলে পুল্লাইয়া, আমাদের মোড়লের তো তিরিশ একর জমি আছে! ছেলে তো একটাই। ওসব নাকি চলবে না। দেখবে, ওর চেয়ে আমি বেশি জমি পাব। ওর চেয়ে আমি বেশি জমির মালিক হব। দিন কাল পালটে যাবে। তুমি যদি একা পড়ে থাকো মার খাবে। সব দিক থেকে মার খাবে···"

পুল্লাইয়া হো হো করে হেসে উঠল। ছেলের কথা মনে পড়তেই চটপট হাঁটতে লাগল। আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল। তার মনে হল ছেলে পোশাক পরে মিলিটারীর মত এগিয়ে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। ছেলের চেহারা ভেসে উঠতেই তার সব কিছু ভুল হয়ে যেতে লাগল।

"ছেলে! আমার ছেলে। দুহাত বাড়িয়ে কোলে তুলে চুমো খেতে ইচ্ছে করল তার। হাঁটু ধরে খেজুর গাছে ওঠার মত পেটে বুকে পা দিয়ে কাঁধে উঠে পড়ছে যেন তার ছেলে···আমার ছেলে!"

ক্ষেত পেরিয়ে রাস্তায় পা পড়ল তার। রাস্তা পেরিয়ে মন্দিরকে পাশে ফেলে সে আদেম্মাপ্পার (দিদি) বাড়ির দিকে এগোতে লাগল।

আদেম্মাপ্পা সারা গাঁয়ের লোকের কাছেই আপ্পা (মানে দিদি)। কানে দুল। হাতে বালা। বয়স তিরিশ। শক্ত বাঁধুনি তার শরীরে। শরীরটা তেল চকচকে, উজ্জ্বল। একটি মাত্র মেয়ে তার। দেখে মনে হয় বয়সটা তার কুড়ি পেরোয়নি। চিমটি কাটলেই মনে হয় যেন রক্ত বেরিয়ে যাবে। এহেন বউকে আর বাচ্চা মেয়েকে ফেলে তার স্বামী পালাল। আর একবার বিয়ে করতে অনেকেই তখন তাকে বলেছিল। বড় বড় নামকরা লোক এগিয়ে এসেছিল তাকে বিয়ে করতে। "ওসব করব না।" বলে দিয়েছিল সে। লোকে বুঝল সে জেদী। লোকে আড়ালে বলল, "দেখা যাক, কতদিন তার এই জিদ থাকে।" মেয়ে বড় হল। সে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিল। বিয়ে দিল নিজের নন্দাইয়ের ছেলের সঙ্গে। ছেলেটাকে ঘরজামাই করে রাখল। পয়সা কড়ি, ধনসম্পত্তি যা ছিল তা শুধু আগলে রাখাই নয় তাকে বাড়ানোর কৌশলও আদেম্মাপ্পা শিখে নিয়েছিল। ফলে গাঁয়ের প্রায় সকলেই তাকে মানত। ক্রমশ দেখা গেল গাঁয়ের

প্রায় প্রত্যেকেই তার কাছে বিভিন্ন সময় উপদেশের জন্য আসত। এখন তার বয়স পঞ্চাশ।

পুল্লাইয়াও এল। বারান্দায় আপ্পা তেলাকুচো ভাজছিল। তাকে দেখেই মুখ টিপে হাসল।

"এই-রে, আইবুড়ো ছেলেটা কোত্থেকে এল?" আপ্পা বলল।

পুল্লাইয়া বারান্দায় আপ্পার কাছে বসে পাকা তেলাকুচো ভাজা দেখছিল।

"আপ্পা, মনে একটা জিদ চেপে গেছে।" পুল্লাইয়া বলল।

"তুমি তো বাবা এই তেলাকুচোর মত পেকে গেছো। এই বয়েস পর্যন্ত আমাদের জাতের মধ্যে কেউ বিয়ে না করে বসে নেই। বিয়ে হলে আর জিদ থাকবে না। কি হয়েছে? কার সঙ্গে কি হয়েছে যে মনে জিদ চেপে গেছে? কিসের জিদ?"

পুল্লাইয়া বলতে গিয়ে লজ্জা পেল। আপ্পাকে না বললে সমাধান তো হবে না। ঐ তো বড় ভরসা। মন শক্ত করে বলেই ফেলল।

"এতদিন শরীর ভেঙ্গে যাবে ভেবে বিয়ে করতে রাজী হইনি, কিন্তু···"

"কি? কি বললে? বিয়ে? বিয়ে? বাছারে আমার কত ভাল খবর আমার কানে দিলিরে! তুই সংসারী হলে তোর ছেলে···তোর মেয়ে···!"

পুল্লাইয়ার আরও লজ্জা করল। মাথা নিচু করে বারান্দায় বসে রইল। তার মনে হল বারান্দার মেঝেটা নিচের দিকে দেবে যাচ্ছে।

"তাহলে বিয়ের জন্য কত সোনা রেখেছ বাছা? আমাদের জাতের মধ্যে তো বরপক্ষকেও সোনাদানা দিতে হয়। মেয়েকে তো সাজিয়ে ঘরে আনতে হয়। আর তোমাকে বিয়ে করতে কোন মেয়েটাই না রাজী হবে।" বলতে বলতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। তার মুখে অতীতের সৌন্দর্য যেন ফুটে উঠছিল। বঁটিটা পাশে সরিয়ে আপ্পা গুছিয়ে বসল। পুল্লাইয়ার দিকে তাকাল। অন্য বারান্দায় মেয়ে চরকা ঘুরিয়ে সুতো গুটোচ্ছিল। সামনের গোয়াল থেকে গরু বের করে চরাতে নিয়ে গেল রাখাল।

আপ্পা জিজ্ঞেস করল, "কই বল, কত সোনা জমিয়েছ?"

"কি আছে আমার আপ্পা। তুমি জান না আমার এমন কি আছে! নিজের যেটুকু জমি আছে সেটাই বাঁধা রেখে যাহোক কিছু আনতে হবে।" পুল্লাইয়া বলল।

"ওটার কথা বাদ দাও।"

ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিতে পুল্লাইয়া তাড়াতাড়ি বলল, "দেখ আপ্পা, তোমাকে প্রথমেই বলেছি, জিদ চেপেছে। জিদ চাপলে কি ওসব কথা ভাবতে ইচ্ছে করে? এক কাজ কর না, তুমি ঐ নীলির কাছে···"

আপ্পা গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

"কি বলছিস রে! ওদের কি আছে! বেছে বেছে তুই ওকে ঠিক করলি? যাদের চাল চুলো নেই, তাদের ঘরে পাত পাতবি!"

"আপ্পা বাধা দিও না তো। বলেছি না একবার, জিদ চেপেছে।"

"দাঁড়া দাঁড়া ভাবতে দে। নাইডুর মেয়ে নারায়নম্মার তোকে পছন্দ হয়েছিল। সে তোকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তুই রাজী হলি না। এই গাঁয়ে এমন কোন বড়লোক আছে রে যে তোকে মেয়ে দিতে চাইবে না? দেখ আমার কথা শোন। কি আছে রে ঐ নীলির মধ্যে? না আছে রূপ, না আছে রং। ওর বাপের বাড়ির অবস্থা জানিস? বিয়ের পরে দেড় টাকার শাড়ি ও পরে আসতে পারবে?"

"আপ্পা, দোহাই তোমার, তুমি থামো দিকি।"

"কি বলছিস থামতে? তুই জানিস ওকে কেউ বিয়ে করতে চায়নি। ওকে বিয়ে করলে তুই শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে এক বেলাও থাকতে পারবি? ছটফট করিস না। সোনার থালারও কানা থাকে। বুঝলি? তোর কে আছে রে? কেউ তো নেই। বিয়ে অন্তত ভালো ঘরের মেয়েকে কর—যাতে বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াতে পারে, সাহায্য করতে পারে।"

পুল্লাইয়া মাথা নিচু করে বসে রইল।

পুল্লাইয়ার চোখের সামনে ছোটাছুটি করছে নীলি। তার যৌবনের নাচানাচি পুল্লাইয়ার চোখের পাতায় এঁটে আছে! সেই জড়িয়ে ধরা। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে যায়। পুল্লাইয়া ঠোঁট চেটে নিল। মনে মনে বলল, "আজ যদি তোমাকে ধরতে না পারি কি বলেছি। দাঁড়াও অসভ্য যখন বলেছ, আমিও দেখিয়ে দেব আমি কত বড় অসভ্য। জিদ যখন আমার চেপেছে পেছবার পাত্র আমি নই।"

পুল্লাইয়া মাথা তুলে বলল, "আপ্পা?" আপ্পা ঝট করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল হয়ত তার মনের পরিবর্তন ঘটেছে।

"আপ্পা, ওর বাপের বাড়িতে যদি কিছু নাই থাকে হাত-পা নিয়ে আসতে পারবে তো? চাষীর ঘরের বউয়ের হাত-পা শক্ত থাকলেই হল। অন্য কিছুর কি দরকার!"

আপ্পা বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি যে কেন এত করে বলছি তা তোর কানে ঢুকছে না। মেয়েটার আপনজন বলতে একটি বুড়ি আছে। ওর দিদিমা। বিয়ের পর সেও গুটি গুটি পা পা করে চলে আসবে নাতনীর শ্বশুরবাড়ি। আজ বাদে কাল বুড়ি ঘাটে যাবে। ও মরলে কাজ কম্ম তোকেই করতে হবে। তোর কত টাকা আছে? চার-ছটা ছেলেমেয়ে হলে তোর কি অবস্থা হবে জানিস! যেচে বড় বড় বাড়ির মেয়ের বাবারা তোর কাছে আসছে।···তুই কিন্তু হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলছিস। ভেবে দেখ, আমি তোর ভালোর জন্যই বলছি।"

পুল্লাইয়া নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিল। সে বলল, "আপ্পা, মানুষের সঙ্গে নাকি দুটো জিনিস থাকে। বেঁচে থাকতেও থাকে, মরে গেলেও থাকে। একটা হল কীর্তি আর একটা হল অপকীর্তি। এ দুটোর মধ্যে আমার একটা জুটবেই। বাঁচলেও থাকবে, মরে গেলেও থাকবে। যাই হোক এ বিয়ের ব্যাপারে সমস্ত ভার

আমি তোমাকেই দিচ্ছি।"

আপ্পা দাঁড়িয়ে পড়ল। "দেখ, এই জগতে বাঁচা কি যায় না, যায়। জল হোক, দুধ হোক, ফ্যান হোক একটা কিছু জুটবে। প্রাণ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। একটা বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করলে তোরই ভাল হত। তোর ভালর জন্যই বলেছি। যাক, ওই নীলির ভাগ্যে যদি থাকে তোকেই বরণ করে নেবে। আমি বড়, আমার উপর যখন ভার দিয়েছিস, তোর মা বেঁচে থাকলে তার যেমন লাগত আমারও তেমনি লেগেছে। তাই তোকে অত কথা বলেছি। আমি লোকের মন জোগানো কথা বলি না। মুখ দেখে কথা বলার অভ্যেস আমার নেই। পেছনেও কারো নিন্দে করি না। মনের কথা মুখের উপর বলে ফেলি। তুই নীলিকেই বিয়ে কর। তোর ঘরে ওর পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন লক্ষ্মী আসে। আমার মত লোক তোকে কিছু বললে, মনে রাখিস তোর মঙ্গলের জন্যই বলব। তোর অমঙ্গল কামনা কক্ষনো করিনা। মেয়েকে দিয়ে খবর পাঠাব। দেখি কি হয়···ভাল কথা, সোনাদানার কথা কি বলব?"

পুল্লাইয়া মাথা নেড়ে বলল, "ওসব কথা তোলার দরকার নেই।" আপ্পা মুখ টিপে হেসে বলল, "ঐ বুড়িটা নাতনীর জন্য কিছু যে রাখেনি তা আমার মনে হয় না। নিশ্চয় কিছু না কিছু রেখেছে। একেবারে খালি হাতে বিদেয় করবে না! ঠিক আছে, তুই আয়। তুই তো আবার বলদগুলোকে চান করাতে যাবি। আমি এদিকে দেখি কত-দূর কি করতে পারি।"

পুল্লাইয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বারান্দা থেকে নেমে শিস্ দিতে দিতে হাওয়ায় যেন উড়ে গেল।

পাঁচ

আইবুড়ো পুল্লাইয়ার বিয়ে ঠিক হল। এই বিয়ের ব্যাপারে এক একজন এক এক রকম ভাবল। সারা গাঁয়ের লোকের কাছে পুল্লাইয়ার বিয়ের ব্যাপারটা একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল।

যার কোন রূপ নেই, রং নেই, বলতে গেলে যার কেউ নেই কোন কিছু নেই তার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে এমন এক পুরুষের যার চরিত্র সম্পর্কে কোনদিন কোন কথা ওঠেনি। এর আগে কত লোকে যে পুল্লাইয়াকে বিয়ের কথা বলেছিল তার হিসেব নেই। যে সব মেয়ের বাড়ির লোক এসেছিল তাদের যে কোন লোকের বাড়ির অবস্থা নীলির বাড়ির অবস্থার চেয়েও অনেক ভাল। এ বিয়ের এমনই মজা, বিয়ের এদিক ওদিক দু দিকের খরচ পুল্লাইয়াকেই করতে হবে।

কেউ ভাবল, এটা নেহাৎ পুল্লাইয়ার দুর্ভাগ্য, কপালের লিখন। নানান জনের

নানান মত। কেউ কেউ আবার পুল্লাইয়ার মুখের ওপরেই মনের কথা জানিয়ে দিল।

এক বুড়ি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "অভিশাপ, অভিশাপ। মানুষের অভিশাপ একটু না একটু লাগবেই।"

তারপর পুল্লাইয়ার বিয়ের প্রসঙ্গ থেকে শুরু হয়ে কথার পিঠে অনেক কথা উঠল। কোন এক কালে এক দম্পতি ঐ গাঁয়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। গাঁয়ের কয়েকজন লোক ওদের দেখে নাকি খুব হাসাহাসি করেছিল। স্বামী ছিল বেঁটে খাটো মুখটা ভাঙ্গাচোরা। আর বউটা ছিল সুন্দর লম্বা, ফর্সা, পূর্ণ যৌবনা। স্বামীকে দেখে লোকে হাসাহাসি করায় ঐ পতিব্রতা নারী নাকি ভীষণ রেগে গিয়েছিল। সেই নারী নাকি অভিশাপ দিয়ে বলেছিল, "এই গাঁয়ের মেয়ের কপালে এই গাঁয়ের ছেলেই জুটবে।" তারপর থেকে না জানি কেন ঐ গাঁয়ে এক বাড়ির ছেলের সঙ্গে অন্য বাড়ির মেয়ের বিয়ে হতে থাকে। এ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ও বাড়ির ছেলের বিয়ে হয়। ও বাড়ির ছেলের সঙ্গে এ বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়। ফলে গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই থাকত।

যথারীতি নীলির কপালেও ঐ গাঁয়েরই ছেলে জোটায় পুরোনো কথাটা আবার উঠল।

বিয়ের ব্যাপারে নীলি এক কথায় রাজী হয়ে গেল। কথাটা কানে যেতেই পুল্লাইয়া খুব খুশী হল। "এই সেই মেয়ে যে আমাকে দুদিন আগে বলেছিল অসভ্য। আমার নাকি লজ্জা নেই···কেমন এখন? কেমন জব্দ? তখন তো শুধু একটু ধরব বলেছিলাম। দাঁড়াও না, বিয়ের পরে ওকে জিজ্ঞেস করব না, গোঁফে তা দিয়ে জিজ্ঞেস করব, 'কি আমার লজ্জা করছে না তোমার লজ্জা করছে? বল? আমার এই কথাটা শুনে ও আর একটি কথাও বলতে পারবে না।' আপন মনে বলতে বলতে পুল্লাইয়া গোঁফে তা দিলে।

সারাদিন পুল্লাইয়ার মাথায় এক চিন্তা। মনে মনে বলল, "ছিঃ ছিঃ, কি হল আমার। এ রকম তো আমার কোনদিন হয়নি। নীলি একেবারে আমার মনে বাসা বেঁধে ফেলেছে। তাই বলে আমি ওর কাছে মাথা নোয়াব না। ও যে ভাবে আমাকে বলেছে আগে ওর কথার মোক্ষম জবাবটা দিতে হবে। তারপর···আমার ছেলে! সোনার দেশ···সোনার ধান···আমার সোনার ছেলে!" বলতে বলতে লাফিয়ে উঠল।

বিয়ের দিন পুল্লাইয়ার বাড়ির সামনে বিয়ের ছাদনা তৈরি হল। আদেম্মাপ্পার চলাফেরা দেখে বোঝা গেল তার হাত দিয়েই বিয়ে হচ্ছে। শ'দুয়েক টাকা সে পুল্লাইয়ার কাছ থেকে নিয়েছিল। পুল্লাইয়ার লতাপাতায় যত আত্মীয় ছিল সবাইকেই নেমন্তন্ন করা হল।

নীলির মায়ের মা অর্থাৎ নীলির দিদিমার একটিও দাঁত নেই। প্রত্যেকদিন সে দিন গুণত। তার জটধরা চুলে আদেম্মাপ্পা ভাল তেল মাখিয়ে দিল। ভাল শাড়ি পরাল। এই বয়সেও বুড়ির চোখে ঔজ্জ্বল্য ছিল। তার চোখে আশার আলো ফুটে উঠত।

যৌবনে বুড়ির চেহারা ছিল ঠিক নীলির মত। নীলি বাচ্চা বয়স থেকেই দিদিমাকে

জেনে আসছে। বুড়ির স্বামী খুব নেশাভাঙ করত। নেশার ঘোরে বুড়িকে ধোলাই দিত। মারতে মারতে হাড়গোড়গুলো ভেঙ্গে দিত। বুড়ি কারও কাছে অভিযোগ করত না। তার ধারণা ছিল স্বামীর বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলা উচিত নয়। সে তার যৌবনের সমস্ত সুখ আনন্দ তার স্বামীর পায়ে উজার করে ঢেলে দিয়েছিল। ছেলে-মেয়েও হয়েছিল। হয়ে বড়ও হয়েছিল। সব কটি নয়। কয়েকটি। কেউ খেতে না পেয়ে মরে গেল কেউ না খেতে পেয়েও জোর করে বাঁচল। ওসব কথা ভাবলে বুড়ির মাথা ঘোরে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাতে থাকে।

বুড়ির এখন আর কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছে ঐ মেয়ের মেয়ে। নাতনী। এই নাতনীর জন্যই বুঝি ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সানাই বেজে উঠেছে। বুড়ি বারান্দায় বসে। বিয়ের দুটো পিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। সকালে যে আচার বিচারের কাজ হওয়ার কথা ছিল তা হয়ে গেছে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল।

বরের যেন একটু ক্লান্তি লাগছিল। পাশের তেঁতুলগাছের ডালে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে নীতবরও গাছে উঠল। ডালে বসে পুল্লাইয়া চারদিকে তাকাতে লাগল। এই সেই গাছ! এখানেই এই গাছের আড়ালে নীলির রূপ, নীলির চাউনি, নীলির গান সব কিছু সে শুনেছিল। দেখে ভুলেছিল। মজেছিল। তার দেহে জোর করে চুমো খেয়েছিল। হাতের তালু দেখে আপন মনে বলল, "আর কত দেরি!"

গোধূলি বেলা। গরু বাছুরের চরে ফেরার পালা। ওরা এসে গোশালায় ঢুকল। মেয়েরা কলস কাঁখে, মাথায় করে যাওয়ার সময় আড়চোখে একবার পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে গেল। দু পা গিয়ে বলাবলি করল, "ও তো বুড়ো হয়ে গেছে।" কেউ বা মুখ টিপে টিপে হাসল। ওদের ঐ ভাবে মুখ টিপে টিপে খিলখিল করে হাসতে হাসতে এঁকে বেঁকে যেতে দেখে পুল্লাইয়ার মনে হল এ ধরনের একটা মেয়েছেলের কাছে আমি বাঁধা পড়লাম। ওরা নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে বলাবলি করছে। করুক। জিদ ধরেছিলাম জিদ বজায় রেখেছি। পুরুষ মানুষের জিদটাই আসল। যার জিদ নেই সে আবার পুরুষ মানুষ নাকি! বলতে বলতে সে গোঁফে তা দিতে লাগল।

গাছের ডালে বসে নদীর দিকে তাকাল। নদীর তীর দিয়ে গরুর গাড়ি যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাসও যাচ্ছে। রাস্তার ধার দিয়ে যাচ্ছে গাই বাছুরের দল। মানুষের যাতায়াত লেগে আছে। অনেকক্ষণ পুল্লাইয়া সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

সানাই আর ঢোলের বাজনা শোনা গেল। ওরা আসছে। নীতবর লাফ দিয়ে গাছ থেকে নামল।

পুল্লাইয়া নতুন জামা ও ধুতি ঠিকঠাক করে নিল। জরির কাজ করা চাদর কাঁধে ফেলে নিল। মাথার পাগড়িটা ঠিক করে নিল।

মেয়েরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে এল। ওরা সবাই তার

পাতানো বৌদি। ওদের হাসিঠাট্টা ভাবগতিক দেখে পুল্লাইয়ার লজ্জা করল। সে মাথা নিচু করে নিল। নীতবর দিব্যি মাথা তুলে বকবক করে বলে গেল, "মাথা তোল। লজ্জা পাচ্ছ কেন? পণের টাকা চাও!" সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেয়েরা হাসতে হাসতে বলল, "নাও না লুকিয়ে রেখেছি।"

সানাই বাজছে। পুল্লাইয়ার বিয়েতে সবাই মাতব্বর। ওদের বাড়াবাড়িতে বর যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছে। কোন এক জাতভাই চিৎকার করে ডাকছে, "পুল্লাইয়া এদিকে এসো, এদিকে এসো।" ও নাকি কি এক সূত্রে মামা হয়। কয়েকটি ছেলে জোরে জোরে বলল, "পিঁড়িতে বসবে না, কিছুতেই বসবে না।" ওদের কথার জবাবে অন্য কে যেন জিজ্ঞেস করল, "কেন বসবে না?" তার একই কথা বিভিন্ন স্বরে বেরোতে লাগল।

কিছু লোক স্বেচ্ছাসেবকের মত এগিয়ে এসে পুল্লাইয়াকে তুলে বসিয়ে দিল। পুল্লাইয়ার কানে যাচ্ছে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কথা। অভিমান হয়েছে। ওর তো বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না. জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই অভিমান হয়েছে। ছেলেগুলোর আনন্দ যেন আরও বেশি। মেয়েরা খিলখিল করে হাসছে আর ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, "কি গো, পুরুষমানুষ, খুব তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে, বিয়ে করব না। এখন?" বলে, আর মুখের দিকে তাকায়। যারা বলছে তারা কেউ তার বৌদি, কেউ আবার সম্পর্কে শালী। একটা মেয়ে আবার ফুরফুর করে ঘুরছিল তার কাছে। কিছুদিন হল শাড়ি ধরেছে। তার দিকে পুল্লাইয়া মিটমিট করে তাকাল। যেই না তাকানো অমনি সে গান ধরল। এমন গান যা শুনতে শুনতে পুল্লাইয়ার মনে হল সে যেন গানটা বানিয়ে বানিয়ে গাইছে। তাকে উদ্দেশ্য করেই গাইছে। তার মনে খোঁচা দেওয়ার জন্যই গাইছে। সে গাইছিল:

কি হয়েছে? কি হয়েছে? রাগ করে তুমি বনে কেন?
ঘোড়া নেই? হাতি নেই? তাই বুঝি রাগ হয়েছে?
ঐ তো আছে কানা কুকুর, ওতেই চড়ে এসো না?
চন্দন নেই? তাই বুঝি তোমার রাগ হয়েছে?
বেশ তো বাপু মোষের গোবর মেখে না হয় এসো না!
লতাপাতা নেই বুঝি, তাই তোমার রাগ হয়েছে?
শিমপাতা আছে তাই খেয়ে নেবে এসো না!
সুপুরিও নেই বুঝি, তাই তোমার রাগ হয়েছে?
তেঁতুলবিচি তো আছে বাপু পানে দিয়ে খাও না!
কি হয়েছে, কি হয়েছে, রাগ করে তুমি বনে কেন?

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে হাসল। একে অন্যের গায়ে চিমটি কাটল। ইতিমধ্যে কিছু বরপক্ষ ও কনেপক্ষের লোকের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে। কে যেন ছুটে এসে খবর দিল, "পুরুত ঠাকুর খবর দিয়েছেন, লগ্ন আর দেরি নেই। তাড়াতাড়ি এসো।"

একসঙ্গে সবাই নড়েচড়ে উঠল। এতক্ষণ যারা বরের মান ভাঙাতে ব্যস্ত ছিল তারা সবাই বিয়ের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। যে লোকটা পুল্লাইয়ার শ্বশুর সেজে এতক্ষণ মাতব্বরি করছিল সে তখনও পুল্লাইয়ার হাতে কিছু ছোঁয়ায়নি। তবু তার কথাতেই পুল্লাইয়াকেও উঠতে হল এবং তার পিছন পিছন যেতে হল।

পুল্লাইয়া ছাদনাতলায় গেল। সানাই বেজে উঠল। বুড়ি বারান্দা থেকে দেখতে লাগল। সন্ধ্যার সময় লগ্ন। বিয়ের পিঁড়িতে বসেও যে এত ঠাট্টার কথা শুনতে হয়, মেয়েদের হাতে এত চিমটি খেতে হয় তা পুল্লাইয়া জানত না। যত না লোক তার দ্বিগুণ কোলাহল। বিয়ের ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের গলার জোর অনেক বেশি। বরপক্ষ আর কনেপক্ষের লোকের মধ্যে মান অভিমানের পালাও কম নয়। পুল্লাইয়ার মা-বাবা নেই বলেই হয়ত তার বিয়েতে মাতব্বরি করার সখ সকলেরই ছিল।

জিদ পূরণ হল। পুল্লাইয়া কনের গলায় সেতুমানম্ (মঙ্গলসূত্র) বেঁধে দিল। হলুদ মাখানো চাল বরকনের মাথায় ছুঁড়ে সবাই আশীর্বাদ করতে লাগল। এরপর শুভদৃষ্টির পালা। সবাই উসখুস করছে। এ যেন বরকনের পরস্পরের দিকে তাকানো নয়। বরকনের দিকে সকলের তাকানো।

নীলির মুখে হলুদ মাখা আছে। বাসন্তী রং এর শাড়ি তার পরণে। হাত ভরতি কাচের চুড়ি, কানে দুল, নাকে নথ টানা, গলায় মটরদানা মালা, মাথায় এক ঢাল কালো চুলের খোঁপা। কপালে কুমকুমের টিপ। পুল্লাইয়া চোখ তুলে তাকাল নীলির দিকে। তারপর খুশী মনে নড়েচড়ে বসল।

ওর রকম সকম দেখে বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসতে লাগল। আদেম্মাপ্পার মনে হল যেন তার মাতব্বরীব সময় শেষ হয়ে আসছে। সকলের চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

পুরুত ঠাকুর কলার চোকলা ছাড়িয়ে বরের হাতে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সানাই বেজে উঠল একবার। সকলের চোখ বরের হাতের দিকে। গ্যাসবাতির আলোয় জায়গাটা দিনের মত দেখাচ্ছে।

তারপর পুল্লাইয়া পুরুত ঠাকুরের কথামত চোকলা ছাড়ানো কলাটা অর্ধেক নিজে খেয়ে বাকি অর্ধেকটা নীলির মুখে পুরে দিল। কনের ঐ অর্ধেক কলা খাওয়ার পর পুরুতঠাকুরের কথামত পুল্লাইয়া বলে যেতে লাগল, "যেহেতু তুমি আমাকে বিয়ে করেছ সেই হেতু আজ থেকে কাজ করে যত টাকা পাব তার অর্ধেক তোমাকে দেব।" তারপর আর একটা চোকলা ছাড়ানো কলা অর্ধেক কনে নিজে খেয়ে বাকিটা বরের মুখে পুরে দিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে পুরুতঠাকুরের কথামত বলল, "যেহেতু তুমি আমাকে বিয়ে করেছ সেই হেতু আজ থেকে আমার বাপের বাড়ি থেকে অথবা বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন যার কাছ থেকে যা পাব—আমার সব কিছু তোমার হাতে তুলে দেব।"

এই কথাগুলো পুরুত ওদের দুজনকে দিয়ে বলালো। তারপর উঠে দাঁড়াতে বলল। পুল্লাইয়া দাঁড়াল বটে কিন্তু তার গোটা মন জুড়ে ঐ কথা ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ঐ

কথাগুলো মনে গেঁথে যাওয়ার ফলে সে কনের দিকে আর একবার ভালভাবে তাকাল। এখন আর দূরের কোন এক নীলির দিকে তাকাচ্ছে না—এ হল তার নিজের নীলি, তার বউ। কয়েক মুহূর্ত আগেও নীলি তার বউ ছিল না। এখন তার হল। এতক্ষণে তার জিদ পূরণ হল। ভাবতে ভাবতে পুল্লাইয়া সগর্বে ও সদম্ভে বউয়ের দিকে তাকাল।

তারপর নবদম্পতি পালকিতে বসে গ্রাম পরিক্রমায় বেরোল।

ছয়

নদীর তীরে ঝাউগাছ আর ফুলগাছ। বাতাস বইছে সেই গাছের উপর। চারদিকে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। নতুন বর দাঁতন করতে করতে নদীতে চান করতে গেল। অন্য যারা চান করছিল তারা ঘুরে ফিরে পুল্লাইয়ার দিকে তাকাচ্ছিল। প্রসন্ন সকালের আলোয় নদী চকচক করছিল। এ রকম সময়ে নতুন বরকে যেন আরও ভালো দেখাচ্ছিল। গাঁয়ের মেয়েরা অন্য ঘাটে চান করতে করতে পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছিল। অনেক গরুবাছুর নদীর তীরে চরছিল। মাটির বুক থেকে ঘাস ছিঁড়ে ওরা তুলছে আর চিবোচ্ছে।

এ সব কিছুই পুল্লাইয়ার নজরে পড়ছিল। চারদিকেই সে তাকাচ্ছিল কিন্তু দেখছিল না। কোন কিছু দেখার তার মন নেই। মন পড়ে রয়েছে নীলির কাছে। অত রাত পর্যন্ত পালকিতে ঘোরা হল কিন্তু নীলি একবারও মুখ তুলে বসে তার দিকে তাকায়নি। তার কাজল লাগানো চোখের দিকে একবার ভালো করে দেখার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তা হল না। হাত দিয়ে তার মুখ তুলে দেখা যেত কিন্তু পুল্লাইয়ার লজ্জা করল।

দাঁতন করতে করতে পুল্লাইয়া এতক্ষণ বসেছিল। উঠে দাঁড়াল। দাঁতন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নদীতে নেবে গেল পরনে তখনও বিয়ের কাপড় ছিল। গায়ে তখনও হলুদ লেগে আছে। অন্যদিনের মত বেশিক্ষণ চান করল না। তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। ভেবেছিল সোজা ঘরে ঢুকে নীলির হাত জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু বারান্দায় আদেম্মাপ্পা বসেছিল। তাকে দেখেই তার সেই চিন্তা উবে গেল।

সারাটা দিন সে ছটফট করতে লাগল। বাইরে কোথাও যায়নি। কেউ এলে তার বিরক্তি লাগছিল। কয়েক মুহূর্তও আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। একবার খিড়কির দরজায় নীলির হাত ধরতে গিয়েছিল কিন্তু সে চট করে এঁকে বেঁকে চলে গেল। সে ইচ্ছে করলে ছুটে গিয়ে তাকে ধরতে যে পারত না তা নয়, কিন্তু নীলি তো জুবুথুবু মেয়ে নয়, সেও ছুটতে পারে। ছুটতে ছুটতে সে যদি একবার বারান্দায় চলে যায় তাহলেই তো সর্বনাশ। সেখানে আদেম্মাপ্পা বসে আছে।

সেদিন দুপুরে সবাই ঘুমোচ্ছিল। না জানি কোন কাজে নীলি খিড়কির দরজার দিকে গেল। পুল্লাইয়া মনে মনে বলে উঠল, এই তো পেয়েছি। তার দিকে দু পা এগোতেই নীলি ঝট করে ঘুরে এঘর ওঘর করে বারান্দায় এসে বুড়ির কাছে বসে পড়ল। পুল্লাইয়া ভাবল, "পাখিটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে।"

পুল্লাইয়া ঠোঁট কামড়ে ঠোঁটটা যেন শক্ত করে নিল। "এই হল জিদ। পুরুষ মানুষের গোঁফ না থাকলে সে আবার পুরুষ মানুষ নাকি। লজ্জা পাচ্ছে কে এখন? আমি না সে? দাঁড়াও না সুযোগ পাই, ঠিক জিজ্ঞেস করবো।" মনে মনে বলতে লাগল।

এ কথা সে কথা ভাবতে ভাবতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। মনে তখনও সেই কথার আনাগোনা চলছিল। খাওয়াদাওয়া শুরু হল। ঘর ভর্তি বউদিদের ভিড়। শালীরাও আছে বেশ কয়েকজন।

ফুলশয্যার রাত্রি। সব মিলিয়ে একটা বাহার ছড়িয়ে রয়েছে। ভাল মন্দ খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। এক এক সময় এক একদিক থেকে বউদি আর শালীরা পুল্লাইয়ার উদ্দেশ্যে কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে। বিয়ে করে দেখ কেমন বোকা হয়ে গেছে। আমাদের কথাগুলো হাবাগোবার মত শুনছে কিন্তু একটি কথারও জবাব দিচ্ছে না।

সে ছিল সম্পর্কে বউদি। কালো শক্ত সমর্থ চেহারা বয়স তিরিশ হবে। তিনটি বাচ্চার মা। পুল্লাইয়ার হাতে একটি রূপোর টাকা দিয়ে স্বামী স্ত্রীর হাত একসঙ্গে জুড়ে দুজন নিয়ে ফুলশয্যার ঘরে ঢুকল। মেয়েরা সব ওদের পেছনে পেছনে ঢুকল। দুজনকে শয্যায় পাশাপাশি বসানোর পর সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। তখনও কিছু মেয়ে নীলির কানে মুখ রেখে কি যেন হাসতে হাসতে বলছিল।

পুল্লাইয়া একভাবে ঘাড় কাত করে বসেছিল। সেই বউদি, "এই চল, চল বাইরে যাই" বলে সবাইকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে নিজে পুল্লাইয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। পুল্লাইয়া ঐ টাকা বউদির হাতে দিয়ে দিল। বউদি হাসতে হাসতে টাকাটা নিয়ে বলল, "খুব সাবধান। মনে রেখো, বিয়ে করা শুধু শোয়ার জন্য নয়। হাজার চোখে বউয়ের উপর নজর রাখতে হয়। তার উপর নীলির মা-বাবা কেউ নেই। মা হারা মেয়ের অভিমান একটু বেশিই হয়। এখন তুমিই ওর বাবা-মা-স্বামী। তুমি যদি ওকে ঠিক ভাবে দেখাশোনা কর তুমিই সুখ পাবে। ওকে ভালো রাখলে তুমিও ভালো থাকবে। যা বললাম মনে রেখো···মনে রেখো কিন্তু। খুব সাবধান বলে দিচ্ছি।"

বউদি সরে গেল। পুল্লাইয়া বড় বড় চোখে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকাতে তাকাতে তার চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে এল। বউদি দরজা টেনে গেলেও সে ঠায় ঐ দরজার দিকেই তাকিয়ে রইল।

"মনে রেখো, বিয়ে করা শুধু শোয়ার জন্য নয়" এই কথাগুলো মনে তোলপাড় খাচ্ছিল। পুল্লাইয়ার এই কথাগুলো মনে তোলপাড় খাচ্ছিল। পুল্লাইয়া এই কথাগুলো

ভাবতে ভাবতে নীলির দিকে তাকাল। সমস্ত শরীরে কেমন যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভাবল ঝট করে ওকে কাছে টেনে নেবে। কিন্তু নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাঠের বাক্সের উপর প্রদীপ জ্বলছিল। ঘরের বাইরে থেকে ফিস ফিস শব্দ ভেসে আসছিল। একবার ভাবল আলোটা নিভিয়ে দিই, কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছে করল না তা করতে।

নিজের ঘর। তবু আজ মনে হচ্ছে অন্য ঘর। আজ প্রথম তার মনে হল মেয়েদের বুঝিয়ে বাগে আনা বড় শক্ত।

হঠাৎ নীলির হাত ধরে ফেলল। নীলিও ঝট করে হাত টেনে নিল। মাথা তুলতে বললে, নীলি আড়চোখে তার দিকে তাকাল। যা করতে বলছে তা না করায় পুল্লাইয়ার ভাল লাগল না। ভাবল, তার মত পুরুষের চোখের ইশারায় ডাকলেই নীলির আসা উচিত। "মেয়েটা তো খুব জ্বালাতে পারে। সকাল থেকে দেখছি ওর মুখটা কেমন ঝুলে আছে। এর কারণ কি? আমার না হয় জিদ ছিল কিন্তু ওর কি ছিল?" মনে মনে বলল।

অনেকক্ষণ সে একভাবে ঐ কাঠের বাক্সের উপর এককোণে বসে রইল। বোবার মত মাথা নিচু করে নীলি বসে রইল। পুল্লাইয়ার মনে হল এতো আচ্ছা সমস্যায় পড়লাম।

ঘরের বাইরে থেকে আর কোন শব্দ ভেসে আসছে না। আগের রাত্রে কারও চোখে ঘুম ছিল না। এখন হয়ত যে যার বাড়ি ফিরে গেছে।

নীলি একটু মাথা তুলে দরজার দিকে তাকাল। তারপর আড়চোখে তাকাল স্বামীর দিকে।

পুল্লাইয়ার চোখ তখন নীলির উপর ছিল না। তার মনে তখন স্মৃতির প্রদীপ জ্বলছিল। সে সেই প্রদীপের সলতে একটু উপরের দিকে তুলে মনে মনে ভাবল, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে···তেঁতুলগাছের ডালটাও নুয়ে রয়েছে···এই ধরণের রাতেই নীলির গান সে শুনেছিল, "চাঁদমামা, চাঁদমামা"···সেদিনের স্বপ্ন আজ সফল হল। সেদিনের জিদ আজ পূর্ণ হল। জিদ না থাকলে পুরুষ কিসের। জিদটাই আসল। এবার জিজ্ঞেস করব, অসভ্য কে? লজ্জা করছে কার?"

ঝট করে উঠে দাঁড়াল। পাশে বসে বলল, "নীলি আমার দিকে তাকাও।" নীলি তাকাল না। গোঁফে একবার হাত দিয়ে পাক দিয়ে নিল। নীলি সেই সময় তার দিকে তাকাল। আর ঠিক তখনই গোঁফ পাকাতে পাকাতে পুল্লাইয়া মুখ টিপে হাসল।

"আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছ?" এবার নীলি আর একটু বেশি মাথা তুলে তাকাল। পুল্লাইয়া নীলির চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা আর একটু উপরের দিকে তুলল। "ভালো করে তাকিয়ে দেখ। কেমন দেখাচ্ছে, চোরের মত না সাধুর মত।"

কোন জবাব দিল না নীলি। আহত হরিণের মত পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে

রইল।

পুল্লাইয়া হেসে ফেলল। গোঁফটা ঠিক করে নিয়ে বলে ফেলল, "বলেছিলাম তোমাকে ধরবো···ধরেছি।"

নীলি ঝট করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে হাসল। পুল্লাইয়া আবার নীলির মুখ তুলে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "এখন কে লজ্জা পাচ্ছে তুমি না আমি?" বলেই হা হা করে সশব্দে হাসতে লাগল।

যতক্ষণ হাসছিল ততক্ষণ নীলি তার দিকে তাকিয়েছিল। খুশীতে যেন ডগমগ তার স্বামী। কি জবাব দেবে এসব কথার। জবাব দেওয়ার কি আছে? হেরে যখন গেছে, গেছে।

হঠাৎ নীলি হেসে ফেলল। পুল্লাইয়া তার দিকে তাকাল। তার চাউনি দেখে নীলি আবার হাসল। পুল্লাইয়া আনন্দে হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ নীলি মাথা নিচু করে ফেলল। মাথা নিচু করেই সে হাসতে লাগল।

এই তো কি যেন বলছে নীলি!

"তোমার কাছে হেরে গেছি···!"

পুল্লাইয়া মহানন্দে হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ হারতেই হবে।"

নীলি শাড়িটা ঠিক করে নিয়ে দাঁড়াল। ঐ কাঠের বাক্সের কাছে গিয়ে প্রদীপের সলতেটা একটু নাবিয়ে আবার এসে বিছানায় বসল। বসে স্নিগ্ধ হাসি মাখা চোখে পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "যা বলব ভেবেছিলে তা তোমার বলা হয়ে গেছে?"

নীলি বলতে বলতে পুল্লাইয়ার কাছে বসল। সে তখন আপন মনে বলে যাচ্ছে, "গোঁফ দেখে বুঝতে পারনি আমি কি ধরনের পুরুষ মানুষ? নিজের উপর আমার গর্ব আছে। জান আমি কোন বংশের ছেলে? আমাকে বলেছিলে, অসভ্য, লজ্জা করে না। এখন তুমিই বল না কে অসভ্য? কার লজ্জা করছে? কথাগুলো সে মনে মনেই বলছিল। আর ঠিক সেই সময় নীলি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। স্বামীর বুকে হাত দিল নীলি। পুল্লাইয়া নড়ল না চড়ল না ঠায় বসে রইল।

নীলি তার বুকে আস্তে আস্তে মাথা রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "দেখ, তুমি যা করেছিলে তা কি ভালো?"

"দোষ কি আমার?"

"দোষের কথা বলছি না। দেখ, তোমার বউকে অন্য কেউ যদি···তুমি সে রাত্রে আমাকে যা করেছিলে, তা করত তখন তোমার কেমন লাগত। অত কেন। তুমি যা করেছিলে তা যদি আমাকে অন্য কোন পুরুষ করে, আমি যদি তার হাতে ধরা দিই, তার কাছে নিজেকে সঁপে দিই তাহলে কতবড় অন্যায় করব বল তো? আর তা যদি তুমি জানতে পার তোমার কেমন লাগবে?"

পুল্লাইয়া আড়চোখে নীলির দিকে তাকাল। নীলি আরও স্বামীর কাছে সরে গিয়ে

তার হাত নিজের মুঠোয় ধরে অন্য হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দেখ তোমার চোখে ধুলো দিতে পারি সংসারে সকলের চোখে ধুলো দিতে পারি কিন্তু ভগবানের চোখে ধুলো দিতে পারব ? আমাদের ভালমন্দ দেখার লোক উপরে আছেন। ন্যায়ের পথে না চললে বাঁচব কি করে ? আর অন্যায় পথে চললে বেঁচে কি লাভ ?

স্নিগ্ধ পরিবেশে সে নরম কথার মালা গেঁথে গেল। এই মেয়েটা বাপের বাড়িতে দু বেলা পেট ভরে খেতে পায়নি। এই সেদিনও রাত্রে নেচে কুঁদে গেয়ে বেড়াচ্ছিল। বিয়ের সময় এমন ভাব করে বসেছিল যেন কিচ্ছু জানে না। বিয়ের পিঁড়িতে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল যেন। আর সেই মেয়ে কিনা এখন একটা জেদী পুরুষমানুষকে জ্ঞান দিচ্ছে !

পুল্লাইয়া একটু নড়েচড়ে বসল। সেই মুহূর্তে তার মনে হল নীলি তার বউ নয়। অন্য কেউ যেন তাকে পবিত্র বাণী শোনাচ্ছে। কথাগুলো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তার কানে। মনে মনে বলে উঠল সত্যি আমারই দোষ হয়েছে।

নীলি স্বামীর আরও গা ঘেঁষে বসে দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। নীলি জানে তার বিয়ে করার আগে পর্যন্ত বহু মেয়ে এই লোকটাকে মনে মনে স্বামী হিসাবে পেতে চেয়েছিল। এহেন এক বলিষ্ঠ যুবককে দেখে দু-একদিন তার মনেও ইচ্ছে যে জাগেনি তা নয়। কিন্তু লাভ নেই ভেবে মন থেকে সে তা মুছে ফেলেছিল। যাকে কল্পনায় পেতে চেয়েছিল তাকে আজ সে কত কাছে পেয়েছে, কত আপন করে পেয়েছে। নীলির মনে হল আর সে কিচ্ছু চায় না। এই সুঠাম দেহধারী পুরুষকে পেয়ে তার মনে হল সে সব কিছু পেয়ে গেছে।

নীলির চোখের কোণে জল···ঠোঁটে অর্থহীন হাসি দেখে পুল্লাইয়া বউকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "নীলি···আমার নীলি···আমার···একেবারে আমার নীলি।" সমস্ত শরীরে যেন তার বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার মনে হল, "নীলিকে জড়িয়ে ধরে এত আনন্দ পাচ্ছি। এত সুখ আছে এতে!" সেই মুহূর্তে তার মনে হল এতদিন তার জীবনটা মরুভূমিতে কেটেছে। ফসল ভরা নিজের ক্ষেতের দিকে তাকালে যে আনন্দ হয়, যত গর্ব হয়—নীলির দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়ার সেই মুহূর্তে তত আনন্দ তত গর্ব হচ্ছিল।

তার চোখের কোণের জল পুল্লাইয়া মুছে ফেলল। তার হাসিমাখা ঠোঁটের কাছে নিজের ঠোঁট নিয়ে গেল।

সাত

নীলির লজ্জা শরতের সাদা মেঘের মত সরে যেতে লাগল। পুল্লাইয়ার কাছে তার আর কোন লজ্জা নেই। পুল্লাইয়ার দিকে সে যখন তাকায় তখন তার চাউনিতে এমন এক

ভাব ফুটে ওঠে যাতে মনে হয় সে নতুন করে দেখছে। তার চোখে ফুটে ওঠে আশা আর অনুরাগের আলো। পুল্লাইয়াকে দেখে সে মুখ টিপে হাসে।

পুল্লাইয়া তার হাসিমুখ দেখে হাসে। ক্ষেতে খামারে যে লোকটা খেটেখুটে আসে তাকে গুছিয়ে কিছু খেতে দিতে হয়। সেটা নীলি জানে। কিন্তু দেবে কিসে? ঘরে একটাও ভাল পাত্র নেই। কড়া হাঁড়ি কলসী কোনটাই ভাল নেই। নীলি ভেবে পায় না কি ভাবে লোকটা এতদিন কাটিয়েছে।

বউকে ঘরের কাজে সাহায্য করতে চাইত পুল্লাইয়া। নীলি হাসিমুখে তাকে বারণ করত। দু' একটি ঘরের কাজ করে পুল্লাইয়া ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছে সে কতবড় কাজের লোক। তারপর নীলি আর তাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে সাহস পায় না।

নীলি কাজ করতে দেবে না অথচ পুল্লাইয়ার কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে। সে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। আবার বাইরে ঘুরে বেড়াতেও তার ইচ্ছে করছে না। তাই সে যখন তখন নীলিকে ছোঁয়। নীলি হাসিমুখে তার হাত সরিয়ে দেয়।

চান করার আগে নীলি পুল্লাইয়ার গায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। নদীর জলে চান করে পুল্লাইয়া। নদীর মাটি সে সাবানের মত গায়ে মাখে। ঐ মাটি দিয়েই গা রগড়ায়। তারপর প্রবহমান জলে একটু সাঁতার কেটে স্নান সেরে বাড়ি ফিরে আসে। ফেরার পর নীলি তার মাথা ভাল করে মুছে দেয়। মোছার পর চুল বেশ করে আঁচড়ে দেয়। পুল্লাইয়ার সময় মত খাওয়া জোটে, চোখে ঘুম ধরে, মন আনন্দে ভরে যায়।

ইদানিং তার বদনাম হয়ে যাচ্ছে। সে নাকি ঘরকুনো হয়ে গেছে, বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকে। পুল্লাইয়া দিনে একবার ক্ষেতে যায়। বাকি সময়টা ঘরে বসেই কাটায়। পাড়ার লোক এক একজন এক একরকম মন্তব্য করে। কেউ পেছনে আলোচনা করে। কেউ সামনে তাকে ঠাট্টা করে। আখড়ায় যায় না। গেলেও বেশিক্ষণ থাকে না।

"নতুন বউ তো! তার উপর অধিক বয়সে বিয়ে। হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছে।" একজন বুড়ো বলল।

আখড়া থেকে ফেরার পথে কথাগুলো পুল্লাইয়ার কানে গেল। একজন বলছে আর চারজন হাসছে। তার খুব রাগ হল। সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে বারান্দায় মাথা গুঁজে বসে পড়ল। বউয়ের কাছে দুদণ্ড বেশি থাকলে কেন যে এত কথা ওঠে তা সে বুঝতে পারে না। বউ এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে আঁচলে তার মাথা ঢেকে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

চট করে আঁচল সরিয়ে রাগের স্বরে পুল্লাইয়া বলল, "বিয়ে যখন করিনি ওরা রোজ বলত, পুল্লাইয়া বিয়ে কর, বিয়ে কর। রোজ ঠাট্টা করত, আমার নাকি বিয়ে করার ক্ষমতা নেই। আবার এখন ওরাই ঠাট্টা করে বলছে আমি নাকি বউয়ের আঁচল ধরে

সব সময় বসে থাকি। মুখ আছে বলেই আজেবাজে কথা বলতে হয়।"

নীলি হেসে লুটোপুটি খেয়ে বলল, "তাই বুঝি তোমার এত রাগ হয়েছে। ওরা কেন বলেছে জান, তুমি তো কোনদিন মেয়েছেলের ধার ধারতে না, ওরা তো ওরকম ছিল না। আর এখন বিয়ের পর তুমি দুদণ্ড ঘরে থাক এটা আসলে ওদের ভালই লাগে তাই তোমাকে ঠাট্টা করে খেপানোর চেষ্টা করে। ওদের কথায় তুমি খেপবে কেন? তুমি ঠাট্টাকে ঠাট্টা হিসেবেই নেবে। বিয়ের পর সবাই একটু আধটু ঠাট্টা করে।"

পুল্লাইয়া মুখ তুলে নীলির দিকে তাকাল। তার মনে হল নীলিও তার দিকে শুধু তাকিয়ে নেই, তাকে গভীর ভাবে দেখার, জানার চেষ্টা করছে।

তার জিদ যে কি ধরণের তা ফুলশয্যার রাত্রেই নীলির জানা হয়ে গেছে। নীলির চেয়ে সে যে অনেক উপরে তা যেন এখনও প্রমাণিত হয়নি—এটাই পুল্লাইয়ার অনুমান। তার প্রতি নীলির ভয় ভক্তি অভিমান অনুরাগ সব মিলিয়ে কেমন যেন হয়ে আছে। এতে সে গর্বিত।

দীপাবলী পেরিয়ে গেছে। এল সেই নাগ পঞ্চমীর দিন। সারা গাঁয়ে সাজ সাজ রব। মেয়েরা সেজেগুজে বাটি করে দুধ আর ডিম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সাপের গর্ত খুঁজে খুঁজে দুধ আর ডিম ঢেলে দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটি টেনে নিচ্ছে দুধ আবার কোথাও সাপ ডিম মুখে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বাজী পুড়ছে। হলুদ আর আল্পনায় সাপের গর্তের কাছাকাছি জায়গাটা সাজিয়ে যাচ্ছে একের পর এক মহিলা।

ওরা বাড়ি ফিরে এল। বুড়ি নাগের কাছে মানত করল, "আমার নাতনীর যদি ছেলে হয়, তার নাম রাখব নাগরাজ। পুল্লাইয়া পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার কানে গেল কথাটা। সে বলেই ফেলল, "আমার ছেলের নাম? আমার পেটে নাকি আমার বাবা জন্মাবে। আমার বাবাকে গাঁয়ের সবাই গুঁফোনাইডু নামেই চিনত। আমার ছেলে হবে ঠিক আমারই মতন। ঐ নাগের মত শুধু ফোঁস্ ফোঁস্ করবে না।"

"ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলতে নেই।" বুড়ি বলল।

"বলব না কেন? আমার ছেলের নাম হবে মল্লনাইডু।"

তারপর বুড়ি ও পুল্লাইয়ার মধ্যে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়। খিলখিল করে হাসতে হাসতে ওদের কাছে এসে নীলি বলল, "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল···এখানে আর ঝগড়া নয়। ছেলে হলে দুটো নামই রাখা যাবে। নাগরাজ ও মল্লনাইডু। এর কোনটাই খারাপ নয়। আর তা ছাড়া নামে কি এসে যায়।"

"এসে যায় না? ওসব চলবে না। আমার বাবার নাম আমাকে রাখতেই হবে। না রাখলে বাবা স্বর্গে বসে খুব রাগ করবেন।"

"করবেন বই কি, নিশ্চয়ই করবেন।" তৃতীয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"ওরে কানা, তুই ঠিক কথাই বলেছিস।" বলতে বলতে পুল্লাইয়া বেরিয়ে এল।

হাতে লাঠি নিয়ে লম্বা অন্ধ লোকটা তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। তার হাড়ের

খাঁচা দেখে বোঝা যায় এক সময় তার শরীর কি বিরাট ছিল। পুল্লাইয়া কথা বলছে এমন সময় নীলি বারান্দায় পাতা ফেলল। তারপর ঐ পাতে পরিবেশন করে অন্ধ লোকটাকে খেতে দিল। ওর নাম ভেঙ্কান্না। লোকে ডাকে গুড্ডি ভেঙ্কান্না বলে (গুড্ডি মানে অন্ধ)।

খেতে খেতে গুড্ডি ভেঙ্কান্না বলল, "বাপের বাড়িতে ফ্যানে ভাতে দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে। এখানে এসেছি, চার রকম ভাল মন্দ খেতে দিলে। এই দেহ চিরকাল থাকে না। মানুষের কাজটাই থাকে। ব্যবহারটাই আসল।

ভিখিরীর গলা শুনে ভিখিরী আসে। একটা বুড়ি এগিয়ে এসে বলল, "ভেঙ্কান্না, তোমার সাড়া পেয়ে এলাম।"

"তুই বুড়ি এখনও ঘাটে যাসনি? কোমর তুলতে পারিস না। সাতরাজ্য ঘুরে বেড়াস কি করে?" গুড্ডি ভেঙ্কান্না বলল।

"তোমরা ঝগড়া করো না। গন্নেম্মা তুমি এদিকে এসে বসো। এদিকে, এদিকে। এখানে তোমার পাত ফেলেছি।" বলতে বলতে নীলি একটি পাতা ফেলল।

"বসে খাবো না মা জননী। বেঁধে নিয়ে যাব। একবেলা অত খেলে ওবেলা চলবে কি করে?"

"এক ধামা টাকা আর এতখানি জমি রেখে বেটি ভিক্ষে করছে। ওর হাতে একটি ভাতের কণা কাকেও খেতে পারেনি। বুড়ি, বলি, না খেয়ে না দেয়ে এত যে করলি কি হল? খেয়ে নে, খেয়ে নে, এখানে বসে খা। পেটে যা খাবি সেইটেই তোর। বাকি সবটাই পরের।" বলল গুড্ডি ভেঙ্কান্না।

বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে গন্নেম্মা ভাত পোঁটলা বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

গুড্ডি ভেঙ্কান্না বুড়িকে দু'একটি গালাগাল দিয়ে, "জান পুল্লাইয়া, ঘোড়ার এতবড় লেজ থাকে। চিংড়ীর ইয়া বড় গোঁফ থাকে কিন্তু কি হবে? মানুষ বৃথাই গর্ব করে। বলছিলাম ঐ রাজুর কথা। আমার ওপর এখনও ওর রাগ গেল না। আমিও দেখছি। জান তো, সিংহ একদিন বুড়ো হয়, না খেতে পেয়ে অসুখে পড়ে যায়। তাই বলে ঘাস খেয়ে বেড়ায় না। শকুনের অভিশাপে গরু মরে না।"

"যা, যাতো। তোকে আমার বেশ চেনা আছে। চোখ না হারালে তুই বেটা কয়েকটা গ্রামের সর্বনাশ করতিস।"

"তা বাবা মন্দ বলনি। কথায় আছে, হাতি খাদে পড়লে চামচিকেও লাথি মারে।"

"নিজেকে হাতি সিংহ অনেক কিছুই বানাচ্ছিস দেখছি। তুই সিংহও নস, হাতিও নস, তুই হলি একটি কালসাপ। তোর বিষ লেগে তোদের পরিবারে সর্বনাশ হয়েছে। যে যেমন করে তাকে তেমনি ফল ভোগ করতে হয়।" বলতে বলতে পুল্লাইয়া রেগে গিয়ে উঠে পড়ল।

"তুমি চুপ কর তো। খেতে দিয়ে আজেবাজে কথা বলতে নেই।" তারপর পুল্লাইয়াকে চোখের ইশারা করে ভেঙ্কান্নার কাছে বসে নীলি বলল, "তোমাকে খেপাচ্ছে, তুমি ধরতে পেরেছ ?"

ভেঙ্কান্না হেসে বলল, "মা নীলি, আমি কি আর বুঝিনি ! আগেকার দিনে আমাকে সবাই বাঘের মত ভয় করত। আমাকে বসিয়ে দিল আখড়ার পুল্লাইয়া। চার জনের কাছে আমার বদনাম হয়ে গেল। তোমার কর্তার সুনাম হল। কিচ্ছু বলার নেই মা, কলি কাল। আশীর্বাদ করি, তোমার হলুদ আর কুমকুম অক্ষয় হোক। তোমরা দুজনে সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো।"

"যা, যাতো। তোর আশীর্বাদে আমাদের কাজ হবে না। তুমি হলে তেলি, আমি হলাম গয়লা।"

"জাত তুলে কথা বলছ কেন ? আকাশের নিচে যত মানুষ আছে সব এক জাতের।" নীলি বলল।

"মাগো, তুমি কত দামী কথা বললে। তুমিই পারবে তোমার কর্তার রাগ জল করে দিতে। তুমিই পারবে ওকে শান্ত করতে।" বলতে বলতে উঠে হাতড়ে লাঠি ধরে "যাচ্ছি গো মা" বলে চলে গেল সে। নীলি এগিয়ে দিল। সেটা টের পেয়ে ভেঙ্কান্না বলল, "আসলে আমার ব্যাপারটা আজও কেউ জানে না মা···"বলেই সে কেঁদে ফেলল।

"কেঁদো না বাবা। আমাদের হাতে কিচ্ছু নেই। তবে মানুষ না জানলেও ভগবান সব জানেন। উনিই একদিন বিচার করবেন।"

"মাগো, তুমি ছোট হলেও কত বুদ্ধি রাখো। বড় সত্য কথা বল তুমি।"

বেলা গড়িয়ে গেল। ক্ষেতের ফসলে সোনালী রং। মাথা নেড়ে দুলে দুলে ওরা যেন কত কথা বলছে। বাতাসের সঙ্গে ওদের কথার আদানপ্রদান। ধান কাটার আর বেশিদিন বাকি নেই। দিন এগিয়ে এল। তখন সারাদিন খাটতে হয়। বিশ্রাম করার সময় থাকে না। কোন জমিতে, কত ধানে কত চাল হবে তার হিসেব নিকেশ চলছে। যুবক কৃষকেরা করে এক রকমের হিসেব, বুড়ো কৃষকদের হিসেব করার কায়দা অন্য রকমের। শুধু কত ধানে কত চাল নয়, কত খুদ, কত কুঁড়ো তারও হিসেব নিকেশ হচ্ছে। খুদ কতদিন চলবে কত কুঁড়োতে কটা গরুর কবেলা চলবে তারও হিসেব নিকেশ হচ্ছে। শুধু নিজেদের চলাই তো নয়, তার থেকে ধোপা নাপিত ডোম এদেরও কিছু কিছু খুদ দিতে হয়। বাদবাকি যা বাঁচবে তাই দিয়ে সারা বছর কারও চলে কারও চলে না। এই ধরণের হিসেবের পালা চলে এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। সব হিসেব করে গালে হাত দিয়ে হতাশ হয়ে অনেকেই বসে পড়েছে।

নীলিও হিসেব করে। তবে তার হিসেব অন্য ধরনের। তার মতে, শরীর যদি ঠিক থাকে, হাতে পায়ে যদি ক্ষমতা থাকে, খেয়ে পড়ে বাঁচা যায়।

একসঙ্গে সারাদিন ক্ষেতের আনাচে-কানাচে ঘুরে, ফিরে এসে পুল্লাইয়া নীলিকে জিজ্ঞেস করল, "পা কামড়াচ্ছে না ?"

নীলি এই প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই পুল্লাইয়ার মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে ? কি ভাবছ ?"

পুল্লাইয়া চট করে রেগে বলল, "ঐ পাপী লোকটাকে আর ঐ বদমাইস বুড়িটাকে তোমায় খেতে দিতে কে বলল ?"

নীলি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, "কে পাপী কার কথা বলছ ?"

"পাপী নয়ত কি ? জানো, ঐ বুড়িটা কত কিপ্‌টে ছিল ? টাকার জন্য সে স্বামীকে মেরে ফেলেছে। আর ঐ কানাটা তো চোর। এক নম্বরের চোর।"

নীলি মুখ টিপে হেসে স্বামীর কোমর দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, "এই কথা, দেখ···"

"কি আর দেখব ? ব্যাটাচ্ছেলের চোখ গেছে কিন্তু দম্ভ যায়নি। আর ঐ বুড়িটা, নুয়ে পড়েছে, আজ বাদে কাল ঘাটে যাবে তবু তার লোভ গেল না।"

"আমাদের নেই ? সবাই তো আর সমান নয়। তোমার পায়ে যত জোর আছে তোমার হাতে কি অতটা আছে ? না কি একই রকম দেখতে ? এক একজনকে তোমার কেন যে এত অসহ্য লাগে বুঝতে পারি না। কথায় আছে, অসহ্য লাগলে আয়ু কমে যায়···এই দেখ···"

পুল্লাইয়া বউয়ের দিকে তাকাল। তার মুখে প্রশান্ত হাসি। সে থেমে থেমে বলে গেল, "সুরাম্মার ভাণ্ডারে কত ছিল। ভেঙ্কাম্মা তার সব কিছু শেষ করে ফেলল। শেষে সুরাম্মা মরে গেল। বেচারি···এই ভেঙ্কাম্মার হাতির মত চেহারা ছিল। এখন দেখ ঘাটের মড়া হয়েছে। আর ঐ গন্নেম্মা কত বড়লোকের বাড়ির বউ ছিল। আজ তাকে ভিক্ষে করে বেড়াতে হচ্ছে। তুমি জানো না···পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পেট হল সমুদ্র। সকাল হলেই পেট খাঁ খাঁ করে। পেটের জন্যই চলতে হয়। আর এই পেটের জন্যই চলতে চলতে পা হড়কায়। মাটির হাঁড়িতে রান্না করে চামড়ার হাঁড়িতে ঢালতে হয়। একজনের হাতের নিচে থাকার চেয়ে হাতের উপরে থাকা কি কম ভাগ্যের কথা ···তাই বলি, অমন করো না।"

নীলির কথার পিঠে কথা বলতে পারল না পুল্লাইয়া। নীলি তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পুল্লাইয়ার মনের ভেতরে নীলির কথাগুলো চুঁয়ে চুঁয়ে ঢুকতে লাগল। দু হাত দিয়ে নীলিকে পুল্লাইয়া জড়িয়ে ধরল। নীলি তখন হাসতে হাসতে বলল, "আমার মা বলত, যে তুলো বাতাসে ওড়ে সে তুলো বেশিক্ষণ থাকে না। তুমি কথায় কথায় অমন উড়ে যেও না। পায়ে চোট পেলে তোমার হাত কি চুপ করে থাকে ? সারা গাঁয়ের লোক যদি খেতে না পায় নিজেদের পেট ভরে খেতে কি ইচ্ছে করে বল ?"

স্বামীকে জড়িয়ে ধরেই তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। কোন জবাব দিতে পারল না পুল্লাইয়া। জবাব দিতে তার ইচ্ছেও করল না। সে নীলিকে আরও কাছে টেনে তার মাথাটাকে বুকে রেখে দিল। পরস্পরকে বোঝার, বোঝানোর সে এক পরম মনোরম মুহূর্ত যেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনেরই চোখের কোণে জল দেখা দিল।

আট

আজ যে গুড্ডিভেঙ্কান্না গতকাল তার নাম ছিল ভেঙ্কাইয়া। বাচ্চা বয়সেই তার বাবা মারা গেল। তার মা তাকে বাপের বাড়িতে রেখে আর একজনের সঙ্গে সংসার করতে চলে গেল। কিন্তু তার সেই সংসার সুখের হল না। মাতাল স্বামীর মার খেতে খেতে তার হাড়গোড় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ঐ অবস্থায় তাকে বেশিদিন কাটাতে হয়নি। ছেলে বড় হওয়ার আগেই সেও মারা গেল। ভেঙ্কান্নার দাদুর একপাল ছাগল ছিল। বাচ্চা বয়স থেকেই ভেঙ্কান্না দাদুকে খুব জ্বালাত। চরানোর সময় কোন ছাগলের বাচ্চা হলে নিদেন পক্ষে তৃতীয় বাচ্চাটি সে গায়েব করে দিত। জলের দামে ঐ ছাগলছানাটিকে বিক্রি করে দিত। যারা কিনত তাদের খপ্পর থেকে রাত্রে সেই ছাগলছানাটি পাচার হয়ে যেত। বিক্রি করে যা পেত তার দশ ভাগের একভাগ ভেঙ্কান্নার বন্ধুদের ভাগ্যে জুটত। একদিন না একদিন ঘটনাটা দাদুর কানে আসত। দাদু আক্ষেপ করে বলত, এখনও গোঁফ গজায়নি, এই বয়সেই যদি এই ধরণের চুরিচামারি করে তাহলে বড় হয়ে কি করবে। তখন তো একেবারে দিনে ডাকাতি করবে। নিজের ছেলে হলে হাড়গোড় ভেঙ্গে দিতাম। নাতিকে মারধোর করলে লোকে আমাকেই দোষ দেবে। এই যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হত তাহলে সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে বিদেয় করা যেত। বিয়ের পর যা করার স্বামী করত। যাক আমি আর কতদিন। কপালে যদি দুঃখ থাকে ভুগবে। ভালোভাবে যদি চলে দুবেলা দুটো ঠিক খেতে পাবে।" তার দাদু মনে মনে বলত।

রাতারাতি যেন ভেঙ্কান্না যুবক হয়ে গেল। হাতের আঙ্গুলগুলো মনে হত লোহার তৈরি। পাথরের সঙ্গে কুস্তি করার তাগত ছিল তার শরীরে। সে ইচ্ছে করলে গাছ উপড়ে ফেলতে পারে। মুখের আদলটা ছিল বেশ সুন্দর। চুরিচামারি করলেও গরীব দুঃখীদের দানধর্ম করত। এই দানধর্মের জন্যই দাদুর বিশ্বাস ছিল ভেঙ্কান্নার হয়ত তত পাপ হবে না। শরীরের উপর ভেঙ্কান্নার গর্ব ছিল। আখড়ায় খুব নাম করেছিল। তার সামনে লাঠি ধরার লোক আর কেউ ছিল না। বড় বড় গোঁফ রেখেছিল সে। গোঁফে তা দিয়ে জানুতে আওয়াজ করে আখড়ায় দাঁড়ালে তার মোকাবিলা করতে কেউ এগিয়ে আসত না। তার মামা তার সঙ্গে আর থাকতে চাইল না। তার দাদু তাকে

বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। শেষে মামা আলাদা সংসার পাতল। যে কটা ছাগল ঐ পালে ছিল সে কটাই রইল। বাড়ল না। বুড়ো নাতিকে দুবেলা গাল দিত। আবার খেতেও দিত। মাঝে মধ্যে বুড়োর দু চোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়ত। নাতিকে জড়িয়ে ধরে মা-বাপ হারা ছেলে বলে খুব কাঁদত। ভেঙ্কান্না অস্বস্তি বোধ করত। তার কান্না পেত না। মা-বাবার কথা সে ভাবতও না। কোন-কিছুই সে ভাবত না। ভাবনা যে কি জিনিস তাও জানত না সে। শুধু একটি দিন সে কেঁদেছিল তার দাদু মারা যাওয়ার দিন। তার পরের দিন পর্যন্ত সে মুখে কিছু দেয়নি। পরের দিন খিদে পেলে যান্ত্রিকভাবে বলে উঠল, "দাদু খেতে দাও।" তারপর থেকে সে আর বেশিক্ষণ ঐ ঘরে থাকতে পারত না। পাড়ায় বেরিয়ে পড়ত। পাড়ায় তার সঙ্গে কেউ কথা বলত না। কেউ ওর কাছে ঘেঁষত না। দূরে দূরে থাকত সবাই। বাচ্চারাও তার দিকে মুখ তুলে তাকাত না। এমন কি কুকুরগুলোও ওকে দেখলেই ছুটে পালাত।

একবার ভেঙ্কান্নার প্রশ্ন জাগল, আমি কি এত খারাপ ? চুরি করেছি, যারা বাধা দিয়েছে তাদের মেরেছি। যারা চাবি দেয়নি তাদের উপর জোর খাটিয়েছি। মেয়েদের বুকে ছোরা ঠেকিয়ে অলঙ্কার খুলে নিয়েছি। সব কিছুই করে সে বাড়ি ফিরে আসত। সেখানে তার কোন ভয় ছিল না। দাদু তাকে আগলে রাখত। এখন দাদু নেই। ঘরটা ফাঁকা।

ভেঙ্কান্না মনে মনে ভাবল, এখন আমাকে আরও খারাপ হতে হবে। খারাপ না হয়ে উপায় নেই। ক্ষমতা যখন আছে, চেয়ে তো পাবো না লুটেপুটে খেতে হবে। চুরিচামারি না করলে খাবো কি ? এ জগতে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ পরের জন্য কাঁদে না। আমিই বা কাঁদতে বসবো কেন ? যা হয় হবে। চরিত্রে যদি দাগ পড়ে পড়বে। খারাপ যখন হয়েছি আরও খারাপ হব। মানুষ মরে গেলে দুটি কথা পড়ে থাকে। লোকে যা বলে বলবে। বলদ মরে গেলে হাড় পড়ে থাকে। আমি মরে গেলে কি হবে ? আশপাশের গাঁয়ের লোকও আমার কথাই আলোচনা করবে। হাঁটতে হাঁটতে ভেঙ্কান্না এসব কথা ভাবছিল।

আমি মরে গেলে লোকে আমার কথা ভাবতে গিয়ে দাদুর কথাও পাড়বে। দাদুকে কেউ খারাপ বলবে না। দাদুর কথা মনে পড়তেই ভেঙ্কান্নার বুকটা দুঃখে ভার হয়ে গেল। চোখে এক-ফোঁটাও কিন্তু জল ছিল না। সামনে আর পথ নেই। কাছেই ছিল সুরইয়ার বাড়ি। ভেঙ্কান্না ওদের বারান্দায় বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। মেঝের উপর দাদুর ছবি ভেসে উঠল। মনে হল, সেদিকে তাকিয়ে সে কাঁদছে।

সুরইয়ার বাড়িটা বিরাট। দশ একর নিচু জমি আছে। সুন্দর একটি মেয়ে। নাম সুরাম্মা। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি তার কথাও মিষ্টি। বয়স হলেও মেয়েটি এত আদুরে যে তার বাবা তার এখনও বিয়ের ব্যবস্থা করে নি। তার খুব ইচ্ছে ভাল

পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর জামাই করে রাখার।

ভেঙ্কান্নার দিকে তাকিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে সুরাম্মা হঠাৎ বলে ফেলল, "বেচারি।" ভেঙ্কান্না কথাটা শুনেও শুনল না।

"দেখে তো মনে হচ্ছে পেটে দানাপানি কিছু পড়েনি। ভাত খাবে?" কোকিল-কণ্ঠী সুরাম্মা বলল।

মুখ তুলে ভেঙ্কান্না তার দিকে তাকাল। সহানুভূতি মাখা চোখে সুরাম্মা তখনও তার দিকে তাকিয়ে ছিল। মনে মনে সে খুব খুশী হল।

ঠিক এই সময় সুরাম্মার মা ভেতর থেকে ডাক দিল, "সুরাম্মা, কুকুরের মুখে লাঠি পুরিস না। ভেউ ভেউ করবে।"

আমাকে কুকুর বলল! তাও ভাল। তবে আমি কি কুকুরের মত অত বিশ্বাসী! হোক বা না হোক এ আমাকে অপমান করার জন্যই বলা হয়েছে। তার ধন দৌলত না থাকতে পারে। কিন্তু সেও তো মানুষ। না, এ অপমান অসহ্য!

"কাকে বললে গো মা? কি সব বলছ?" বলতে বলতে সুরাম্মা উঠে পড়ল।

ভেঙ্কান্নার দিকে জোর করে হাসিমুখে তাকিয়ে সুরাম্মার মা বলল, "সত্যি তোমার দাদুর চেহারা চোখের সামনে ভাসছে। কত ভালো লোক ছিলেন তিনি।"

ভেঙ্কান্নার আবার দাদুর কথা মনে পড়ল।

"ঠিক বলেছেন মা। বুড়োকে খুব জ্বালিয়েছি। আমার জন্যে বেচারার খুব বদনাম হয়ে গেছে। সকলের কাছে দাদু আমার খারাপ হয়ে গেল। আমিই তার জন্য দায়ী।"

দুঃখে আর কোন কথা তার গলা থেকে বেরোল না। ইতিমধ্যে রান্নাঘরের বারান্দায় খাবার পরিবেশন করে সুরাম্মা তাকে ডাকল। তার মা একটি কথাও বলল না। ভেঙ্কান্না "খাবো না" বলে চলে যাচ্ছিল। এই প্রথম সুরাম্মার মা তার চোখে জল দেখল।

চলে যাওয়ার জন্যে উঠলেও বেশিদূর যেতে পারল না। সুরাম্মা যেন তাকে অলৌকিক শক্তি দিয়ে বেঁধে টানতে লাগল। আবার মুখ ফেরাল। জয়ী হওয়ার মত সুরাম্মা মুখ টিপে টিপে হাসল। কিন্তু কোন কথা বলল না। সেই ভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ভেঙ্কান্নার কি যে হয়ে গেল সেখান থেকে সে এক পাও এগোতে পারল না। সোজা গিয়ে বাড়া ভাতে বসে পড়ল। সুরাম্মার মা ততক্ষণে গোশালে ঢুকে গেল। সুরাম্মা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লজ্জায় ভেঙ্কান্না তার দিকে তাকাতে পারছিল না। আবার একবারও না তাকিয়ে পারল না। খেতে খেতে মনে হল এই দুদিনেই তার শরীরটা কমে গেছে।

ভেঙ্কান্নার শরীরটা যেন ছিল ভীমের শরীর। খাওয়ার সময়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার শরীরের দিকে তাকিয়ে রইল সুরাম্মা। সে একটিমাত্র কথা বলল, "তুমি কত ভালো লোক।"

ভেঙ্কান্না কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। এই জগতে তাকে ভালো বলার লোক তাহলে আছে। যার চাল নেই চুলো নেই তাকেও এরকম একটা ধনী পরিবারের মেয়ে ভাল বলতে পারল!

তার এত আনন্দ হয়েছিল যে সে খেতে পারছিল না। মুখটা তুলে আড়চোখে সুরাম্মার দিকে তাকাল। শিল্পীর আঁকা ছবির মত সুরাম্মা বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। তার মনটা কেমন হয়ে গেল। একবার নয় কয়েকবার তাকাল সুরাম্মার শরীরের দিকে। যে অংশে তাকায় সেই অংশটাই তার ভাল লাগে। সুরাম্মার সমস্ত শরীরটা যেন রূপের আকর হয়ে আছে। ঝট করে উঠে পড়ে বলল, "মনে রেখো সুরি, আমার মত খারাপ লোক জগতে আর একটিও নেই।"

উঠেই এগিয়ে যেতে লাগল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। এমন ভাবে চলে গেল যেন সে কোন প্রতিজ্ঞা করে চলে যাচ্ছে।

নীড় হারা পাখির মত কয়েকদিন টানা ঘুরে বেড়াল। সুরাম্মা ডেকে পাঠাল। না জানি কেন ভেঙ্কান্নার ভয় করল। যাওয়ার সাহস হল না। সুরাম্মা টাকা পাঠাল। টাকা যে এনেছিল পরক্ষণেই তার হাতে দিয়ে বলল, "মেয়েছেলের টাকা আমি চাইনে। তারপর সে যে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। তিন পক্ষকাল পরে গৌরী পূর্ণিমার দিনে আবার ভেঙ্কান্না এল।

আকাশে চাঁদ তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। সারা গাঁয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা। গৌরাম্মা দেবীর ঘটের পরিক্রমা চলছে গাঁয়ে। সঙ্গে আছে বাজনা। যুবকরা নানা রকমের লাঠির খেলা দেখাচ্ছে। যার শরীরের উপর সুরাম্মার চোখ গেঁথে গিয়েছিল হঠাৎ সেই শরীর উৎসবের মধ্যমণি হয়ে গেল। ভেঙ্কান্নাকে সেখানে দেখতে পেল সুরাম্মা। লোকের মিছিল গৌরাম্মার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আনন্দে মুখর ঐ মিছিল। কেউ গাইছে, কেউ নাচছে। ভেঙ্কান্না ঐ মিছিলের সঙ্গে গেল না। তাকে থেমে যেতে দেখে সুরাম্মাও সঙ্গীসাথীদের এড়িয়ে গেল।

তাদের খিড়কির দরজার কাছে খড়ের গাদা ছিল। সে যা ভেবেছিল তাই হল। ভেঙ্কান্না ওদের খিড়কির দরজার দিকে এগোচ্ছিল। সেখানে খড়ের গাদার পাশে দাঁড়াল। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। একপাও এগোল না পেছোলও না। এতক্ষণ সুরাম্মা তার উপর নজর রেখেছিল। এগিয়ে তার হাত ধরে বলল, "কেউ নেই বাড়িতে। এসো ভয় নেই।"

"আমি কাউকে ভয় পাই না। দশজন এলেও ফেঁড়ে ফেলব।"

"আমার কথা শুনবে না?"

ঐ কথার মধ্যে যেন প্রার্থনা ছিল। আর থাকতে না পেরে ভেঙ্কান্না তাকে অনুসরণ করল। জ্যোৎস্না দিনের মত ছড়িয়ে রয়েছে। রাতটা যেন দিন হয়ে গেছে।

"অনেকদিন ধরে এই দিনের অপেক্ষায় আছি। তোমাকে পেয়ে হারিয়ে যেতে

চাই…ওরা কেউ আমার মনের অবস্থা বোঝে না।"

ভেঙ্কান্না তখনও তাকে দু হাত বাড়িয়ে ধরেনি। বলল, "তুমি দেখতে খুব সুন্দর। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে তুমি। এমন বাড়িতে তুমি যাবে যেখানে থাকবে শুধু সোনা আর সোনা। আমার কি আছে বল? চালচুলো কিচ্ছু নেই। আমার মত নিষ্ঠুর পাপীর সঙ্গে কথা বলছ কেন?"

সুরাম্মা হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে বলল, "চুপ কর, শোন, আমার বিয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে। আর রাতদিন আমি তোমাকে খুঁজছি। যেদিকে চোখ যায় চল চলে যাই… চল পালাই!"

সুরাম্মা তাকে জোর করে জড়িয়ে ধরল। তার শরীর কাঁপছিল। তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছিল। ভেঙ্কান্নার মনের ভেতরে ঝড় উঠলেও বাইরে সে পাহাড়ের মত ধীর স্থির ছিল।

"তুমি আমাকে চেনো না। আমি কত কঠোর জানো? এহেন কঠোর লোককে তুমি জলের মত তরল আর তুলোর মত হালকা করে দিতে চাও।"

সুরাম্মা কোন কথা বলল না।

"না সুরি, আমি চোর। আমাকে চোরের মতই থাকতে দাও।"

পরক্ষণেই তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভেঙ্কান্নার মন গলে গেল। সে বলল, "সুরি, এই জগতে একমাত্র তুমি আমাকে ভালো বলেছ। আমি সবার প্রতি অন্যায় করতে পারি, কিন্তু তোমার প্রতি করলে আমার সেই পাপে মাটি দু ভাগ হয়ে যাবে। আমার কি আছে বল, আজ এখানে কাল যে কোথায় থাকব তার কি ঠিক আছে। দেখ সুরি, তুমি বড় আদরে মানুষ হয়েছ। বড় সুখের জীবন তোমার। সেই জীবনকে জোর করে দুঃখে ডুবিয়ে দিয়ো না।" বলতে বলতে ভেঙ্কান্না তার চোখের জল মুছে দিল। সুরাম্মা আর কাঁদল না। এক টুকরো মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিল। তার ইচ্ছাকে আর এক ইচ্ছা গিলে ফেলছে।

"আমার একটা কথা রাখবে বল?"

ভেঙ্কান্না চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে থেমে বলল, "কি?"

"এই যে।" হাত বাড়াল।

মেঘটা সরে গেল। পূর্ণ চাঁদ আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে।

সকাল হলে দেখা গেল ভেঙ্কান্না নেই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পাড়ায় সানাই বেজে উঠল। এব্রাইয়া বর। হাতির মত চেহারা। ঘানির বলদের মত নুয়ে চলে। প্রথম বউয়ের ছেলেমেয়ে হয়নি। "এই পুরুষের সঙ্গে ঘর করতে পারব না" বলে সে বাপের বাড়ি ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে ফেলেছিল। পাড়ার সবাই সুরাম্মাকে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে বলল। তাই সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকেই বিয়ে করার ভীষ্মপণ করল সে। বিয়ে হয়ে গেল। টাকা তার অগাধ। সুরাম্মার জন্য যত

খরচ করতে হয় করবে।

সুরাম্মা ঘর করতে এল। কিছুদিনের মধ্যেই সে মনে মনে বলল, "যে চাষ করে না তার জমির কি দরকার ছিল! সংসার যে করতে চায় না তার বিয়ে করার কোন দরকার ছিল না।" সেই বাড়িতে সুরাম্মার কোন অভাব ছিল না। তবে তার মনে সুখও ছিল না। দু মাস পরে ভেঙ্কান্না এক রাত্রে পাশের গ্রামে চুরি করে ফিরছিল। দেখতে পেল তিনটে লোক সেই অন্ধকারে বিরাট পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করছে। ভেঙ্কান্না বুঝতে পারল সেই পাহাড়দেহী এর্‌রাইয়া ছাড়া আর কেউ নয়। তার হাতে ছিল লাঠি। সেও ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোরদের মার খেতে হল সে রাত্রে। এর্‌রাইয়ার পা ভেঙ্গে গেল। ভেঙ্কান্নাও চোট পেয়েছিল।

সেই রাত্রে পা ভাঙ্গা ঐ কালো পাহাড়কে পিঠে ফেলে গ্রামে এনেছিল ভেঙ্কান্না। সেই দৃশ্য দেখে সবাই ভেঙ্কান্নাকে সাবাস বলেছিল। এর্‌রাইয়া কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে ভেঙ্কান্নাকে দুবেলা বাড়িতে থেকে খেয়ে যেতে বলল।

সেই হল কাল। নিজের হাতে খাল কেটে কুমীর আনা হল। সুরাম্মা বলল, "দেখ, তুমি যদি এখানে না থাক আমি আত্মহত্যা করে মরে যাব।" কান্নাকাটি করল সে।

গাঁয়ে নানান জনের মুখে আড়ালে আবডালে নানা কথা শোনা গেল। দেখতে দেখতে ভেঙ্কান্নার থাকার জায়গা হয়ে গেল এর্‌রাইয়ার বাড়ি। কাজকর্মে সে এর্‌রাইয়াকে সাহায্য করত। এর্‌রাইয়া ভাবত, পয়সাকড়ি না নিয়ে যেভাবে বেটা খেটে মরছে থাকতে চায় থাক আরও দুদিন। মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল হলে সুরাম্মার খারাপ লাগত। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই সেই বাড়িতেই খেত আর ঘুমোত। ফলে তার চেহারা আরও ভাল হল। ভেঙ্কান্না ক্রমশ লক্ষ্য করল গাঁয়ের লোক তাকে মানছে। সে দু একটি কথা বললে হাঁ করে শুনছে। কেউ কেউ বলল, "আরে মশাই বড়লোকের বাড়ির ব্যাপারই আলাদা। এর্‌রাইয়া নিজেই যখন খাল কেটে কুমীর এনেছে সে কি অত সহজে ফিরে যাবে।" কয়েকদিন পরে এর্‌রাইয়া বুঝতে পারল ও না থাকলে বউ দুঃখ পাবে। আর যাই হোক বউকে সে দুঃখ দিতে চায় না।

সুরাম্মার ছেলে হল। সবাই বলাবলি করল, "ছেলেটা একেবারে ভেঙ্কান্নার মত হয়েছে। এক আদল।" সুরাম্মার সেই একমাত্র ছেলের নাম রাখা হল রাজান্না।

গোঁফ উঠতে না উঠতেই রাজান্না ভেঙ্কান্নাকে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। খুব হৈ-চৈ হল। সেই ঝগড়াঝাঁটির ফলে ভেঙ্কান্না দুদিন এর্‌রাইয়ার বাড়িতে গেল না। সুরাম্মার জ্বর হয়ে গেল। এর্‌রাইয়া ছেলেকে ধমক দিয়ে বলল, "তুমি মার সঙ্গে ঝগড়া করবে না। তোমার মাকে বিয়ে করার পর আমার পরিবারে লক্ষ্মী এসেছে। দুহাতে আমি টাকা রোজগার করতে পেরেছি। সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমার ঘরে লক্ষ্মী থাকবে।" ছেলে তখনকার মত কিছু বলল না। এর্‌রাইয়া ভেঙ্কান্নার

বাড়িতে গিয়ে ডেকে আনল। রাজান্নার বিয়ে হল। তার বউ তার মার মত অত সুন্দরী না হলেও চেহারাটা ছিল বলিষ্ঠ। বুকে সাহস ছিল যথেষ্ট। যাকে যা বলার মুখের ওপর বলে দিত।

"তোমার বাড়িটা তো দারুণ! এতবড় একটা ছেলে থাকতে আমার মার···আমার শাশুড়ীর লজ্জা না থাকতে পারে···তাই বলে কি তুমিও লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছ? এসব কি দেখছি? ছিঃ, ছিঃ, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না!" বউয়ের কথা শুনে রাজান্নার ঘুম ছুটে গেল। ঐ কটা কথা বলেই সে থামল না। আবার শুরু করল, "এতকাণ্ড জানলে আমি এ বাড়িতে পা রাখতাম না।" বউ বললেও রাজান্না বাবাকে ভীষণ ভয় পেত। তাই তার কথা শুনে সে কি করবে ভেবে পেল না।

অন্য এক রাত্রে তার বউ বলল, "অত বড় বড় গোঁফ রেখেছ কেন বলত? তুমি যে বীর তা লোককে দেখাচ্ছ?" এই কথা কানে যেতেই রাজান্নার পৌরুষ চাগা দিয়ে উঠল। সে সোজা ঘোষণা করে দিল, "এই বাড়িতে ভেঙ্কান্না আর পা রাখতে পারবে না।" রাজান্না কথাগুলো খুব জোরে জোরে বলেছিল এবং তার কথা প্রতিবেশীরা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল। মুখে মুখে ছড়িয়ে কথাগুলো অনেকের কানেই গেল। "মার চরিত্র মেয়ে কিছুটা পায়। বউমা তা পাবে কেন?" লোকে বলাবলি করল।

এই ঘটনার ফলে সুরাম্মা একেবারে আধমরা হয়ে গেল। নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনে তার এক একবার ইচ্ছে করল পরিষ্কার মুখের উপর বলতে, "ওকে যে বাড়ি থেকে তাড়াবি ও না থাকলে তুই জন্মাতিস?" কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা মুখ ফুটে বলতে পারল না। ছেলের প্রতি তার টান কম ছিল না। একদিকে ছেলে অন্যদিকে ভেঙ্কান্না। শ্যাম রাখবে না কুল রাখবে। কোন পক্ষের বিরুদ্ধেই কথা বলতে পারল না। বাইরের ঘোষণা বাইরে করে, বাড়ির ভেতর ছেলে ঘোষণা করল, "ঐ লোকটা বাড়িতে পা রাখলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।"

ভেঙ্কান্নার খুব অভিমান হল। সেও দুঃখ পেল। কিন্তু তারও সুরাম্মাকে ছেড়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কথার পিঠে কথা এগোল। এক একবার ভাবল রাজান্নাকেই সে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে···কিন্তু কার্যত তা পারল না। শেষে ঠিক করল নিজেই সে চলে যাবে। কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া যায়। বেশ বুঝতে পারল সুরাম্মাকে না দেখে সে বেশিদিন থাকতে পারবে না।

একদিন রাত্রের কথা। রাতটা যে এত ঘন কালো হয় তা না দেখলে বোঝা যেত না। মাঝে মাঝে সেই ঘন কালো অন্ধকার রাত্রে শীতে অথবা ক্ষুধার ফলে বুড়ো শেয়াল ডেকে উঠছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। ভেঙ্কান্না এর্‌রাইয়ার বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে সেখানেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। অনেকক্ষণ শুয়েছিল কিন্তু ঘুম এলো না। তার ধারণা ছিল তার শরীরে যে রক্ত আছে তা পাপে ভরা। সে যদি এর্‌রাইয়া হত অথবা রাজান্না হত সুরাম্মা যা করল তাতে সে কি করত? রক্তে যখন

পাপ ঢুকেছে তার ইচ্ছে করল আগাগোড়া পাপী হয়েই থাকবে। ঘুমোনোর আগে তার মনে হল ধারে কাছে কে যেন আছে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চারদিকে সে তাকাল। কিন্তু সেই ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। তবে মনে হল কিছু আছে, কি একটা নড়ছে। গো-শালে গরুগুলো তখনও জেগেছিল। এককোণে শুয়ে ভেঙ্কান্না আকাশের দিকে তাকাল। কয়েকটা নক্ষত্র দেখতে পেল। ভাবল, "ভগবানের কি খেলা! জগতে আমার মত লোককে এনেছে। আবার এব্‌রাইয়ার মত লোককেও সৃষ্টি করেছে। ভগবান বেটা বেশ মজার লোক।" তারা গুণতে গুণতে ভেঙ্কান্না ঘুমিয়ে পড়ল।

চারটে লোক ভেঙ্কান্নাকে ঘিরে ফেলল। তার মুখে কাপড় পুরে দিল। তার হাত পা কষে বেঁধে দিল। শুধু একবার ভেঙ্কান্না আর্তনাদ করে উঠল। তারপর আর জোরে কাঁদল না। সব অন্ধকার। সারা জগৎ অন্ধকার। সুরাম্মাকে আর সে দেখতে পাবে না। এখন আন্দাজে বুঝে নিতে হবে। বিক্ষত চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। এখন আর সে ভেঙ্কনাইডু নয়, গুড্ডি ভেঙ্কান্না। অন্ধের মত সে কাঁদতে লাগল। তার শরীরে চার-চারটে সিংহের পৌরুষ চাগা দিয়ে উঠল। গরু-বাছুরগুলো ঘোরাঘুরি করতে লাগল। দূরের বুড়ো শেয়ালটা মুখটাকে আকাশের দিকে রেখে ডাকছিল।

শব্দ কানে যেতেই সুরাম্মা লম্ফ হাতে নিয়ে খিড়কির দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ছেলে আর তিনটে লোক দাঁড়িয়ে আছে। "ও মাগো" বলে সে চিৎকার করে উঠল। চোখের সামনে দেখতে পেল তার প্রেমিকের দু চোখের কোণ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আর থাকতে না পেরে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভেঙ্কান্নার চোখ দিয়ে রক্ত আর জল মিলেমিশে গড়াতে লাগল···ছেলে মাকে এক লাথি মেরে তার গায়ে থুথু ফেলে চলে গেল।

সুরাম্মা ভেঙ্কান্নার মুখে গোঁজা কাপড় টেনে বার করল। ক্ষুধার্ত সিংহের মত দেখাচ্ছিল ভেঙ্কান্নাকে। কিন্তু সেই সিংহ তাকাতে পারে না, দেখতে পারে না। সেই অবস্থাতেই ভেঙ্কান্না সুরাম্মাকে জড়িয়ে ধরে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। গর্জে উঠে সে বলল, "রাজুর রক্ত যতক্ষণ না পান করছি ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।"

সুরাম্মার মনে হল যেন তার শরীরে সমস্ত গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে গেছে। নুয়ে ভেঙ্কান্নার পায়ে মাথা রেখে চোখের জলে যেন তার পা ধুয়ে ফেলল।

নারী শুধু স্ত্রী সত্ত্বাই নয়, মায়ের সত্ত্বাও আছে। তার ঐ একটি মাত্র ছেলে। ছেলের রক্ত পানের কথা শুনে তার বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। ভেঙ্কান্নাকে সে দেখে এসেছে—সে যা বলে তা করে। কিছুক্ষণ পরে ভেঙ্কান্না বলল, "সুরি, আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দাও।" তার এই কথার মধ্যে কোন উত্তাপ ছিল না। ঠাণ্ডা মেজাজে আস্তে আস্তে সে এই কথাগুলো বলল। সুরাম্মার কাঁধে সে হাত রাখল।

"এক পা এক পা করে পা ফেল। আমাকে নিয়ে যাও···কোথাও দাঁড়াবে না। সব নরক। এগিয়ে চল সুরি।"

হাঁটতে হাঁটতে ভেঙ্কান্না কাঁদছিল। তার চোখের কোণ বেয়ে রক্ত আর জল গড়িয়ে মাটিতে পড়ছিল। সুরাম্মার কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সে তার চোখে মুখে মাথায় চুমো খেতে লাগল।

আবার যেন সে ফিরে গেছে অতীতে। নতুন করে যেন তার নেশা ধরেছে।

ঘরে বসল। অন্ধকার ঘর। সেই অন্ধকার ঘরে সুরাম্মা কাঁদতে কাঁদতে তাকে গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরল। ভেঙ্কান্না কাঠ হয়ে বসে থাকতে পারল না। তার রক্তে উষ্ণ স্রোত বইতে লাগল। অতীতের মত আর একবার তাদের মধ্যে রক্তের আদান-প্রদান হল।

"দেখ, আমার একটা কথা রাখতে হবে। রাখবে বল!"

ভেঙ্কান্নার মনে পড়ে গেল সেই জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির কথা। সে বলল, "কি?"

"এই যে।" বলে হাত বাড়াল। বাড়িয়ে তার হাতে হাত রাখল। আর কোন সুখ নয়, আর কোন ইচ্ছা নয়, একটি মাত্র প্রার্থনা সে করতে চায় ভেঙ্কান্নার কাছে কিন্তু তা সে করতে পারছিল না। তবু বলল, "দেখ, ছেলেটা একেবারে জানোয়ার হয়ে গেছে। মনে রেখো, ও তোমার ছেলে। আমাকে কথা দাও, তুমি ওর কোন ক্ষতি করবে না?" বলে ভেঙ্কান্নাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা গুঁজে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। অন্ধ ভেঙ্কান্না তার হাতে হাত রেখে অনেক কষ্টে কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করল। তার গলা ভার হয়ে গেছে। একটি কথাও সে বলতে পারছিল না। অসহ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল, "সুরি, সবই কর্ম-ফল।" আর বলতে পারছিল না। কিছুক্ষণ থেমে ঢোঁক গিলে বলল, "আমি যা করেছি এটা তার শাস্তি। তোমার ছেলে আমাকে এই শাস্তি দেয়নি। ঐ ভগবানই আমাকে দিয়েছে। যাক,···মরে তো যাব না। তবে···তবে সুরি, খুব কষ্ট পাব মনে হচ্ছে···" আর কান্না চাপতে পারল না। তার চোখের জল আর রক্তের ফোঁটা সুরাম্মার মাথায় পড়ছিল। আবার ভেঙ্কান্না বিড়বিড় করে বলল, "রাস্তার কুকুর যে ভাবে মরে আমিও সেই ভাবে ছটফট করতে করতে মরব। এ ছাড়া আমার কোন গতি নেই। তুমি এবার যাও সুরি।"

তারপরেও অনেকক্ষণ সুরাম্মা মাথা নিচু করে বসে রইল। শেষে উঠে ভেঙ্কান্নার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে গেল। যাওয়ার সময় মনে মনে বলল, "ভগবান, তুমি একে দেখো।"

এত কাণ্ড ঘটে গেলেও ফিরে গিয়ে তার স্বামীকে দেখল নাক ডেকে কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোচ্ছে।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু সেই গ্রামেই নয়, ভেঙ্কান্নার অন্ধ হওয়ার খবর আশ-পাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই ভেঙ্কান্নাকে দেখতে এল। সকলের সঙ্গে এব্রাইয়াও এসে কারণ জিজ্ঞেস করল।

"অন্ধকারে পথ চিনতে না পেরে কাঁটার বনে পড়ে গেছি। দু চোখে কাঁটা ঢুকে গেছে।" যারা শুনল তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করল আবার কেউ করল না। কেউ কেউ বলল, "ব্যাটা, জন্ম থেকেই চোর। কারও বাড়িতে হয়ত চুরি করতে গেছে··· বাড়ির লোক হাতেনাতে ধরে দু চোখ অন্ধ করে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে। বেশ হয়েছে। বিষদাঁত যত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।"

সুরাম্মা সেদিনের পর আর কোন দিন ভেঙ্কান্নাকে দেখেনি। তার কথা ভেবে ভেবে সে খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিল। সুরাম্মা শুধু বাপের বাড়িতেই যেত। এইভাবে ছ মাস কাটার পর সে চলে গেল। না বাপের বাড়ি নয়, যমের বাড়ি।

সুরাম্মা মারা গিয়ে বছর পাঁচেক হয়েছে। ভেঙ্কান্না তার মারা যাওয়ার পরের দিন থেকেই ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে বেরিয়ে পড়ল।

নয়

নীলি বিয়ের আগে দুবেলা পেট ভরে ভাত খেতে পেত না। ফ্যান, খুদ ইত্যাদি খেয়ে কোন রকমে পেট ভরাত। বিয়ের পর দুবেলা ভাত খেতে পেল। তার শরীরটা তেলে জলে হল। সমস্ত শরীরে যেন যৌবনের বন্যা বইতে লাগল। চোখে মুখে বুকে যৌবনের উদ্দীপনা। ঠিক এটাই পুল্লাইয়া চাইছিল। তার বউয়ের চেহারাও তার মত হৃষ্টপুষ্ট হবে। এতদিনে নীলি পাশে দাঁড়ালে মনে হয়, হ্যাঁ তার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দম্পতির মধ্যে শুধু মনের মিল হলেই তো চলে না। দেহের মিলটাও কম নয়।

তরিতরকারির বাগানে লাউ ঝিঙে তো বটেই সে বছরে আখও হয়েছিল প্রচুর। নীলি ও পুল্লাইয়া সেজেগুজে তৈরি হল বেরোনর জন্য। নীলি পরল লালপাড়ের সাদা কাপড়। খোঁপা বেঁধে চোখে গাঢ় করে কাজল লাগাল।

পুল্লাইয়া শহরে যাচ্ছে। হাতে মা কালীর সুতো বাঁধল। পাতলা কাপড়ের সাদা জামা পড়ল। ভেতরে পড়ে নিল কালো রংএর সুতোয় হাতে বোনা গেঞ্জি। সেই কালো গেঞ্জির ওপর সাদা সুতোয় কাজ করা ছিল। ধুতি দিয়ে একটা পাগড়ি বানিয়ে নিয়েছে। গলায়ও মা কালীর সুতো বেঁধে নিয়েছে। বগলে চকচকে লাঠি নিল। মাথায় বেশ করে তেল মেখে আঁচড়ে নিল। ধুতি শক্ত করে বেঁধে নিল বেরোনোর আগে আরশিতে খুব ভালো করে নিজেকে দেখে নিল।

দুজনে রাস্তায় পা রাখল। পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। সকালের রোদ ওদের পিঠে লাগছে। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগছিল। একথা সেকথা বলে দুজনে এগিয়ে যাচ্ছিল।

চারক্রোশ দূরের পথ। কতক্ষণ বা লাগবে। মহাজনের বাড়িতে যাচ্ছে। কথায় কথায় তাদের কথা উঠল। বাড়ির কর্তার নাম সীতারামস্বামী বি.এ.বি.এল উকিল। তার বাবা নবিরি গাঁয়ের তসিলদার ছিল। সে গ্রামের প্রায় অর্ধেক জমি ছিল তখনকার দিনের এক জমিদারের। সে থাকত শহরে। খাজনা আদায়ের জন্য রেখে ছিল এক তহসিলদারকে। কয়েক বছর ঠিক ভাবেই চলছিল, জমিদারের দৌলতে তহসিলদারের রোজগারও ভালই হয়েছিল। মাত্র একটি বছরে ঐ তহসিলদার জমিদারকে ধোঁকা দিয়েছিল।

সে বছর সারা দক্ষিণ ভারতে আকাল দেখা দিল। ধানের দাম চড়ে গেল। অবস্থা বুঝে সে যথারীতি যা ধান উঠেছিল, যা আদায় হয়েছিল "সব বিক্রি করে দিয়েছি" বলে দিল। কার্যত সে ঐ সমস্ত ধান লুকিয়ে রেখেছিল। আকালের বাজারে ধানের দাম যখন আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেল তখন সে সব ধান বিক্রি করে দিল। সেই টাকায় অনেক জমি কিনে ফেলল। রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল সে। ছেলেকে পাঠিয়ে দিল শহরে। চারদিকে রটিয়ে দিল ছেলেকে অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়ে কালেক্টর করে ফেলবে। ছেলেরও ধারণা হয়েছিল সে একদিন কালেক্টর হবে। তবে কথা এবং কাজের মধ্যে সব সময় মিল হয় না। এক্ষেত্রেও তাই হল। অনেক কষ্টে মাদ্রাজে গড়াতে গড়াতে লেখাপড়া করে উকিল হল।

ছেলে নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি একটি শহরে প্র্যাকটিস্ শুরু করে দিল। ওকালতির কাজ করছে তবে রোজগারের অঙ্ক শূন্য। বুড়োটাই ছেলেকে সাহায্য করত মাসে মাসে। ছেলের সংসার আর নিজের সংসারের জন্য অনেক টাকা পয়সা খরচ হত। সেই টাকা সে প্রজাদের রক্ত চুষে আদায় করত। বুড়োকে না জানি কেন প্রজারা ভয় করত। ওদের ধারণা ছিল, লোকের অপকার করার অসীম ক্ষমতা বুড়োর আছে। বুড়ো যা বলত তাই ওরা মেনে নিত। কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হয়ে বলত, বুড়োটা চালিয়ে গেল বটে। সবই কপাল। বুড়ো যখন তখন বলত "কারও যদি দু'পয়সা হয় চোখ টাটানো উচিত নয়।" এমনিতেই তখনকার দিনে লোকের ঈর্ষা একটু কম ছিল। তাই বলে যে লোকে দেখত না বুঝত না তা নয়। এই ভাবেই বুড়োর কাল শেষ হল।

শুরু হল সীতারামস্বামীর পর্ব। তার শহরে বাস করার ইচ্ছা প্রবল। ফলে তার আমলে তার গ্রামের বাড়িটা অবহেলায় অযত্নে নষ্ট হয়ে গেল। বাপ বেঁচে থাকার সময়েই সে শহরে এক বিরাট বাড়ি করে নিয়েছিল। তখনকার দিনে কুলিরা ঘাড়ে করেই ইট চূর্ণ সুরকি বয়ে আনত। প্রজাদের শ্রমে ইঁট তৈরি হল। প্রজাদের প্রায় সবাইকেই হাত লাগাতে হল ঐ বাড়ি তৈরির কাজে। অতবড় বাড়ি তৈরি করতে যা খরচ পড়া উচিত ছিল তার পাঁচভাগের একভাগ খরচেই বাড়িটা হয়ে গেল। সীতারামস্বামীর বাবার গাঁয়ের বাড়িতে বউ ছিল আর অন্য জায়গায় ছিল একটি রক্ষিতা। সীতারাম-

স্বামীর রক্ষিতা নেই বটে তবে যুবতীদের দেখলেই তার চোখগুলো কেমন যেন হয়ে যায়। মা বাবার একটিমাত্র সন্তান ছিল তার বউ। ফলে একমাত্র সন্তানের ভাগে যত সম্পত্তি পাওয়া গিয়েছিল বউয়ের নামে, তা কার্যত তারই সম্পত্তি হয়ে গেল। বউটা শহুরে ছিল না। তবে যে কোন শহুরে মেয়ের চেয়ে কম ছিল না। শহুরে বাড়ির আদব কায়দা সে জানত। শহুরে মেয়েদের মত হাতকাটা জামা পরত। মাঝে মাঝে আবার পুরু হাতা জামা পরত। শুধু শহুরে পোশাক নয় কথাবার্তা বলার ঢংও রপ্ত করে নিয়েছিল অল্পদিনের মধ্যেই। দেখতে দেখতে সে রীতিমত স্বামীকে পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলল। কোন অপরাধের জন্য কোন ধারায় কোন কেস হয় সে বিষয়েও গাঁয়ের লোক এলে দু চার কথা বলত। মেয়েমহলে বসলে এমন ভাব করত যেন একাই একশ। ওদের কাছে বলত, "উনি মুখ খুললে তো জজসাহেব হাঁ করে শোনেন। ক্রিমিনাল কেসগুলো তো একচেটিয়া ওঁর হাতেই আসে।" শোয়ার ঘরে স্বামীর কাছে যে সব গল্প শুনত সেগুলোকে রং চড়িয়ে মেয়েমহলে ছাড়ত। বলার মধ্যে এমন ভাব থাকত যেন সেও যে কোনদিন জজসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে।

সীতারামস্বামীর নাকি আগে রোগা চেহারা ছিল। বউয়ের চেহারা নাকি খুব সুন্দর এবং নাদুসনুদুস ছিল। লোকে নাকি তার দিকে প্রতিমার দিকে তাকানোর মত তাকিয়ে থাকত। এত রোগা জামাইকে মোটাসোটা করার জন্য শ্বশুরবাড়ি উঠে পড়ে লাগল। অনেক রকমের ওষুধ খাওয়াল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

সীতারামস্বামী নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল। এটা অন্য লোকে বলে না, সে নিজেই প্রচার করে। তার বউও স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল বলে সে নিজের মুখে বলে না বটে তার বউ নিজেই বলে। বউ নিজের সম্পর্কে এ ধরণের মিথ্যা কথা প্রচার করুক তা সে চায় না। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তখনকার দিনে নারীমুক্তির কথাও প্রচার করত।

তার জীবনে বিয়েটা একটা অদ্ভুত ঘটনা। এ ব্যাপারে দু একবার সে নাকি আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিল। তবে নিতান্তই সেটা অতীতের কথা। পরে তার মনে হল সে একটা পুরুষ। তার উচিত স্ত্রীকে তার নিজের অধীনে রাখা। এমন ভাবে রাখা যাতে স্ত্রী তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস না পায়। কিন্তু যা ভাবল তা করতে পারল না। বউকে দমিয়ে রাখতে পারল না। এই পঞ্চাশ বছর বয়সে পা দিয়ে দেখতে পেল স্ত্রী তার উপর হুকুম চালাচ্ছে। এমন গলা করে যে তার ভয় করে তাকে ঘাঁটাতে। বউ যা বলবে তাই করতে হবে। যে দাগ টেনে দেবে সেই দাগের বাইরে তার যাওয়া চলবে না। তবে মনে মনে সে ঐ দাগ টপকে অনেক দূর চলে যায়। তার সেই ছটফটানি, কথা অগ্রাহ্য করার ইচ্ছা যে জাগছে তা বউ লক্ষ্য করে। লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ নজর রাখে তার উপর।

সীতারামস্বামীর মক্কেলদের সংখ্যা গুটিকয়েক। বাপের রোজগার না থাকলে,

শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি কিছু না পেলে, এতদিনে তাকে সাইনবোর্ড উল্টে দিয়ে কোন আপিসে কেরাণীগিরি করতে হত। তবু যারা আসে, যে দু চারজন আসে তাদের কাছে বলে, "এই মক্কেলদের জন্যে আমি কোথাও বেড়াতে যেতে পারি না।" অন্য লোকের হাতে নাকি দায়িত্ব দিয়ে যাওয়া যায় না। ওদের খেতাব আছে। কিন্তু দূরদৃষ্টি নেই। উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই ছেলের কথা বলত। একটি মাত্র ছেলে। নাম ভেঙ্কটআপ্পালা রামনরসিংহরাও—সাক্ষাৎ ভগবান। এই নামের মধ্যে মায়ের নাম বাপের নাম, সকলের নামই মিশে গেছে। ছেলেও উকিল। ছেলে এবং বাপের দুটো সাইনবোর্ড গেটের দুদিকে ঝুলছে। দুটো সাইনবোর্ড একই মাপের। শুধু ওদের দেহের সাইজটা আলাদা। শুধু দেহ নয়, আরও কয়েকটি ব্যাপারে পার্থক্য আছে। বাপের বাজখাঁই গলা আছে। কিন্তু মগজে কিছু নেই। ছেলের মগজ পরিষ্কার, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, তবে তার গলা থেকে কথা বেরোয় না। জজসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে যা বলে তা তিনিও শুনতে পান না। ফলে কেউ তার কাছে যায় না। তাই যা আছে তাই ভাঙ্গিয়ে কোন রকমে পরিবারটা চলে।

ভেঙ্কটআপ্পালা রামনরসিংহরাও সব কিছু মনে মনে রাখে। বাপ তার জন্য একটি মেয়ের খোঁজ করল। মেয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। তবে মেয়েটি রোগা বলে ওর পছন্দ হল না। পছন্দ যে হয়নি তা মুখ ফুটে বলতেও পারল না বাপকে। ঐ মেয়ের একটি মাত্র ভাই ছিল। সেই ছেলেটিও ছিল তার দিদির মতই রোগা পাটকাঠি। রামনরসিংহরাও "রোগা মেয়ে চাই না" এই কথাটি মুখ ফুটে বলার আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ল। তবে আখেরে সে ঠকেনি। বিয়ের দশমাসের মধ্যেই ঐ একটি মাত্র শ্যালক মরে গেল। ফলে শ্বশুর বাড়ির সমস্ত সম্পত্তি সে পেল। ছেলের যে দূরদৃষ্টি, অন্তত বিয়ের ব্যাপারে ছিল তা বাবা মুখ ফুটে কাউকে বলে না। ভেঙ্কট-আপ্পালা রামনরসিংহরাওকে সবাই রাও নামেই চেনে।

বিয়ে হওয়ার চার বছরের মধ্যে রাওয়ের তিনটি মেয়ে হল। প্রত্যেকটির মুখের আদল অনেকটা মায়ের মত। বড় দুটির মধ্যে একটি ট্যারা অন্যটি কালো। বেশ বোঝা যায় বিষয় সম্পত্তি যা আছে তা ওদের বিয়েতেই খরচ হয়ে যাবে।

পুল্লাইয়ার সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক ঠাকুরদার আমল থেকে। পুল্লাইয়ার দাদু দু একর জমি ওদের কাছ থেকে ভাগ চাষের জন্য নিয়েছিল। ফলে বছরে অন্তত একবার ওদের বাড়িতে এসে ফসলের ভাগ দিয়ে যেতে হত। পুল্লাইয়ার বাবা মল্লনাইডু খুব জেদী পুরুষ ছিল। একবার সীতারামস্বামীর ভাগ দিতে দেরি হওয়ায় তাকে চোখ রাঙিয়েছিল। তার চোখ রাঙানি সহ্য করতে না পেরে সে রাতারাতি নিজের জমি বিক্রি করে দিয়ে ভাগ চুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ভাগ দিতে আর কোনদিন দেরি হয়নি।

পুল্লাইয়া শহরে যখন পা দিল তখন বেলা দুপুর। কড়া রোদ পড়েছে। উকিলের

বাড়িতেই যেন বিচার বসেছিল। বউ জেরা করছে স্বামীকে। বিষয় যে কি জানা যায় না। ছেলে চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনছে। বাপ বড় উকিল। ছেলে ছোট উকিল। লোকে তাই বলে। পুল্লাইয়াকে দেখেই বড় উকিল চেঁচিয়ে বলল, "এই যে মহারাজ পুল্লাইয়া।" বলেই হাসতে লাগল।

"মহারাজ না হলে কি আর এমন সুন্দর পুতুলের মত বউ বিয়ে করে আনতে পারে," তার বউ কথাটা লুফে নিয়ে বলল। দুজনেই নমস্কার করে সলজ্জ ভঙ্গিতে বসল। ছোট উকিলের চোখ একবার নীলির উপর পড়ল। ব্যাস। যে কোন যুবতীর উপর একবার তার চোখ পড়লেই হল। তার পরের কাজ করে তার মন। মন পরিকল্পনা করে গেল, "রাত্রে যদি এরা থেকে যায়···পুল্লাইয়া যদি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়···সে নিজে যদি বই পড়তে পডতে বারান্দায় পায়চারি করতে থাকে···আর সে সময় যদি এই বউটা জেগে থাকে···বারান্দার আলোটা জ্বালিয়ে রাখলে বউটা নিশ্চয়ই অত সকাল সকাল ঘুমোতে পারবে না···ওর চোখ বারান্দার আলোর উপর থাকবে···অথচ স্বামী তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন···। সবে মেয়েটা বিয়ে করেছে···জিনিসটা ফ্রেস বলা চলে···একবার যখন বিয়ের জল পড়েছে তখন শোয়ার সময় তো একটা ছটফটানি থাকবেই···আমার দিকে কি একবার তাকাবে না·· যদি একবার···।"

ছোট উকিলের বউ রান্নাঘরে চলে গেল। পুল্লাইয়া সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, "ঘরে মেয়েমানুষ না থাকলে কি আর দু বেলা খেতে পাওয়া যায়! হোটেলে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে। তাই এই মেয়েটাকে···"

"বাঃ বাঃ বেশ বেশ।" মাথা নেড়ে বড় উকিল বলল। বড় উকিলের বউ জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটাকে লুফে নিয়ে পুল্লাইয়া বলল, "নীলাম্মা। গাঁয়ের সবাই ওকে নীলি বলেই ডাকে।"

"বাড়ির কাজকর্ম ঠিক ভাবে করে তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখছেন না কাজ না করলে কি আর শরীর ঠিক থাকে। ঐ যে প্রবাদ আছে বসে বসে খায় মেয়ে, যমের বাড়ি যায়। খেটে খুটে খায় বউ স্বর্গে চলে যায়।"

হো হো করে হাসতে হাসতে বড় উকিল বলল, "আর আমার বাড়িতে রান্না করার লোক একজন, এছাড়া অন্য কাজ করার লোক দুজন।" বলতে বলতে আড়চোখে লক্ষ্য করল বউ তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। তার মুখে আর কথা সরল না। বাকি কথাটা বড় উকিলের বউ বলল, "আমাদের আর এ ব্যাপারে অভাব কিসের বল পুল্লাইয়া। ওঁরা তো ওকে জজসাহেব হওয়ার জন্য বলেছিল, তা উনি নিতে চান নি। কেন জান?"

"এজ্ঞে?"

"জজগিরি করলে স্বাধীনতা থাকে না। তা ছাড়া আজ বাদে কাল ভোট হবে।

ভোটে হয়ত দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ালে তো জিতবেই। জেতার পর যদি মন্ত্রিগিরি করতে হয় বুঝতেই পারছ তখন জজগিরি করবেন না মন্ত্রিগিরি করবেন ? তুমিই বল ?"

"এজ্ঞে ?"

"তোমরা বস।" ওদের বসতে বলে বড় উকিলের বউ রান্নাঘরে চলে গেল। নীলি শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে জবুথবু হয়ে বারান্দায় বসে রইল। পাশের ঘরে বসল ছোট উকিল। সেখান থেকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীলির দিকে তাকিয়ে রইল। সে সময় তার চোখের দিকে তাকালে মনে হত সে নীলিকে আপাদমস্তক দেখছে না, তাকে গিলছে।

এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত পায়চারি করার পর সীতারামস্বামী বলল, "বাঃ, বেশ ভাল মেয়েকেই বিয়ে করেছ। তবে···" থেমে গেল সে।

"এজ্ঞে ? কি বলছেন ?"

"তোমার কথা শোনে তো ?"

"শুনবে না মানে ? আমি কি তেমন লোক যে শুনবে না।" বলেই পুল্লাইয়া লজ্জা পেল।

"তা বটে···তবু ব্যাপার কি জান এই মেয়ে জাতটাকে একটু অধীনে রাখাই ভাল। এরা লাগাম ছাড়া হলে, মানে এদের ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।"

পুল্লাইয়া কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে কথাটা সঠিক অর্থ বোঝার মত ভঙ্গি করে বলল, "এজ্ঞে আপনার কথা বুঝতে পেরেছি কর্তা। বিপদ যা ঘটে মেয়েদের দিয়েই তো শুরু হয়।"

"এই, এই হল কথা। ওদের ঐ রান্নাঘরে আর ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই রাখা ভালো। বাড়ির বাইরে নিয়ে গেলে···"

কথাটা বলতে বলতে বড় উকিল বউ আসছে কিনা দেখে নিল। পুল্লাইয়া বলল, "কর্তা, স্বামীর আপনজন বলতে বউ। আর বউয়ের আপনজন বলতে স্বামী। এদের মধ্যে যদি বিশ্বাস না থাকে জগৎ চলবে কি করে কর্তা ? পুরুষ মানুষের মত ওদেরও তো মন আছে। মাঝে মধ্যে যাত্রা টাত্রা দেখাতে নিয়ে গেলে ওদের মন···"

"ওরে পাগল, বুঝবি বুঝবি, আস্তে আস্তে বুঝবি···। একটা কথা বলি শোন, যতদিন না ছেলেমেয়ে হচ্ছে ততদিন ওকে বেশি এদিক-ওদিক যেতে দিবি না।"

পুল্লাইয়া অনেক কিছু বোঝার মত মাথা নাড়ল। বড় উকিল আবার বলল, "বুঝেছি, আমার কথা তোর মনে ধরেনি। তোর আগে কয়েকশ লোক আমার কাছে এসে, এই বাড়িতে এসে, এখানে বসে আমার কাছে উপদেশ নিয়ে গেছে।···আমার উপদেশ মত চলে ওরা উপকৃত হয়েছে। কি বলব নিজের কথা, আজকাল তো আমাকে কোর্টেও যেতে হয় না। যাওয়ার সময় কোথায় বল ?"

"এজ্ঞে ?"

"তাই, আমার কথা শোন।···যত সর্বনাশের গোড়া হল এই মেয়ে জাতটা, খুব

সাবধান।" বলতে বলতে সে আর একবার বউ আসছে কিনা দেখে নিল।

পুল্লাইয়া আর কোন জবাব দিল না।

শাশুড়ী আর বউমা রান্নাঘরে কথা কাটাকাটি করছিল। শাশুড়ীকে না জিজ্ঞেস করেই বউমা রাঁধুনীকে দুজনের ভাত ফোটাতে বলেছে। এটাই হয়ত তার অপরাধ হয়েছিল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। পুল্লাইয়া ও নীলি ওদের কাছে বিদায় নিল। এতক্ষণ রাও মানে ছোট উকিল অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল। তার সমস্ত ভাবনা চিন্তা ধুলোয় মিশে গেল।

পথে হাঁটতে হাঁটতে নীলি একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। পুল্লাইয়া অন্যমনস্ক ছিল। তাকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। মুখটা কেমন ভার ছিল। তার ঐ গোমড়া মুখ দেখতে নীলির ভাল লাগে নি। নীলি ওদের বাড়ির সকলকেই প্রশংসা করছে। অনেকক্ষণ পরে পুল্লাইয়া আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "একবেলা খেয়েই এত বড়াই করছ?"

"ওভাবে কথা বলছ কেন গো?"

"সংসারে সুখ শান্তিটাই আসল। বড় বাড়ি আর অগাধ সম্পত্তি বড় কথা নয়।"

শীতের সন্ধ্যা। কথায় বলে শীতের বেলা সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। হাট থেকে গরুর গাড়ি ফিরছিল। একটা কাঠকয়লার বাস ভসভস করে পাশ দিয়ে চলে গেল। বটগাছের পাশ দিয়ে কয়েক পা যেতেই বিরাট দীঘি পড়ল। দীঘির পরে নিচু জমি। সেটা পেরোলে উঁচু জমি। তারপর নিজেদের গ্রাম। নিজেদের পাড়া।

চুপচাপ পুল্লাইয়া হাঁটছিল। অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণকণ্ঠে নীলি বলল, "অন্ধের হাতি দেখার গল্প জান? এক একজন এক একভাবে দেখে। আমি বাপু লোকের ভাল দিকটাই দেখি। কার কি খারাপ দিক আছে ওসব আমার নজরে পড়ে না। দিদিমা বলেছিল, 'অন্যের খারাপ নিয়ে মাথা ঘামালে নিজেও নাকি খারাপ হয়ে যাব'।"

পুল্লাইয়ার পৌরুষ মাথা চাড়া দিল। আর নীরব থাকতে পারল না। বলল, "শাশুড়ী আর বউয়ের কথা কাটাকাটি শুনেছ? আমরা খেতে বসার সময় কে কি করেছে লক্ষ্য করেছ? সাধে কি আর বড় উকিল বলেছে, সর্বনাশের গোড়া হল মেয়েছেলে।"

রাগে আর কথা বলতে পারল না নীলি। কাছেই পুকুর ছিল। পুকুরে পা চুবিয়ে চোখে মুখে জল দিল। তারপর পশ্চিম দিকে অস্তমান সূর্যের দিকে মুখ রেখে কিছুক্ষণ চোখ বুজল। তারপর স্বামীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "বড় উকিল ওকথা কেন বলেছেন তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব কেন? ঐ সব কথায় আমাদের কি যায় আসে? আমরা আছি আর উপরে ভগবান আছে।"

পুল্লাইয়া আড়চোখে তার দিকে তাকাল।

দশ

ধান কেটে তুলতে না তুলতেই ডাল চাষের পালা। ধান কাটার ধুম পড়ে গেছে। ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ি, খালি গায়ে আর বেরোতে পারছে না। বুড়ো বুড়িরা সন্ধ্যের পর থেকেই আগুন পোহায়। ক্ষেতের ফসল পাকলেই, ক্ষেতে ফসল ভরে গেলেই দিদিমারা নাতি-নাতনীদের গল্প বলে। ওদের আনন্দ ঐ ভাবে প্রকাশ করে। দিনে কাজ রাতে গল্প। তারপর ঘুম। মরণঘুম যেন।

ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটার পালা। কেউ বসে নেই। কারও সময় নেই। কাজ আর কাজ। ধান কাটা আর ধান তোলা। কাটা আর বাঁধা। বেঁধে বয়ে আনা। তার সঙ্গে আছে গান। ধান কাটার গান। এ গানে মেয়ে পুরুষ সবাই যোগ দেয়। কেটে কেটে গাদা করে রাখে। কেউ মাথায় চাপিয়ে আনে কেউ বা গরুর গাড়ি করে নিয়ে যায়।

চারদিকেই উৎসাহ আর উদ্দীপনা। কাজের উৎসাহ। সে বছর নীলিও গান গেয়েছিল। মাঝে মাঝে পুল্লাইয়াও গায়। ক্ষেতের ফসল ওদের হাতের মুঠোয় এল। এল বটে তা বেশিক্ষণ থাকার নয়। শেষ পর্যন্ত মহাজনের খপ্পরে যায়। মহাজন অথবা জমিদার। এদের হাত থেকে ওদের রেহাই নেই।

ধান কাটা থেকে পরের বছর ধান রোয়া পর্যন্ত কজনেই বা ভাত খেতে পারে। ধান কাটা থেকে ধান তোলা পর্যন্ত নীলির আচরণ দেখে মনে হল সে একটা গিন্নীবান্নী হয়েছে। কর্তার ইচ্ছা না থাকলেও সে দিব্যি ধোপা নাপিত ডোম সবাইকে কিছু কিছু ধান দান করল। গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইকেও ধান দিতে ভুলল না। পুল্লাইয়া বিরক্ত হল।

"আমাদের এমন কোন ছেলেমেয়ে পড়ছে যে তুমি ধান দিতে গেলে? পণ্ডিত মশাইকে ধান কারা দেয়?" পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করল।

"বেচারা পণ্ডিত মশাইয়ের ছেলেমেয়ে কম নাকি? চারজনে না দিলে ওরা বাঁচবে কি করে?"

মনের বিরক্তি মনেই রাখল পুল্লাইয়া। বুঝল কিছু কিছু ব্যাপারে নীলি অটল।

এবার ধান ঝাড়াইয়ের পালা। পূজো হবে গণেশের। নীলাম্মা নুন আর গুড় না দিয়ে পিঠে বানাল। ঐ পিঠে গণেশ ঠাকুর পছন্দ করেন। নারকোল ভেঙ্গে, খাওয়ার আগে, গণেশ ঠাকুরের মাথায় জল দেওয়া হল। সব ধান সেখানে থাকে না। শহরে পাঠাতে হবে। সীতারামস্বামীর বাড়িতে যাবে ধান। সব চাষীরই সেই অবস্থা। পাওনাদার, জমিদার, আড়তদার সবাইকে প্রথমেই ধান দিয়ে আসতে হবে। না দিলেই শুরু হবে কথা কাটাকাটি। শেষে মারামারি, মামলা মোকোদ্দমা।

গরুর গাড়িওয়ালাদের এই হল সু-সময়। ওরা যা চাইবে তাই ওদের দিতে হবে।

এই সময় ওরা দু-পয়সা ঘরে তোলে। এ ছাড়া আছে বত্তিদের রোজগার।

"ওষুধ চাই, ওষুধ—বাতের ওষুধ—পিত্তের ওষুধ—বায়ুর ওষুধ—সর্বরোগের ওষুধ—সর্বরোগহারী ওষুধ···ওষুধ চাই ওষুধ।" ওষুধওয়ালী জড়িবুটির ওষুধ বিক্রি করে। তার সারা গায়ে পেতলের গহনা। গলায় অনেকগুলো পুঁতির মালা। কাঁধে একটি ছেলে। হাতে তাম্বুরা। মাথায় ধামা। মুখভর্তি কথা। নাম বত্তিসোদেম্মা।

"ছেলেমেয়ে নেই।"·· পাশের বাড়ির বউটা তার মুখের কথা লুফে নিয়ে নীলির দিকে চোখের ইশারা করল। সোদেম্মা বলল, "ছেলেমেয়ে থাকবে না কেন মা? আঠারোটা গাধার পিঠে পুরাণের বোঝা আনা হয়েছে। পুরাণ ধরে ধরে গাছগাছড়ার ওষুধ তৈরি হয়েছে। আমার ওষুধে অন্ধ দেখতে পায়, খোঁড়া চলতে পারে, ছেলেমেয়ে হওয়ার ওষুধও আছে। ওষুধে সব হয়। মেপে তিরিশ কুঞ্চালু না মেপে তিরিশ কুঞ্চালু ধান চাই। এটা গুরুর বাক্য। গুরুর বাক্য যে না পালন করে, সে ঘোড়া হয়ে জন্মায়; ভাল ভাবে যে সংসার করে না সে গাধার জন্ম পায়।"

"একটা ওষুধের জন্য এত দিতে হবে?" পাশের বাড়ির বউটা নাকের উপর আঙ্গুল রেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। বাড়ির ভেতর থেকে বুড়ি বলে উঠল, "নীলাম্মা, তুমি কি বুড়ি হয়েছ, না কি তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে? তুমি ঐ ওষুধের জালে পড়তে যেয়ো না। ঐ প্যাঁচে পড়লে আর রক্ষে নেই।"

সোদাম্মার ভীষণ রাগ হল। মুখটাকে যেন দুহাত এগিয়ে দিয়ে বলল:

"ওলো ও মাছির ডানা-চোখো কিপ্‌টে বুড়ি
বাড়া ভাতে ছাই ফেলতে এগিয়ে এলি
তুই উপরের দিকে উঠলে বৃষ্টি হবে না
তুই নিচের দিকে নামলে ফসল হবে না।"

সোদাম্মা অভিশাপ দিল বুড়িকে। তারপর কোমর দুলিয়ে মুখ ঝামটে সশব্দে হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল। নীলি তাকে ডাকল। সে এল না। নীলি আবার ডাকল।

"যে নাড়ি চেনে সেই হল বত্তি। কটা লোক চেনে শরীর ভর্তি কলকব্জা? গুরু-বাক্য মনে রাখি।" বলতে বলতে সে পেতলের গহনাগুলো নাড়তে নাড়তে ফিরে এল। "দেখ, সোদেম্মা, আমার ওষুধে কি হবে? এই নাও, ধর।" বলে নীলি তার ঝোলায় এক কুনকে ধান ঢেলে দিল। পাশের বাড়ির বউ নাকের উপর হাত দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সোদেম্মা আশীর্বাদ করার ঢঙে বলল, "আসছে বছর এই সময়ে আবার আসব। তোমার কোল আলো করে আসবে একটি ছেলে।"

পুন্নাইয়া ধান মেপে মহাজনের ধান আলাদা করে রাখল। আলাদা আলাদা ভাগ করে নিল। সীতারামস্বামীর ভাগ, সেই গ্রামের রেওয়াজ অনুসারে আদেম্মার কাছে, বিয়ের সময় যে ধার করেছিল, সেই ধারের টাকার সুদ হিসাবে টাকার পরিবর্তে দিতে

হবে ধান। আদেম্মার জামাই জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়ার মত লিখিয়ে নিয়েছিল। ধান মাপতে মাপতে পুল্লাইয়া ভাবল, আদেম্মাকে সুদের ধান শোধ দেব কি করে? দিয়ে থুয়ে বাদবাকি যে ধান আছে, সেই ধান দিয়ে সারা বছর চালাতে হবে। এতদিন ছিলাম একা, কোন অসুবিধা হতো না। এখন তো আর একা নই, তিন তিনটে লোক। বউটা তেমন টিপে টিপে চালায় না। হাতখোলা বউ। কিছু বলতে গেলেই বলবে, "হাত পা যতদিন ঠিক আছে খাওয়ার অসুবিধা হবে না।"

পৌষ মাস। কি ভাবে যে সারাদিন কাজের মধ্যে কেটে গেল, টেরই পাওয়া গেল না। তারপর এল মাঘ। মাঘমাসে একাদশীর দিন পাহাড়ের উপর উৎসব। নবান্নের উৎসব। নবিরি গ্রামের দেড় ক্রোশ দূরে আছে ঐ পাহাড়শালে হুণ্ডাম্-এর ইতিহাস সকলের জানা। জাগ্রত দেবতা। পাহাড়ের উপর বিষ্ণুর মন্দির। চারদিক থেকে বিভিন্ন গ্রামের মেয়েপুরুষ, ছেলেমেয়ে রওনা হয়ে এসে ঐ পাহাড়ে ওঠে। এবারেও উঠছে। সকাল বেলা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বইছে বংশধারা নদী। নদীতে হাজার হাজার মানুষ স্নান করছে। স্নানের ঘাট থেকে পাহাড়ের উপরে মন্দির পর্যন্ত দু'পাশে কাপড় বিছিয়ে বসে রয়েছে অসংখ্য ভিখিরী। ঘাটের কাছে দলে দলে বসে ভজন করছে। কেউ কেউ ছোট ছোট দলে ভগবানের বিভিন্ন রূপে সেজেগুজে নাচছে। কেউ কেউ গান গাইছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কালো সমুদ্র এগিয়ে চলেছে। খালি মানুষের মাথা আর মাথা। দু'পাশে সাধুরাও আছে। কেউ এমনি ছাই মেখে বসে আছে, আবার কেউ ছাই মেখে কাঁটার উপর শুয়ে আছে।

নীলি এবং পুল্লাইয়াও উৎসব দেখতে যাবে। ওরা মাথা ঘষে স্নান করল। পুল্লাইয়া বাবার ছবির কাছে এসে প্রণাম করল। তার পেছনে দাঁড়িয়ে নীলিও প্রণাম করল। তারপর দুজনে রওনা হল। যতটা পারল নীলি আঁচলে চাল বেঁধে নিল। দু'দিকের ভিখিরীদের চাল দিতে দিতে নীলি এগোতে লাগল। পেছনে রইল পুল্লাইয়া। শহর থেকেও লোক এসেছে। শহরের নাম করা শিল্পীরাও এসেছে সেই উৎসবে। শহরের পানের দোকানদারকেও দেখতে পেল পুল্লাইয়া। মানুষের এত ভীড় শহরেও দেখা যায় না। সকলের চোখে মুখে আনন্দের আভা। নানান ধরনের লোক। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ কালো, কেউ ফর্সা। নানা কাজের লোক। নানা বয়সের লোক। কেউ দাঁড়াচ্ছে না। উপরের দিকে উঠছে আর উঠছে।

নীলি স্নানের আগে মুখে পাতলা করে হলুদ লাগিয়ে নিয়েছিল। বড় করে একটা কুমকুমের টিপ পরে নিল। ফলমূল কিনে যাত্রীরা উপরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছু দূর যাওয়ার পর কেউ কেউ একধারে বসে পড়ছে। যে বসে পড়ছে সে বসেই পড়ছে। তার জন্য অন্যেরা থামছে না। এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভজন শোনা যাচ্ছে। এক একটা ভিখিরী সুর করে গাইছে। কোন কোন ভিখিরী বলছে, "ইচ্ছা পূরণ হবে।

ভগবান ভালো করবে। রাত্রে না কি ঐ বিগ্রহে প্রাণ আসে। তখন ঠিক করে কাকে কি বর দেবে। সকলের বিশ্বাস ঠাকুর তাকে ভালো বর দেবে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। সেই বিশ্বাসেই ওরা সানন্দে উঠে যায় পাহাড়ের উপরে। যত ওঠে তত উৎসাহ পায়। তাদের পায়ে যেন তত গতি বাড়ে।

অন্যদের সঙ্গে নীলি আর পুল্লাইয়াও চলেছে। একটা সাধু হরগৌরী নিয়ে পূজো করছে। পুল্লাইয়া বোঝাল, "ঐ হল শিব। ঐ হল পার্বতী। আর ওপাশে নন্দী, এপাশে ভৃঙ্গী। নন্দী ভৃঙ্গী ছাড়া শিব নড়ে না। ততক্ষণে ঐ সাধু এগিয়ে এসে পুল্লাইয়া ও নীলিকে আশীর্বাদ করল। নীলি কয়েকটি ফল সাধুর সামনে রাখল। সাধু আশীর্বাদ করল, "পুত্রবতী হও মা, পুত্রবতী হও।" পুল্লাইয়া চমকে উঠল। তাইত! পুত্র! হ্যাঁ এই ছেলের জন্যই তো আমি বিয়ে করেছিলাম। তারপর থেকে কি যে সব হয়ে গেল ছেলের বাবা হওয়ার ব্যাপারটাই ভুলে গেলাম। আমি এমন একটা ছেলে চাই যে হাতেনাতে চোর ধরতে পারবে। যে আখড়ায় তার চেয়ে বড় লেঠেল হবে।" তারপর থেকে তার নজরে যত ছেলে পড়ল সে তাদের দিকে তাকাল। তাকায় আর ভাবে, "আমার ছেলে কি এ ধরণের ফর্সা হবে? না মুখটা এর চেয়েও সুন্দর হওয়া চাই। আমার ছেলে একেবারে তিন লাকে চূড়ায় উঠে যাবে।"

ছেলের কথা ভাবতে ভাবতেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল। মন্দিরের কাছে প্রচণ্ড ভিড়। ঐ ভিড়ের ভেতরে ঢোকা মনে হল অসম্ভব ব্যাপার। একটু ঢুকতে গিয়ে পুল্লাইয়া দেখল ভীষণ ধাকাধাক্কি হচ্ছে। পুল্লাইয়া ভাবল, "আমি না হয় যেতে পারি, কিন্তু নীলি? ও তো চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে। ঠাকুরের কাছে জোড়হাত করে দাঁড়াতে হবে। মনের কথা বলতে হবে, তারপর প্রণাম। এ তো দেখছি কিছুই হবে না।" অনেকে মন্দিরের উপরেই কলা ছুঁড়ে দিতে লাগল। কি ভাবে যে ঢুকবে তা সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। ভাবতে ভাবতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। শীতের বিকেল সে আর কতক্ষণ থাকবে। একবার আড়মোড় ভেঙ্গে ঝপাৎ করে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে। শেষে ভিড় কমলে ওরা কোন রকমে ঠাকুর দর্শন সেরে অন্য পথ দিয়ে পাহাড় থেকে নামা শুরু করল। ওঠার পথ একটা, নামার পথ অন্য। এই নামার পথে অসংখ্য দোকান বসেছিল। শহর থেকে নানা জিনিসের দোকান উঠে এসেছে। হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট সহ নানা জিনিসের দোকানের পাশাপাশি ছিল আখের গাড়ি। গাঁয়ের তৈরি খাবারের জিনিসও ছিল সেখানে। একদিকে হচ্ছিল বাজির খেলা। ঠিক তার বিপরীত দিকে বসেছিল নাগরদোলা। সাধারণ খাবারের দোকানও কম ছিল না। কেউ বিক্রি করছিল ছোলা, আবার কেউ করছিল খেজুর। অনেক করে বললেও নীলি সেখানকার কোন জিনিস খেতে চাইল না। তার মাথা ঘুরছিল, গা গুলোচ্ছিল। তবু এসব কথা সে কর্তাকে বলেনি। পাহাড় থেকে নেমে ওরা রাস্তায় পড়ল। ভাল পথে বেশিক্ষণ হাঁটল না। কিছুদূর গিয়েই নেমে গেল ক্ষেতে। কাটা ধানের ক্ষেত।

তার উপর দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। ক্ষেতের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে পথের দূরত্ব কমবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছানো যাবে।

সূর্য ডুবু ডুবু। পশ্চিমের আকাশে দিনের শেষের আলোর খেলা। মাঝে মাঝে মেঘের আনাগোনা। মেঘগুলোর কোণে কোণে সিঁদূর মাখা। একটি তালগাছ যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। এক একটা বটগাছে অসংখ্য পাখির বাসা।

সামনে নদী। এই সুন্দর প্রকৃতিকে যেন ক্রমশ নদী তার কোলে লুকিয়ে নিচ্ছে। নদীর তীরে জেলেরা জাল ঝাড়ছে। ছড়িয়ে শুকোতে দিচ্ছে।

এমন সুন্দর শোভা দেখার সময় নেই পুল্লাইয়ার। সে একবার করে দেখছে আর পা চালিয়ে চলেছে। নীলির শরীরটা যেন আর চলছে না। ভেতরে তার কি একটা হয়ে যাচ্ছে। আর হাঁটতে না পেরে হঠাৎ এক জায়গায় বসে পড়ল। পাশেই ছিল সাপের ঢিপি।

"একি! বসে পড়লে কেন? এতেই কাহিল হয়ে গেলে? ঐ তো দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রাম।

নীলি কোন কথা বলল না। পেছনে যারা আসছিল তারাও কোন প্রশ্ন করল না। অন্ধকার হয়ে এল বলে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চাঁদ আস্তে আস্তে উঠছে।

সমস্ত গা গুলিয়ে নীলির বমি হল। আবছা অন্ধকারে হঠাৎ বসে নীলিকে বমি করতে দেখে পুল্লাইয়া ঘাবড়ে গেল। নীলি কিছু হয়নি বললেও পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথা ধরে রইল সে। ঢিপি থেকে সাপ বেরিয়ে ওদের না দেখার মত চলে গেল। সাপ দেখে নীলি চমকে উঠল। দুজনে সাপকে হাতজোড় করে নমস্কার করল। সাপ ওদের নমস্কার নিয়েছে কি না জানি না। কাটা ধান গাছের উপর দিয়ে সাপটি এঁকেবেঁকে চলে গেল।

নীলি আর পুল্লাইয়া একে অন্যের দিকে তাকাল। নীলি কর্তার কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড়াল। তারপর আবার হাঁটতে লাগল। কিছুদূর এগোতেই আবার নীলির গা গুলোতে লাগল। ঠিক সেই সময় একটা বুড়ি ও নাতি ফিরছিল। বুড়ি পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতে হেসে তাকে জিজ্ঞেস করল, "বিয়ে হয়েছে তোমাদের কতদিন বাবা?"

পুল্লাইয়ার কানে বুড়ির কথা গেলেও জবাব দেওয়ার অবস্থা তার তখন ছিল না। বুড়িও ছাড়বার পাত্রী নয়। নীলির সঙ্গে গুটি গুটি পা পা হাঁটতে হাঁটতে এক ফাঁকে নীলিকে বলল, "আর বেশিদিন নেই। কিছুদিনের মধ্যেই বাচ্চা কোলে করে বেড়াতে হবে।"

কথাটা কানে যেতেই পুল্লাইয়া লাফিয়ে উঠল। নীলির চোখে বিদ্যুতের চমক দেখা দিল।

এগার

সে বছর অন্য বছরের তুলনায় শীত একটু বেশিই পড়েছিল। মুখে মুখে রটে গেল খবর প্রচারক পিসার ঘোষণা। সে নাকি শহরের আবহাওয়া দপ্তর থেকে শীত পড়ার খবর জেনে এসেছে : জাপান হেরে গিয়ে রাগের চোটে বিশেষ ধরনের বোমা ফেলেছে। তার ফলে সারা বিশ্বের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে অনেকে তার কথা বিশ্বাস করল।

এই বোমার প্রভাব গুড্ডি ভেঙ্কান্না এবং গন্নেম্মার মত বুড়োবুড়িদের উপর ভাল ভাবেই পড়েছিল। ওরা শীতে কাবু হয়ে পড়েছিল। নীলাম্মার কাছ থেকে এক টুকরো ছেঁড়া শাড়ি পেয়ে গন্নেম্মা বলল, "মা জননী, এই সময় দিচ্ছিস মা, তোর কাঁথা সেলাই করতে লাগবে যে। আমার নাতি শীতে কষ্ট পাবে যে!"

নীলি মুখ টিপে হেসে বলল, "নাতি না হয়ে নাতনী তো হতে পারে!"

পুল্লাইয়া ওদের কথা শুনে ধমক দিয়ে বউকে বলল, "চুপ কর তো। আমার ছেলে হবে আমার মত গাঁট্টাগোট্টা। তার আর শীত করবে কি?"

নীলি কোন জবাব দিল না। পুল্লাইয়া মনে মনে বলল, "ছেলে যে হবে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যাটাকে বছর খানেকের মধ্যে এমন করে দেব যে লোকের তাক লেগে যাবে।"

পিসা একদিন জ্যোতিষীর মত বলল, "জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাবে। শহরে এখনই রেশনিং শুরু হয়ে গেছে...আমাদের এখানেও হবে। যার অগাধ ধান আছে সেও প্রকাশ্যে বলবে 'নেই'। যার কিছুই নেই তার বাঁচার কোন উপায় নেই। এখন আমাদের তেমন কিছু না থাকলেও আমরা মিলেমিশে আছি। আমাদের ভেতরে ভাব ভালবাসা আছে। এমন দিন আসছে যখন সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। অন্যের কথা ভাববে না। শহরের অবস্থা চরমে উঠবে। সরকার ঘোষণা করছে ওরা নাকি খারাপ লোককে জেলে পুরে রাখবে। ফসল যা হবে তা নাকি সরকারের কাছেই জমা রাখতে হবে।"

সবাই হাঁ করে রূপকথার গল্প শোনার মত শুনল। কথাগুলো শোনার পর এক একজনের মনে এক একরকমের প্রতিক্রিয়া হল। রামু অতীতের খেলা শুরু করে দিল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় নীলাম্মার মন্দিরে গিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে এমন ভাব করল যেন নীলাম্মা তার ঘাড়ে ভর করেছে। মাথা দোলাতে দোলাতে সে বলল, "সামনে ঘোর কলিকাল। মানুষে মানুষে কামড়াকামড়ি হবে। একে অন্যকে বাঘের মত থাবা মারবে। আকাশে এক খণ্ড মেঘ থাকবে না। ভূতগুলো মানুষের ঘাড়ে চাপবে। বড় বড় ঘর বাড়ি ভেঙ্গে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে।"

তার চারদিকে লোক জমে গিয়েছিল। শুনে ওরা জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে বলল,

"মা, মাগো, তুমি আমাদের বাঁচাতে পারো মা। আমরা মরি ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রেখো মা! তুমি চাইলে কি আর আকাশে মেঘ দেখা দেবে না! আমরা তোমার সন্তান মা! তোমার সন্তানরা ভাল থাকলে তবেই তো তোমার পূজা সাড়ম্বরে হবে মা!"

রামু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওরে আমার বাছারা শোন, আমি যে ভূত পেত্নীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছি। ওদের এত বড় সাহস যে আমার সন্তানদের মুখের ভাত কেড়ে নেয়! তোরা কারও কথা বিশ্বাস করিস না। চিলে কান নিয়ে গেছে বলে কেউ যদি প্রচার করে তোরা কিন্তু চিলের পেছনে ছুটবি না। আগে কানটা দেখে নিবি। বিপদ আপদের দিনে তোরা সব মিলেমিশে থাকবি। কথায় আছে, মিলেমিশে করি কাজ হারিজিতি নাই লাজ। আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক, জমিতে ফাটল ধরুক তবু তোরা মিলেমিশে থাকবি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবি না।"

রামুর কাজ শেষ। ব্যবসাদার পেরাইয়া, এতদিন যারা চাল ডাল কিনত তাদের, এক মুঠো করে ফাউ দিত। এখন সে আর ফাউ দেয় না। ফাউ চাইলেই এতবড় একখানা জিভ বের করে কামড়ে বলে, "দেখছ না জিনিসের দাম কিভাবে বাড়ছে।" বাচ্চারা কিছু কিনতে গেলে তাদের হাতে ছোট একটা গুড়ের ডেলা আগে দিত। এখন সে তাও বন্ধ করে দিয়েছে।

ঐ গ্রাম থেকে একজন মাত্র মিলিটারীতে গিয়েছিল। সে বাড়ি ফিরে এল। নানা ধরণের জিনিস নিয়ে এল। ওর ফেরার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক তার কাছে ছুটে গেল। সকলের ধারণা ওর মত মিলিটারীর হাতেই জাপান মার খেয়ে হেরে গেছে। পিসাও ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল। ট্যাঙ্ক আকাশে উড়তে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল। যখন জানতে পারল ট্যাঙ্ক শুধু মাটির ওপরেই চলে তখন সে বললে রামায়ণের কালে পুষ্পরথ ও মহাভারতের কালে বরুণাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র প্রভৃতি শক্তিশালী অস্ত্র তৈরির কায়দা মানুষ শিখে নিয়েছিল অনেক আগেই। ঐ সব থেকে শিখেই জাপান নানা ধরণের বোমা, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি বানিয়েছে। জাপানের কাছ থেকে শিখেছে ইংরেজ আর আমেরিকানরা।

পিসার এই নতুন আবিষ্কারের কথা শুনে মিলিটারী ফেরৎ লোকটার কাছ থেকে লোকের ভিড় সরে এল তার কাছে।

"জ্ঞান হল আলাদা জিনিস। দু'দিন মিলিটারীতে গেলেই, দু' এক জায়গায় যুদ্ধ করলেই জ্ঞান বাড়ে না।" পথে ঘাটে পিসা এই ধরণের কথা বলতে লাগল।

ঐ গ্রামে কিছুদিনের মধ্যেই আর একটা জিনিস দেখা গেল। শহরে যেমন রেষ্টুরেণ্ট থাকে আর তাতে ইড্‌লি দোসা কফি পাওয়া যায় গাঁয়েও সেগুলো পাওয়া যেতে লাগল। ব্যবসাদার পেরাইয়ার ছেলে বাপের মতই ভারী ভারী জিনিস ঘাড়ে করে বইতে পারত। ঘাড়ে করে সে যেটা যেখানে সস্তায় পেত সেটা সেখান থেকেই

কিনত। আর তা যেখানে বেশি দামে বিক্রি করতে পারত সেখানেই বিক্রি করত। পেরাইয়ার ছেলেই প্রথমে ঐ গ্রামে রেষ্টুরেন্ট করল। উদ্দেশ্য শুধু যে গ্রামের লোক তার দোকানে বসবে, কফি খাবে তা নয়, রাস্তার লোককে ধরা। ওদের কাছে বিভিন্ন ধরণের বিদেশী মদ বিক্রি করাই মূল উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে চোলাই মদও ছিল। তবে প্রথম কদিন কোন লোক ঐ রেষ্টুরেণ্টে ঢোকেনি। একেবারে কেউ না ঢুকলে জমজমাট হয় না। আবার শুধু রাস্তার লোক ঢুকলেও ভালো দেখায় না। চটপট ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সে দু-চারজনকে ধারে খাওয়ানো শুরু করল। ধারে খেতে কয়েকজন ঢুকল। যেতে যেতে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চাষীরা দেখত দোকানটাকে। কৌতূহলবশত চাষীরাও দোকানে ঢুকতে লাগল। দু'একদিন ওরাও কফি খেল। তারপর খেল সেই পচাই ধেনো মদ, আর একটু আধটু বিলিতি মদ। বড়দের দেখাদেখি ছেলেরাও ঢুকল।

দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যেই ঐ রেষ্টুরেণ্টে লোকের যাতায়াত বেড়ে গেল। রটে গেল কাগজের নোট চলবে না। নোট নাকি অনেক ছাপা হয়ে গেছে। যারা কোনদিন দশ টাকার নোট হাতে করে দেখেনি তাদের হাতেও দশ টাকার নোট এসে গেল। কিছু কিছু বুড়ী কাগজের নোট চলবে না বলে নিত না।

নীলি আর পুল্লাইয়া এই পরিবর্তিত অবস্থার বাইরে থাকবে কি করে! গর্ভবতী অবস্থায় নীলি যে শুধু বাড়ির কাজ করত তাই নয়, স্বামীর সঙ্গে ক্ষেতেও যেত। ক্ষেতের কাজ করত।

নবিরির জমিতে আখের কত চাষ হত। কাজু বাদামের চাষও কম হত না। মাঝে মাঝে তালগাছও ছিল। বটগাছও সে গ্রামে বেশ কয়েকটা ছিল। জমিতে পূর্বদিকের খাল থেকে জল আসত। ধান কাটার পর অন্য ফসল করা যেত। তরিতরকারিও সেই জমিতে যে হত না তা নয়। ঐ জমির তিনদিক ছিল উঁচু। ঐ তিনদিকের উঁচু জমি হতে গড়িয়ে পড়ত জল। অন্যদিকে ছিল প্রবহমান নদী। কাজু বাদামের গাছে গাছে পাখির কিচির মিচির লেগেই থাকত। বটগাছে সারাদিন ঝুলত বাদুড়। খেজুর গাছে বসত কাঠঠোকরা। তালগাছে কাঠঠোকরা ঠকঠক করে আওয়াজ করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কি যেন খুঁজত। সন্ধ্যে হলেই গর্ত থেকে বেরোত শেয়াল। আর তখনই শুরু হত পেঁচার ডাক। আরও রাত বাড়লে ঝিঁঝিঁপোকার কান্না শোনা যেত।

এ হেন জমিতে নীলি আর পুল্লাইয়া দিনরাত কাজ করত। শুধু দু'বেলা পেট ভরানোর জন্য নয়, ধার শোধ করার জন্যও। ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তরিতরকারির চাষের কাজে লেগে গেল। বীজ বোনা হয়ে গেল। গাছের চারাও মাটির বুক চিরে জেগে উঠেছে।

গ্রীষ্মকাল এসে গেল। নদীতে জল প্রবাহিত হচ্ছে না। নদীর এখানে সেখানে

ছোট ছোট ডোবা আছে। সেই ডোবাগুলোতে মানুষ আর পশু একসঙ্গে স্নান করে। পুকুরে একবিন্দুও জল নেই। তাই পুকুরে যারা জাল ফেলে মাছ ধরত, তারা জাল গুটিয়ে রেখেছিল। এই সময় কেউ কেউ জাল বোনে। কিন্তু তারাও জাল বুনছে না। কারণ শহরে জাল বোনার সুতো পায়নি। হঠাৎ কেন যে সুতোর টান পড়ল তা ওরা বোঝে না। শুধু নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলাবলি করে। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই কাপড়ের দাম বেড়ে গেল। একটু একটু করে বাড়েনি। রাতারাতি দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে গেল। যারা চরকা কাটত, এই দর বাড়ার ফলে তাদের কাজও বন্ধ হয়ে গেল। এক একটা বাড়ির বুড়ি সারাদিন চরকা কাটত। ওদের হাতে এখন কাজ নেই।

নীলির সময় এগিয়ে এসেছে। নড়তে চড়তে তার কষ্ট হয়। হলেও সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। পুল্লাইয়া প্রতিদিন ছেলের স্বপ্ন দেখে। ঘুমন্ত বউয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আপন মনে বলে, "ব্যাটা পেটে নড়ছে। আমার এই ব্যাটা যেদিন হবে সেইদিন কি আর বৃষ্টি হবে না? এ যেদিন কথা বলবে সেদিন পাখিদের কলরবে আর টেকা যাবে না। ছেলেটাকে একেবারে বুকে করে রাখব! ব্যাটাকে রাত্রে বুকের ওপর শোয়াব। কয়েক বছর পরেই গোঁফ গজিয়ে উঠবে। লেখা-পড়া করে খুব নাম হবে···পাঁচজনের মধ্যে একজন হবে···একেবারে মাথা উঁচু করে থাকবে··আমার সোনার জমিতে সোনার ফসল ফলবে। আমার ছেলে হবে সোনার ছেলে···আমার ছেলের দিকে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে।" ভাবতে ভাবতে মনে মনে ফুলে ফেঁপে মাঝরাত্রে লাফ দিয়ে উঠল। নীলি পাশে শুয়ে তার দিকে তাকিয়ে ঘুম ঘুম চোখে বলল, "এখনও ঘুমোওনি।"

"কেন ঘুমোব? দেখ আমার ছেলে···আর দুদিন পরেই তো আমাকে 'বাবা' বলে ডাকবে···তোমাকেও তো 'মা' বলে ডাকবে।"

নীলি না হেসে বলল, "আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।"

"বুঝতে পেরেছি কি স্বপ্ন দেখেছ। হাতি দেখেছ তো? তাহলে আমার ছেলেই হবে।"

"না···মেয়ে হয়েছে। মেয়েটা আমাকে মা মা বলে ডাকছে।" বলতে বলতে নীলি ঘুমিয়ে পড়ল।

পুল্লাইয়া বলল, "অসম্ভব! আমার বাবা মল্লনাইডু। একটা পুরুষ ছিল বটে। মরে যাওয়ার সময় কি বলল জানো? শুনছো না! ছেলে না হলে দেব একেবারে গলা টিপে।" বলে বউয়ের হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল।

"কার গলা টিপে দেবে গো?" নীলি বলল।

"কার?" পুল্লাইয়া কোন জবাব দিতে পারল না। নীলির দিকে তাকাল। দেখে নীলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখটা কেমন ফোলা ফোলা লাগছে। তার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুল্লাইয়া আর কোন কথা বলল না। নীলি তার হাতে হাত

রেখে বলল, "আনন্দ চাপতে পারি না, কান্না পেলে চাপবো কেন ?"

"কে চাপছে ?" পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করল।

"তোমার কথা বলছি না। দেখ তুমি কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। তোমার হাবভাব দেখে আমার ভীষণ ভয় করছে। হাতে যা লেখা আছে তাই তো হবে। মনে হচ্ছে মেয়ে হওয়ার খবর শুনে তুমি হয়তো আর বাড়িতেই ফিরবে না। ছেলে হোক মেয়ে হোক আমাদেরই তো হবে। মেয়ে হলে তো ফেলে দিতে পারবো না! ছেলে হলে চারজনের মধ্যে নাম করবে। ছেলে ছেলে তো বলছ, ছেলে হলেই কি হল! ছেলেকে রাখবে কোথায় ? ভেবেছ ? কোথায় শোয়াবে ? তার জন্য দোলনা তৈরি করেছ ? বীজ বপন করলেই হয় না ভাল সার দিতে হয়।

পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। এতক্ষণ তার মনে হল নীলির কথা সে শুনছে না। শুনছে আকাশ থেকে ভেসে আসা কথা। সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। নীলি ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন পাড়ায় গানের আসর বসল। সেই অবস্থায় নীলিও এক পা এক পা করে গেল গান শুনতে। ঠাণ্ডা যাতে না লাগে তার জন্য একজনের বারান্দায় সে বসল।

পদ্মনাভম্ মেয়েছেলের বেশ পরেছে। গুঁফো লোকটা মেয়ে সেজেছে। লাল শাড়ি আর ডোরাকাটা জামা পরেছে। সামনে সে গাইছে। তার পেছনে ধুয়ো ধরেছে দুজন। আসর ভরে রয়েছে।

একতারা বেজে উঠল। বাজনার তালে তালে পদ্মনাভমের গোটা শরীর দুলতে লাগল। মাঝখানে পিলসুজের দু'দিকে দুটো বড় বড় লম্ফ। তার সঙ্গে আছে আরও তিনজন। দু'জন তার গানের ধুয়ো ধরে পেছনে বসে। আর একজন মাঝামাঝি বসে বাতিতে তেল দেয় সলতে নাড়ে।

এই গুঁফো লোকটার গান শুনতে চারদিক থেকে লোক ভেঙ্গে পড়েছে। গাইছে আর অভিনয় করছে। তিন পা এগোচ্ছে আর দু'পা পেছোচ্ছে। মাঝে মাঝে একবার দাঁড়িয়ে গাইছে। লোকের কাছে জিজ্ঞেস করছে, "কোন গানটা গাইবে, কোন গল্প শোনাবে।"

মোড়ল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন্ কোনটা জানো ?"

"কাকাম্মা কথা, শশিরেখা পরিণয়ম্, বাণাসুরের যুদ্ধ আরও অনেক।"

আসর থেকে আওয়াজ উঠল, "শশিরেখা পরিণয়ম্ শুনতে চাই।"

পদ্মনাভম গাইতে শুরু করে দিল :

> সকলের আনন্দলাগি হইল সে যে গর্ভবতী
> হাঁটিতে সে পারে নাকো এগিয়ে যে আসে তার নাভি।
> গয়নাও লাগে তার ভারি, ওঠে বারে বারে তার হেঁচকি
> স্তনের বোটা যত কালো হয়,

শরীরটা যে তত সাদা হয়।
ঐ সরু কোমরের গর্ভবতী,
যত পায় তত খায় মাটি।
হাঁটতে যে পারে নাকো,
ন মাস যে তার পূর্ণ হলো।

মাঝরাত্রি পেরিয়ে গেল। নীলি শুনতে শুনতে হঠাৎ একসময় উঠে বাড়ি চলে গেল। পুল্লাইয়াও পেছন পেছন গেল। এদিকে আসরে শশিরেখার বিরহ পর্ব চলছে, আর ওদিকে নীলির অস্বস্তি আর কষ্ট বেড়ে চলেছে। নীলির ঘরে আদেম্মা ও প্রতিবেশী মহিলারা ঢুকে পড়ল।

নীলাম্মাকে যে দাই পৃথিবীতে এনেছিল সেও পৌঁছে গেল। সে এসেই নীলির কাছে যারা বসেছিল ওদের সরিয়ে দিল। লোকের বিশ্বাস তার হাতের ছোঁয়া পেলে বাচ্চা হওয়ার সময় মায়ের কষ্ট হয় না।

পুল্লাইয়া ঘবের বাইরে। কৌতূহলীদের সে যা বলার বলছে। মাঝে মাঝে নীলির গোঙানি শুনে তারও যেন কষ্ট হচ্ছে। ভোররাত্রে "ওঁয়া" শুনে পুল্লাইয়া লাফাতে লাগল। চিৎকার করে বলল, "মল্লু।"

ঘরের ভেতর থেকেই দাই বলল, "মল্লাম্মা।"

"তাহলে পৃথিবী উল্টে যাবে।"

তার কথা শুনে ঘরের ভেতরে মহিলারা একসঙ্গে হেসে উঠে বলল, "অমন কথা বলো না পুল্লাইয়া।" কথাটা কানে যেতেই পুল্লাইয়া যেন ধাক্কা খেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আদেম্মা বেরিয়ে এসে বলল, "কাঁদছে বটে। তবে হ্যাঁ, একখানা মেয়ে হয়েছে। চুল নয় তো, যেন কালো একখণ্ড মেঘ।"

পুল্লাইয়ার মাথা ঘুরে গেল। সে আর ঠিক থাকতে পারল না। তার মনে হল তাকে মিথ্যে কথা বলে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বলল, "সরে যান আমি একটু দেখবো। মল্লনাইডু···আমার বাবা···স্বর্গে গিয়ে আমাকে ধোকা দেবে? আমার ছেলেই হয়েছে। আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করি না।"

ঝট করে আদেম্মা তার হাত ধরে ধমক দিয়ে বলল, "পাঁজি দেখে সন্তানের মুখ দেখতে হয়।"

"ওসব মানি না।" বলতে বলতে ঘরে ঢুকে গেল···মেয়েরা ঝট করে সরে দাঁড়াল। বুড়ী পাগলীর মত হাসতে লাগল। তখনও লম্ফ জ্বলছিল। সেই আলোতে পুল্লাইয়া দেখল নীলির মুখ। তার মনে হল ঝড়ঝাপ্টা তুফান কাটিয়ে তীরে ভেসে ওঠা জাহাজ যেন পড়ে আছে। সত্যি কোল ভরা ছেলে হয়েছে। পুল্লাইয়ার মন ভরে গেল। গোঁফে তা দিতে দিতে সে হাসতে লাগল।

"ছেলেটা বেশ বড় হয়েছে। জন্মের সময়ই যখন এত বড় তখন নিশ্চয়ই বড হলে

আমার চেয়ে অনেক বড় চেহারার লোক হবে।" পুল্লাইয়া ভাবছে আর ঠিক সেই সময় নীলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে কি আনন্দ উজ্জ্বল মুখ। এতদিন সে যৌবনবতী স্ত্রী ছিল। এখন সে বলিষ্ঠ এক ছেলের মা হয়েছে। প্রথম ছেলের মা হওয়ার আনন্দ তার চোখে মুখে উদ্ভাসিত ছিল। সেই আনন্দের জোয়ারে যেন তার প্রসব বেদনা ভেসে যাচ্ছিল।

বার

গান বাজনা সব শেষ করে ভোরবেলা পদ্মনাভম্ "এখন আপনাদের যার যেমন দয়া" বলতেই কিছু লোক উঠে গেল। কয়েকজন দক্ষিণার থালায় কিছু ফেলল। সব পয়সা গুণে চার আনাও হল না। সারা রাত ধরে কেরোসিন তেল পোড়াতে যা খরচ হয়েছে তার দাম ছআনা। সকালে পদ্মনাভম্ সদলবলে পাড়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পুল্লাইয়ার বাড়ির সামনেও দাঁড়াল।

"সারা রাত ধরে তুমি গাইলে শেষ পর্যন্ত হল গিয়ে এক বুড়ো। বুড়ো ঠিক হয়নি হয়েছে এক ছেলে। ভোর রাত্রে ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তা বেশ বড়ই হয়েছে।" সানন্দে বলল পুল্লাইয়া।

পুল্লাইয়া পদ্মনাভমকে দক্ষিণা দিল। গোঁফে তা দিয়ে সে বলল, "ওহে পদ্মনাভম্, থালায় দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে?"

"সুখে থাক, শান্তিতে থাক।" বলতে বলতে সে অন্য বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

নীলি পাঁচদিনের দিন রান্না ঘরে ঢুকলে তার দিদিমা বারণ করেনি। এগারো দিনের দিন বাড়িতে কাজ কর্ম হল। তারপর এল একুশ দিনের দিন। নীলিকে পেরাণ্টালু (পুজো উপলক্ষে আমন্ত্রিত মহিলাগণ) হলুদ, কুমকুম সহ নদীর ধারে নিয়ে গেল। বালি দিয়ে নদীর ধারে তিনটে ঢিপি করিয়ে পুজো করাল। ছেলেটিকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করল। এটাকেই 'কাপ্পা মোক্কাডাম' বলা হয়। নীলি তারপর কলসী করে জল আনল। পরের দিন থেকে শুধু বাড়ির কাজই নয় ক্ষেত খামারের কাজও নীলি করতে লাগল। ধান মাড়াই, রান্না, ছেলেটার গায়ে তেল মাখানো, চান করানো, দুধ খাওয়ানো সবই সে করত। সব আগের মত চলতে লাগল। যখন বাড়িতে থাকত তখন তাকে কোলে পিঠে রাখত নীলি। বাইরে বেরোনোর আগে বুড়ীর কাছে রেখে যেত তাকে।

বাচ্চা একদিন অন্তর চান করানো হয়। তার চুল দিনকে দিন লাল শাকের মত বাড়তে লাগল। যে দেখে সেই তাকে কোলে তুলে নেয়। এত চুল দেখে অনেকে ঠাট্টা করে বলত, "একেবারে মেয়েছেলে।" ঐ কথা কানে গেলেই পুল্লাইয়া জ্বলে উঠত।

বুড়ী বলত, "বাপ বেশি কোলে নিলে বাচ্চারা রোগা হয়ে যায়।" পাড়ার লোকে বলত, "এ ছেলে লম্বায় চওড়ায় বাপকে ছাড়িয়ে যাবে।" এ ধরণের কথা বুড়ীর কাণে গেলেই সে ভাবত, বাচ্চাটার উপর লোকের নজর পড়ছে। তারপর শুরু হত বুড়ীর ঝাড়ফুঁকের পালা। কাঠকয়লা, ঝাঁটার কাঠি, শুকনো লঙ্কা এসব দিয়ে সে ঝাড়ফুঁক করত, যাতে বাচ্চাটার শরীরে নজর না লাগে। চান করানোর সময় বুড়ী এগিয়ে এসে দেখত কলসীর তলার জলে চান করানো হচ্ছে কিনা। করাতে গেলে বারণ করত। কলসীর তলার জলে চান করালে বুড়ীর মতে, "বাচ্চারা তলিয়ে যাবে।"

একমাস হতে তিনদিন বাকি থাকতে ছেলেটাকে দোলনায় দিল। সেই উপলক্ষ্যে পুল্লাইয়া বেশ কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করল। খরচও করল। লোকজন আসার পর বেশ জমজমাট লাগছিল। সে মনে মনে খুব গর্ববোধ করছিল। এতখানি গর্ববোধ জীবনে সে কোনদিন করেনি। কি আছে না আছে হিসেব না করেই সে যত পারল খরচ করল।

গ্রামেও রেশনিং হবে প্রচার করা হচ্ছিল; ওয়ারফাণ্ডে সবাইকেই না কি টাকা পয়সা দিতে হবে। গ্রাম নাইডু (মুন্সেফ) পই পই করে সবাইকে বলে গেল। অত খরচ করতে বারণ করলে পুল্লাইয়ার মুখে এক কথা, "হিসেব করে দেখা যাবে। আগে ছেলেকে চারজনে আশীর্বাদ করে যাক।"

যারা এল তারা দু'হাত তুলে বাচ্চাটাকে আশীর্বাদ করল। বাচ্চাটির দিকে তাকালেই তার দীর্ঘজীবন কামনা করতে ইচ্ছে করে। একমাসও হয়নি। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় কম করে সে চার মাসের বাচ্চা।

আগস্টের শেষ। রোদের তেজ কমে গেছে। মাটি ঠাণ্ডা হয়েছে। এই সময়ে চাষীর হাত খালি থাকে। তার কোন কাজ থাকে না। এই যে খরচ টরচ হলো পুল্লাইয়ার, তার পেছনে ছিল আদেম্মা। যেভাবে কোমর বেঁধে পুল্লাইয়ার বিয়েতে উঠে পড়ে সে লেগেছিল ঠিক সেই ভাবে এই কাজের দিনেও সে সব কাজে হাত দিয়েছিল। আগের মতই কোমর বেঁধে সব কাজ দেখাশোনা করেছে। বাড়িতে তার এখন আগের মত তত অধিকার চলে না। জামাই তার সব কথা কানে তোলে না। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে আদেম্মা আগের মত দানধর্ম করতে পারে না। করলে জামাই বিরক্ত হয়। আস্তে আস্তে আদেম্মা টের পাচ্ছিল নিজের বাড়িতে কোন ব্যাপারেই তার জোর খাটছে না। তার আর্থিক ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে গেল। জামাইয়ের হাতে চলে গেছে। এখন শুধু মিষ্টিকথায় সে বাড়িতে তার অধিকার ফলানোর চেষ্টা করে। যখন খুব দুঃখ পায় তখন আর না পেরে ঐ পুল্লাইয়ার কাছে বলে, "এখন আমি আর কোন কাজে লাগব? আমার হাতে এখন সে ক্ষমতা কোথায়। নাতির জন্য একটা কোমরের চাকতিওয়ালা তাগা বানাতে পারলাম না।" কথাটাকে নীলি লুফে নিয়ে বলল, "দেওয়ার সময় কি দেননি মা? নাকি দেওয়ার দিন ফুরিয়ে গেছে? দেখবেন দু'দিন

পরে আপনার এই নাতি নাকে দড়ি দিয়ে কিভাবে ঘোরাবে।"

লোকাপ্পা ও আদেম্মা হাসতে হাসতে বলল, "এ কি আর যে সে ছেলে! এর ঠাকুর্দাকে সাতগাঁয়ের লোক এক ডাকে চিনত। তার নাতি বলে কথা। উনি এখন স্বর্গে আছেন। তবে‥"

বাপের কথা তুলতেই পুল্লাইয়ার মন প্রাণ ভরে গেল। আর ঠিক তখন মনে হল, বাচ্চাটা কুঁ কুঁ শব্দ করছে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা বলে উঠল, "ঐ দেখ সাড়া দিচ্ছে, মল্ল-নাইডুর নাতি সাড়া দিচ্ছে। মল্লনাইডুর নাতি···মল্লু ঠিক টের পেয়েছে, আমরা তার কথা বলছি।" অত্যন্ত উৎসাহে পুল্লাইয়া এক দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিতে গেল। তুলতে তুলতে সে বলল, "মল্লু"। ব্যাস এটাই বাচ্চাটার নাম হয়ে গেল। নাম-করণের পালা শেষ।

সেই মুহূর্ত থেকে পুল্লাইয়া "মল্লু" বলতে অজ্ঞান। মা-বাবার আদর যত্নে দিদিমার সতর্ক পাহারায় মল্লু দিনে দিনে কালকেতুর মত বাড়তে লাগল। ঠিক এই সময়ে নীলির চোখে, ফুলশয্যার রাত্রির সেই সুন্দর চাউনি পুল্লাইয়ার নজরে পড়েনি। তার ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে আগে যেভাবে শিহরণ জাগত সেভাবে শিহরণ জাগে কিনা পুল্লাইয়া এ কদিনে লক্ষ্য করেনি। সব সময় তার ছেলের চিন্তা। তার সমস্ত স্নেহ প্রীতি ভালবাসা যেন ঐ ছেলের উপর কেন্দ্রীভূত।

গুড্ডি ভেঙ্কান্না খুব দুঃখ করছিল। নাতির জন্য কিছুই করতে পারল না বলে। গন্নেম্মা অতীতের কথা ভেবে কাঁদতে বসে গেল। দোলনায় শোয়ানোর দিনে নীলি ওদের সবাইকে পেট ভরে খাওয়াল। ওদের সুখ দুঃখের কথা শুনে নীলি বলল, "বাবা, ঠাকুর দেবতার কাছে কি আর সব সময় ফল দিয়েই পুজো করতে হয়, ফুল দিয়ে পুজো করলে ঠাকুর কি আর খুশী হন না? কিছু দিতে পারছ না তাতে কি হয়েছে! তোমরা আমার ছেলেকে আশীর্বাদ কর। ছেলে আমার বড় হবে।" বলে ছেলেকে কোলে করে ওদের কাছে নিয়ে গেল।

গুড্ডি ভেঙ্কান্না ছেলেটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কি যেন ভাবছিল। "খুব ভাল ছেলে হয়েছে মা। চোখ থাকলে ছেলেটাকে মনপ্রাণ ভরে দেখতাম।"

তারপর গন্নেম্মা অনেকগুলো ভাল ভাল কথা বলে বাচ্চাটাকে আশীর্বাদ করতে লাগল। পুল্লাইয়া বলল, বুড়িমা', ধর্মকর্ম যে যা করে তার ফল সে পায়। তোমার ছেলে যে কোন বংশে জন্মেছে তা আমাকে বলার কি দরকার। চারজনে তো আলোচনা করে। আমার হাত দিয়ে কি যে লিখিয়ে নিলো শেষে আমার জমিটাই হাতছাড়া হয়ে গেল। যাক আমার মন ভরে গেছে আনন্দে। এখন আর আমি কিছু চাই না।"

গুড্ডি ভেঙ্কান্না বলল, "এই তো এবার মল্লু সব করবে। সব রকমের চুরি জোচ্চুরি বন্ধ করে দেবে। যার জমি তাকে ফিরিয়ে দেবে।"

গন্নেম্মা ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বলল, "যার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ইচ্ছে মত

আবোল তাবোল বললেই তো আর হবে না।”

বাচ্চাটার গায়ে হাত বুলিয়ে গুড্ডি ভেঙ্কান্নার চোখ ছলছল করে উঠল। তার ঐ অবস্থা দেখে নীলির গা ছমছম করল। সে ছেলেকে কোলে করে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় তিনবার ফুঁ দিল।

দিন কাল দ্রুত বদলে যেতে লাগল। পুল্লাইয়ার যে বউ আছে সেইটেই যেন তার মনে থাকে না। সব সময়ে ছেলের চিন্তা। নীলিও সেদিন ক্ষেতে গিয়েছিল। ক্ষেতের কাজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নীলির আগেই সে পা চালিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। নীলি তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু সে হাসি পুল্লাইয়ার চোখেও পড়েনি।

নীলি বাচ্চার গায়ে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে ঘুমপাড়ানী গান গাইছিল :

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়লো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।

পুল্লাইয়া বউয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাঁদরের মত মুখ করে ভেংচি কাটল। আর তখনই ওরা দুজনে ফিরে গেল অতীতে। দুজনের মন অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করল, ভরে গেল মধুর স্মৃতিতে।

তের

শীতের সন্ধ্যা। অন্ধকার হওয়ার আগে নীলি ও পুল্লাইয়া ক্ষেত থেকে ফিরছিল। নীলাম্মার মন্দিরের পাশ দিয়ে আসার সময় ওরা শুনতে পেল নীলাম্মার মন্দিরের দোর-গোড়ায় বসে রামু কি সব বলছে। নীলাম্মা তার উপর ভর করেছিল। ওরা দুজনে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে নীলাম্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করল। সেবছর ফসল ভালো হয়নি। প্রথম দিকে ধানগাছগুলো চড়চড় করে বেড়ে উঠেছিল বটে কিন্তু তারপরে যেন থেমে গেল। তাও গাছে শিসগুলোতে যতটা ধান আশা করা গিয়েছিল ততটা হয়নি। সব ধানে দুধ আসেনি। ফলে অর্ধেকের বেশী ধান নষ্ট হয়েছে। মহাজনের মন বড় কঠোর। তার উপর জিনিসপত্রের দাম দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। যার যা পাওনা ঠিক ঠিক ভাবে মেটাতে হবে। কেউ কানাকড়িও কম নেবে না। জিনিসের দাম বাড়ছে বলে বেশী চাইতেও পারে। নীলি ও পুল্লাইয়া এসব বিষয়ে কথা বলতে বলতে ক্ষেত থেকে ফিরছিল।

মন্দিরের দিকে, মন্দিরের ভেতরের বিগ্রহের দিকে, দ্বারে বসে থাকা রামুর দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়ার মনে যে কত রকমের ভাব জাগে তার ইয়ত্তা নেই। দু'বছরের মধ্যে কত পরিবর্তন! রামুর ওসব ভয় করার ব্যাপারগুলো দু'চারজন যে বিশ্বাস করে না তা নয়। তবে যারা ভয় পায় না বা বিশ্বাস করে না তাদের হাতে পয়সা নেই। পয়সা আছে মহাজন এবং মোড়লের হাতে। ওদের বিশ্বাস নীলাম্মা দেবী রামুর উপর ভর করে। মন্দিরের সংস্কার হওয়ার ফলে লোকজনের যাতায়াত বেড়েছিল। কিন্তু জিনিস-পত্রের দাম বাড়ার ফলে লোকের অবস্থা প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত। রামুর উপর ভর করে নীলাম্মা কি বলেছে না বলেছে তা নিয়ে ওরা এখন আর মাথায় ঘামায় না।

অনেক রাত্রের মত সে রাত্রেও নীলাম্মা রামুর উপর ভর করেছিল। তার গায়ে এক চিলতে কাপড় নেই। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রদীপের তেল কমে গেছে। যে কোন মুহূর্তে দু' একবার দপ্ দপ্ করে নিভে যেতে পারে।

প্রণাম করে চলে যাবে এমন সময় নীলি ও পুল্লাইয়াকে রামু হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। ওদের আসার আগেই নিজেই ওদের কাছে গিয়ে বলল, "নীলাম্মা দেবী কি বলেছেন শুনেছো তো? গিয়ে ঐ মোড়ল আর মহাজনকে বল। আমি তো বলতে পারি না। আমি বললে ওরা বলবে, তোমার উপর ভর করে কি বলল তা তুমি জানলে কি করে?"

ওরা মাথা নেড়ে জানাবে বলল। রামু মন্দিরের দরজা বন্ধ করে ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। সেই শীতে রীতিমত সে কাঁপছিল। অনেক সুখ দুঃখের কথা তার বলার আছে। যে ছেলের উপর সে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছিল, যার কাছে তার সবচেয়ে বেশী আশা ছিল, সেই ছেলে তাকে দুবেলা ফ্যানও খেতে দেয়নি। ছেলেটা ডোম-পাড়ায় গিয়ে জুয়ো খেলে। যেদিন হেরে যায় সেদিন বাড়ির সকলের উপরে চোটপাট দেখায়। আর যেদিন জেতে সেদিন বেআইনী মদের দোকানে গিয়ে পড়ে থাকে। আকণ্ঠ পান করে বাড়ি ফিরে, বাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রামু এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন অন্য কেউ তাকে ধোকা দিয়েছে। ওদের সঙ্গে গুটি গুটি পা পা হেঁটে রামু বলল, "দেখ নীলাম্মা, এই যে সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছি এটা যে গাধা খাবে সেই গাধা একদিন মরে যাবে। কিন্তু এই ঘাস মরবে না। আমি মরে যাবো। আমার মত আমার ছেলেও মরে যাবে। আমি বাপের জন্মে কোনদিন জামা পরিনি, আমার ছেলে জামা পরছে। আবার তার ছেলে বোতামওলা কোট পরবে, শহরে থাকবে। মুখটা চকচক্ করলে কি লাভ মা! আসল হল মন। গাঁয়ে যদি দু'চারটে দোকান বসে যায় তাহলেই কি সব হয়ে গেল? টাকা তো বাড়ছে, ফুলে ফেঁপে যাচ্ছে টাকা। টাকা যত বাড়ছে মন তত ছোট হচ্ছে। মা নীলাম্মা, বাঁচার সময় দুটো জিনিস থাকে, আবার মরে গেলেও ঐ দুটো জিনিসই থাকে কীর্তি অপকীর্তি।"

নীলির বাড়ি এসে গেল। নীলি রামুকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। ছোট লম্ফ

খাটিয়ার মাথার দিকে জ্বলছিল। পায়ের দিকে বসে ছিল বুড়ি। বুড়ি নাতির দিকে তাকিয়ে হাসছিল। তিনমাসের নাতি লম্ফের আলোর দিকে তাকিয়ে হাসছিল হাত-পা নেড়ে।

"এই যে দাদু।" বলল রামু। মল্লু হাত-পা ছুঁড়ে হুঁ হুঁ করছিল। নীলি আর পুল্লাইয়া খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। রামু খাটিয়ার এককোণে বসে মল্লুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে হাসল। তারপর তাকে চুমো খেল, আদর করল। মল্লু ভয় পেল না। সে হাসছিল। রামু বলল, "এ যে এখনি মা বলতে শিখে গেছে।" পুল্লাইয়া ঝট্ করে বলল, "মা নয়, বাবা বলছে।"

রামু হাসতে হাসতে বলল, "শুয়োরের দশটি বাচ্চা হয়, কিন্তু হাতির হয় একটি। ঐ একটি বাচ্চাই লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে···যা দিনকাল পড়েছে! কোনরকমে ভাগ করে খেয়ে পরে ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলে এ একাই একশো হবে। অন্যায় অধর্মের ভারে দেশ পাথর হয়ে যাচ্ছে। এই পাথরটাকে আমার নাতি সরাবে।" নীলি আর পুল্লাইয়ার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যাওয়ার আগে রামু বুড়িকে বলল, "বুড়িমা, এর বিয়ে দেখে যাবে তো?"

বুড়ি বলল, "ওরে রামু, সে কপাল কি আর আমার আছে। ও যেদিন চলে গেছে সেদিনই আমার সব শেষ হয়ে গেছে।"

বুড়ির স্বামী যে কি ধরণের ছিল তা রামু জানত। তাই সে মুখ টিপে হাসল। সেই হাসি দেখে বুড়ি বলল, "লোকে খারাপ বলে বলুক তবে আমি তো ওকেই মানি। আমার কাছে ও বরাবর ভালোই ছিল। জগতে বাস করতে হলে একজন না একজনকে বিশ্বাস করতেই হয়। আমি ঘর করেছি, আমি চিনি।"

রামু বুড়িকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে পুল্লাইয়াকে বলল, "একটা কথা কি জানো বাবা, কপারেট বোর্ড বসিয়েছে ঐ নাইডু (মোড়ল), মহাজন, গোমস্তা আর ওদের সাকরেদরা জুটে গেলে ন্যায় বলে আর কিছু থাকে না। ন্যায়-ধর্ম সব বনে পালিয়ে গেছে। গর্মেণ্ট ভালো মদ বিক্রি করত। এখন গাঁয়ের আনাচে-কানাচে বিক্রি হচ্ছে চোলাই মদ। বড় বড় লোক নাকি এই কারবারের পেছনে আছে। এসব দেখে শুনে আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে বাবা। আমি আর কি করব বাবা, মা নীলাম্মাকে বলি।"

পুল্লাইয়া বলল, "ব্যাটারা মরবে।"

"আমি ওকথা বলি না বাবা। ওরা একশো বছর বাঁচুক। ওরা মরলে আমাদের কি লাভ। আমি মাকে বলি, ওদের মনে সুবুদ্ধি দাও। যাদের টাকাপয়সা আছে তারা যেন ভালো পথে পয়সা রোজগার করে। মা পারেন না এমন কাজ নেই। তিনি খুশী হলে ক্ষেত আবার ফসলে ভরে যাবে। ঘরে ঘরে সুখশান্তি আসবে।"

রামুকে এগিয়ে দিয়ে পুল্লাইয়া ফিরে এল। নীলি মল্লুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। বুড়ি এককোণে কাত হল। খাটিয়ায় বসে পুল্লাইয়া বলল, "ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।"

"কি হয়েছে ?" নীলি জিজ্ঞেস করল।

"এই দেখ না, রেশনিং-এর নাম করে কি অনাচার চলছে। আমরা খাচ্ছি আম্বালি। (অঙ্কে সরষের দানার মত এক ধরনের ফসল হয়। খুব সস্তা। ওগুলো রোদে দিয়ে, পিষে গুঁড়ো করে সেদ্ধ করা হয়। এই খাদ্যটা গুরুপাক। চাষী ও গরীব পরিবারে এটা খাওয়া হয়।) মোড়লের বাড়িতেই চালের দোকান বসেছে। এবার আমার কার্ড আমি নিয়ে নেব। শুনছি আমাদের রেশন কার্ডে কাপড় এনে সে বেশী-দামে বিক্রি করছে। এইভাবে চুরি-চামারি করে রাতারাতি ওরা বড়লোক হয়ে যাচ্ছে।"

নীলি কথা বলল না। বাচ্চাটাকে খাটিয়ার উপর শোয়াল। শোয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মল্লু উপুড় হওয়ার চেষ্টা করছে। খাওয়াদাওয়ার পরে পুল্লাইয়া বারান্দায় বসল। নীলি রান্নাঘরের কাজ সেরে ছেলের কাছে বসে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মল্লু হুঁ হাঁ করছে। সঞ্জীব ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে ডাক দিল, "পুল্লি।" "কিরে ?" পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করল। তারপর সে এসে বসল। সঞ্জীব ঐ গ্রামে সব চেয়ে বেঁটে লোক। লাঠি খেলায় সে ওস্তাদ। কুস্তিতেও দক্ষ। দেখতে মনে হয় একটি কুমড়ো। মাথার চুল কাঁধে পড়ে। গোঁফজোড়া সব সময় পাকানো থাকে। হাতে একটা তৈলাক্ত লাঠি থাকবেই। বয়স পুল্লাইয়ার চেয়েও দশবছর বেশী। লোকে বলে, বেঁটের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। এক সময় সে গবর্মেন্টকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। পরে মদের ব্যবসা করে অনেক যুবককে চাকরি দিয়েছে। ওর রোজগার দেখে অনেকেরই চোখ টাটাত। শেষে শত্রুপক্ষ উঠে পড়ে ওর পেছনে লাগল। লক্ষ্মী যেন তার কাছ থেকে নড়তে চাইত না। শেষে শত্রুপক্ষের চেষ্টায় পুলিশ ওর পেছনে লাগল। ঘোষণা করল, "যে ধরে দেবে সে পাঁচশো টাকা পাবে।" সঞ্জীব গা ঢাকা দিল। বছরখানেক কেউ তাকে খুঁজে পেল না। একবছর পরে এক ইন্‌সপেক্টর মাথা ঘামিয়ে ফন্দি আঁটল। সে ছদ্মবেশে গ্রামে ঘুরে ঘুরে খোঁজার চেষ্টা করল। শেষে মোড়লের সাহায্যে চারদিকে ঢ্যাঁড়রা পিটিয়ে দিল। উত্তরপ্রদেশ থেকে এক নামকরা পালোয়ান এসেছে। ক্ষমতা যার আছে সে যেন ঐ পালোয়ানের সঙ্গে একহাত লড়ে যায়। পালোয়ান বানিয়ে যাকে ঐ ইনসপেক্টর এনেছিল তার চেহারাটা ছিল বিরাট। সে ছিল যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তার সঙ্গে লড়বে কি, তাকে যে দেখল সেই ভয় পেল। গাঁয়ের লোক পঞ্চমুখে তার দেহের প্রশংসা করতে লাগল। সঞ্জীবের আর সহ্য হল না। সে বেঁচে থাকতে তার গ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে একটা লোক লাঠি ঘুরিয়ে চলে যাবে। এটা তার কাছে অসহ্য লাগল। তাই সে ঐ পালোয়ানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আসরে নেমে গেল। পালোয়ান হেরে গেল। ছদ্মবেশী পুলিশ এই সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সঞ্জীব ধরা পড়তেই সবাই থ বনে গেল। পুলিশের দল তার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে তাকে থানায় নিয়ে গেল। সঞ্জীব তিনবছর জেল খেটে ফিরল। ফিরে এসে চারজনের মধ্যে মাথা

তুলে দাঁড়াতে তার লজ্জা করল। তার রক্ষিতা অন্য পুরুষকে নিয়ে ঘর করতে লাগল। সঞ্জীব তাকে মেরে ফেলবে ঠিক করল। তার কাছে গেলে সে সঞ্জীবকে তোয়াক্কা না করে বলল, "মেরে ফেলতে এসেছ ? নিজে তো দিব্যি জেলখানায় পড়েছিলে, আমাকে রেখে গেলে কোথায় ? কথায় আছে, 'বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা।' পুলিশের খাতায় একবার যখন তোমার নাম উঠেছে আর মুছবে না। যা, যাকে বিয়ে করে ছিলি তার সঙ্গেই ঘর করগে যা, আমাকে আর জ্বালাতে আসবি না।" সম্বোধনটা ঠিকই ছিল। কারণ সে সঞ্জীবের চেয়ে বয়সে বড়ই ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল সঞ্জীব কখনই তাকে মেরে ফেলতে পারে না। মেরে ফেলতে না পারায় দুঃখে, অভিমানে সে যে ছোরা দিয়ে মারতে গিয়েছিল সেটা সেই রাত্রেই মাঝ দরিয়ায় ছুঁড়ে নদীতে তিনবার ডুব দিয়ে চান করে নিল। ভেজা কাপড়ে বাড়ি ফিরে কড়া নাড়ল। বউ দরজা খুলতেই তাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে সে কেঁদে ফেলল। দিব্যি করল, "আর কোনদিন কোন মেয়েছেলের খপ্পরে পড়ব না।" বউ তার চোখের জল মুছে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো। তার বউয়ের মনে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল।

সেদিন থেকেই নাকি সঞ্জীবের গ্রহ কেটে গেছে। আর চারজনের মত সে ক্ষেত-খামারে কাজ করতে লাগল। জমির প্রতি তার টান দেখা দিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার কোলে উঠল একটি ছেলে। এইভাবে ভেঙ্গে যেতে যেতে একটি ঘর আর ভাঙ্গল না। সংসারের বাঁধন শক্ত হল। তার বউ খুব হিসেবী ছিল। পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই সে গ্রামের এক গণ্যমান্য লোকের মত আচরণ করতে লাগল। এখন সে তিনটি সন্তানের বাপ হলেও তার গাল আর গোঁফ আগের মতই ভরাট রয়েছে। এখনও সে বাঘের বেশ ধরে একলাফে একতলার বাড়ির ছাদে ওঠে। জ্যান্ত মুরগী মেরে ছাড়িয়ে চিবিয়ে খায়।

এহেন সঞ্জীব পুল্লাইয়ার সঙ্গে ডেকে কথা বলে। গ্রামে যে অন্যায় অধর্ম চলছে সে বিষয়ে ওরা আলোচনা করল। জিনিসপত্রের দাম গত বছরের তুলনায় এবছর কত বেড়েছে তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামাল। গাঁয়ের গরীবরা খুব কষ্ট পাচ্ছে। যাদের অগাধ টাকা পয়সা তারা ভুলেও হাত উপুড় করছে না। পুল্লাইয়া বলল, "মোড়ল আর তহসিলদারকে একটু ধমক দিতে হবে। ওরা বড্ড বাড় বেড়েছে।"

নীলি ছেলেটাকে কোলে করে বারান্দায় এসে বলল, "অনেকক্ষণ ধরে শুনছি, আজ বাদে কাল তসিলদার যদি বলে, তোমাদের রেশন, তোমাদের কাপড় আমি আর নেব না। তখন কি হবে ? রেশন তোলার কাপড় কেনার টাকা গাঁয়ের কজনের কাছেই বা আছে ?"

"কথাটা মন্দ বলনি।" বলল সঞ্জীব।

"না কিনতে পারলে কি হবে ? গর্মেণ্টের জিনিস গর্মেণ্টের ঘরেই ফিরে যাবে। আমাদের নাম করে জিনিস নিয়ে, আমাদের পেটে লাথি মেরে, ওরা বড়লোক হবে আর

আমরা বসে বসে তা সহ্য করব। সব ধোকাবাজি। এই ধোকাবাজি আর চলতে দেওয়া যায় না।" বলতে বলতে পুল্লাইয়া উঠে পড়ল। আবেগে কথা বলতে বলতে পুল্লাইয়াকে হাসিমুখে উঠতে দেখে নীলিও হাসিমুখে তার দিকে তাকাল। দাঁড়িয়ে পুল্লাইয়া আবার বলল, "কালকে কোপারেটের কাছে বসব। যারা সেদিকে আসবে তাদেরই এই অন্যায়ের কথা বলব।"

"তসিলদার যদি বলে, কারা কিনবে তাদের ডেকে নিয়ে এস। তখন কি করবে ?"

"সে কথা বলার মুখ ওর আছে ? আমি গর্মেন্টের কাছে সব জানিয়ে দেবো না।"

সঞ্জীব কো-অপারেটিভের সঙ্গে কিছুটা জড়িত থাকায় ও ব্যাপারে সে আর কিছু বলল না। সে জানে, কোত্থেকে কি হচ্ছে। তাই "তুমি বস, আমি আসি।" বলে উঠে পড়ল।

"বুঝলে নীলি, খড়ের গাদার কাছে কুকুর বসে থাকলেই বা কি আর না থাকলেই কি। আর যাই হোক কুকুর তো খড়ে মুখ দেয় না। গাঁয়ে এখনও মানসম্মান আছে। কি দরকার, এখন তুমি একটা কিছু করতে যাবে, শেষে দেখা গেল তোমার মানসম্মান আর রইল না। মা বাবা মারা গেলেও মাথা তুলে ঘোরাফেরা করা যায়, কিন্তু মান-সম্মান গেলে আর কিছুই থাকে না। এই যে যাদের কিছুই নেই এরা কি বিপদে-আপদে তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবে ? তেমন বিপদে পড়লে ঐ যাদের আছে তারাই দেখবে।" বলে সে চলে গেল।

পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। গোঁফে তা দিতে দিতে বউয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে ছেলেকে নিয়ে বারান্দায় চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের উপর তাকে শুইয়ে "মল্লু, তোর দাদুর ছেলে, তোর বাবা, পেটে খেতে না পেলেও নীতি ছাড়বে না হ্যাঁরে ব্যাটা তুই কি করবি ?"

ছেলেটা সশব্দে হাসল। পুল্লাইয়ার মন আনন্দে ভরে গেল।

চোদ্দ

সংক্রান্তি এসে গেল। মল্লু চিৎ হচ্ছে, উপুড় হচ্ছে। সারা ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে। ওর ঐভাবে তাকানো দেখে পুল্লাইয়ার খুব আনন্দ হয়। ছেলের সামনে সে লাফাতে লাফাতে "ধিনাক্ ধিনাক্ ধা, ঝিনা ঝিনা কড়ি, ঝিন্ ঝিনা কড়ি" বলতে বলতে লাফাতে থাকে। ছেলেটা হাত নাড়ে, হাসে, খুশীতে তার সমস্ত শরীরটা যেন নড়েচড়ে ওঠে। বারবার "হাঁ হুঁ" করে কি যেন বলতে চায়, একবার দুহাতে ধরে বাচ্চাটাকে উপরের দিকে পুল্লাইয়া তোলে। বাচ্চাটা ভয় পায়নি। খিলখিল করে হেসেছে। তবে ওভাবে তোলাতে বুড়ি চটে গেছে।

"তোমার ছেলেটা বাপু বড্ড জ্বালাচ্ছে। আল্পনা দেওয়ার সময় আমার পিঠে ঠেস দিয়ে গড়ায়।" বুড়ি বলল।

মল্লুর এখনও ছমাস পেরোয়নি…মাঝে মাঝে বসছে! শুধু বসা নয়, দেয়াল ধরে ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টাও করছে। ওর দাঁড়ানোর চেষ্টা দেখে আনন্দে চিৎকার করে "আমার মল্লু আমার মল্লু" বলতে বলতে পুল্লাইয়া তাকে এক নাগাড়ে চুমো খেতে থাকে।

বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে বলল, "বয়স বুঝে ভাত, যত ভাত তত শরীর। তোমার ছেলে আসছে বছর হাঁড়িতে একদানা ভাত রাখবে না…হায় আমার পোড়া কপাল, আমিই তোমার ছেলেকে নজর দিচ্ছি!" বলে মল্লুর মাথায় তিনবার থুপথুপ করে থুথু ফেলল।

ছেলেটা দিনকে দিন বাড়ছে। আর সবাইকে ব্যস্ত করে রাখছে।

কলাইয়ে পোকা ধরলেও খুব একটা খারাপ ফসল হয়নি। জমিতে যত কলাই আশা করা গিয়েছিল তার চেয়ে খুব একটা কম হয়নি। মহাজনকে দিয়ে থুয়ে তেমন ধান ঘরে তোলা যায় না। পুল্লাইয়ার নিজের জমিতে যা ফসল হয় তাতেই কোনরকমে চলে যায়। না চলে উপায় কি। হিসেব করে চালাতে হয়। তা না হলে রেশন ধরতে হবে। রেশন ধরার পয়সা নেই। সুতো কাটার জন্য পয়সা যা হাতে আসে তাতে তেলের খরচ হয়। গ্রীষ্মকাল না কাটলে ক্ষেতের কাজ শুরু হবে না। সোড়ির ফসল গ্রীষ্মকাল না এলে উঠবে না।

বাজারের অবস্থা যাই হোক মল্লু তার জন্য বাপকে রেহাই দেয় না। বলদের ডাক শুনেও মল্লু চমকায় না। চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে চাঁদকে ডাকতে শিখেছে। বটগাছে পাখি ডাকলে সে ঐদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মা-বাবার দিকে তাকিয়ে হাসে। কাজ থেকে এসেই তাকে কোলে তুলে না নিলে সে কাঁদে। ছোট্ট একটি দাঁত তার দেখা গিয়েছিল। হাসার সময় তার ঐ দুধে দাঁত কত না সুন্দর দেখাত!

সেই বছরেই সরকার ধান নিতে শুরু করল। অজ পাঁড়াগাঁয়ে বুড়োবুড়িরাও 'প্রক্যুরমেন্ট'-এই ইংরাজী শব্দটা শিখে নিয়েছে। ঐ শব্দটা কানে গেলেই ওরা আতঙ্কিত হয়। কেউ কেউ বলে, "ধান বইব আমরা, ধান কাটব আমরা আর সরকারকে দিতে হবে কেন? আমাদের মাথায় ঘাম পায়ে ফেলা ফসল গর্মেণ্ট তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে যাবে।" এ ব্যাপারে পিসার কথাগুলো লোকে হাঁ করে গিলতে লাগল। চার-ভাগের মধ্যে তিনভাগের বেশী লোক তার কথায় বিশ্বাস করল। সে বলল, "রোয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে থাকতে থাকতেই গর্মেণ্টের হিসেব হয়ে গেছে। এখন ঐ গোঁজামিল দেওয়া হিসেব ধরে ধরে পুলিশ, এফ. এস. ও আর টি. এস. ও কে পাঠিয়ে ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে ফসল কেড়ে নেবে। কেউ তর্ক করলে নাকি জেলে পুরবে।"

পুল্লাইয়া গোঁফে তা দিতে দিতে বলল, "আমার ফসলে কে হাত দেয় দেখব।

প্রথমে যাদের বড় বড় গুদাম আছে তাদের গুদামে হাত দিক। তারপর টান পড়লে গর্মেণ্ট আসুক গরীবের গোলায়। গরীবের কাছে কেড়ে নিতে হবে না। তারা এমনি দেবে।"

"এ বছর হয়ত এভাবেই কেটে যাবে। তবে আগামী বছর ধানকাটার আগেই গর্মেণ্ট লোক পাঠিয়ে দেবে। ক্ষেতের ধান ঘরে তুলতে দেবে না।" পিসা জ্যোতিষীর মত বলল।

প্রাচীনকাল থেকে গাঁয়ের গোমস্তা ফসলের একটা ভাগ পেয়ে থাকে। উকিল সীতারামস্বামীর কথাই ধরা যাক ওদের ভাগ দশ বছরের হিসেব করে চারশো নিয়েছিল। যে গোমস্তা গাঁয়ে আছে তার বয়স খুব একটা বেশী নয়। বছর তিরিশ হলেও সে ছটি ছেলেমেয়ের বাবা। তবে ওর বাবা পাকা ঝুনো ধূর্ত শিয়াল বিশেষ। জমির ব্যাপারে এদিক-ওদিক কাণ্ডকারখানা করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। ছেলের হাতে অনেক ক্ষমতা থাকায় তার অনেক সুবিধা হয়েছে। তবে এতদিন এই অধিকার, জমি কেনাবেচা, জমি রেজিষ্টারী ইত্যাদির ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকত। এখন সেই সীমা বেড়ে "প্রক্যুরমেণ্ট' পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

এই বুড়োটার এক সময় প্রভাব প্রতিপত্তি খুব ছিল। তার কাছে অনেকেই বুদ্ধি নিতে আসত। শুধু গাঁয়ের নয়, অন্য গাঁয়ের লোকও আসত। সে তার একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে খুব ঘটা করে দিয়েছিল। বিয়ে একবেলার হলেও বিয়ের হৈ-হুল্লোর গান-বাজনা পাঁচদিন ধরে ছিল। জলু অঞ্চলের মালুকোদারুদের (মুঠেদের) সাত গাঁয়ের লোক একডাকে চিনত। ওদের যত ধনদৌলত ছিল তত সম্পত্তি ছোটখাটো রাজাদেরও ছিল না। ওদের যেমন রোজগার ছিল তেমনি খরচও ছিল। একই পরিবারে লক্ষ্মী সরস্বতীর আবির্ভাব খুব একটা দেখা যায় না। তবে এক পুরুষেই সেই পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিবারের লোক এখন নেহাত রেলের চাকরি পেয়ে খড়্গাপুরে আছে। তা না হলে ওদের না খেয়ে মরতে হত। ঐ মালুকোদারুদের কথা এখনও আশপাশের গ্রামের লোক বলাবলি করে। এখনও কেউ কেউ ওদের বাড়িতে খেয়ে আসা ঘি মাখা হাত শোঁকে। ঐ ধরণের পরিবারের সঙ্গে সেই সময় পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল বুড়োটা। কাজললতা থেকে খাটপালঙ্ক পর্যন্ত প্রত্যেকটা দামী জিনিসই জামাইকে দিয়েছিল। আঠেরোটা গোরুর গাড়ি করে আর একশ একটা বাঁকে জিনিস নিয়ে তার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। তখনকার দিনে অত পণের দাপট ছিল না। বহুবছরের মধ্যে মেয়েকে অত জিনিস নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে লোকে দেখেনি। এই সমস্ত খরচ সে করেছিল দশ একর জমি বিক্রি করে।

বৃদ্ধ লোকটি সারা জীবনে এই একটি কাজ খুব ঘটা করে করেছিল। বাকী কোন ব্যাপারেই তার অত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়নি। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর

একদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল। মেয়েটার বয়স পনের বছরও হয়নি। কিন্তু বুদ্ধিতে ছিল সে বৃহস্পতি। ঘরের কাজ কর্মেও ছিল সে নিপুণা। ঝি চাকর থাকলেও মালুকোদারুদের বউ আর মেয়েকেই রান্নার কাজ করতে হত। ফলে বউমাকেও করতে হল। নতুন শ্বশুর বাড়িতে ঢুকে রান্নাঘরের কাজকর্ম বুঝতে একটু বেশী সময় লেগে যাচ্ছিল। উনুনের কাছে হাঁড়ি নামানোর ন্যাকড়া ছিল না। প্রথম দিনই মেয়েটা শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করল, "মা, হাঁড়ি নামানোর ন্যাকডা কোথায়?" শাশুড়ি বলল, "বাপের বাড়ি থেকে একটা ন্যাকড়াও আনতে পারনি?" মেয়েটা তৎক্ষণাৎ নিজের পরে থাকা পট্টশাড়ির আঁচল ছিঁড়ে হাঁড়ি নামাল। আজও মেয়ের এই ঘটনা লোককে বলে বুড়ো আনন্দ পায়। তার ধারণা, মেয়ে সেই মুহূর্তে যা করেছে তাতে তার বাপের নাম রেখেছে।

জমি বিক্রির পর সে তার ছেলেকে খাতা লেখার কাজে জুড়ে দিল। তৈরি করল পাকা গোমস্তা। কাজ কবতে করতে তার কানে অনেক কথাই আসত। গর্মেণ্ট মাইনে বাড়াচ্ছে না। প্রজারা অভাবের ফলে সরকারী খাজনাই ঠিকমত দিতে পারছে না। আগের মত 'উপরি' দেওয়ার ক্ষমতাও ওদের কমে গেল। যারা খাজনা দেয় না, কর দেয় না তাদের ব্যাপারে সরকার এক একদিন এক এক রকমের আইন বের করছিল। ধান সংগ্রহ এক এক জায়গায় এক এক রকমের হচ্ছিল। সকালের আইন বিকেলে অচল হয়ে যাচ্ছিল।

দশ বছর আগে এক গরিসে (ষাট মণ) ধানের দাম ছিল ষাট টাকা। এখন দশগুণ বেড়ে হয়েছে ছ'শ টাকা। গরীব মানুষগুলো ভাবল দুনিয়াটা রসাতলে যাচ্ছে। মাটিতে পাপ ভরে গেছে। ভূমি আর পাপের ভার বইতে পারছে না। শুধু ধানের দাম নয়, ডাল নুন তেলের দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই। ব্যবসাদার পেরাইয়া এক আড্ডার (এক সের) দাম এক আনা বাড়লে বাড়ায় পাঁচ আনা। মোড়ল, মহাজন, জোতদার প্রমুখদের প্রয়োজনীয় জিনিস কোঅপারেটিভ থেকে কণ্ট্রোল দরে পায়। বাকী যা থাকে তা রাত্রের অন্ধকারে চোরাপথে পাচার হয়ে যায়।

রামুর উপর নীলাম্মা ভর করলে এখন আর ভীড় হয় না। রামুর পেট এখন আর চলে না। না চললেও সন্ধ্যে হয়ে গেলে মন্দিরের দরজা না খুলে সে পারে না। এক একদিন মন্দিরে বসে সে কাঁদত। কিছুক্ষণ কেঁদে তার মনে হত নীলাম্মা তার কান্না শুনেছে। পরক্ষণেই সে সান্ত্বনা পেত। পাড়ায় ঢুকে বাড়ি বাড়ি বলে বেড়াত, "নীলাম্মার পূজো দিন। ঘটা করে উৎসব করুন। জিনিসপত্রের দাম কমবে।" গরীবরা হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে বলত, "যাদের ট্যাঁকে পয়সা আছে তাদের পুজো দিতে বল।" তারপর সে যেত ধনীদের কাছে। ওরা রামুর কথা শুনে হো হো করে হাসত। এতক্ষণ রামুর পেট জ্বলছিল। ওদের হাসি দেখে ওর চোখ রাগে জ্বলে উঠত। রামু সরাসরি কারও কাছে হাত পেতে চাইতে লজ্জা পেত। না

চেয়ে সে ধানাই-পানাই করত। এর আগে তার জন্য পুল্লাইয়া একবার নয়, দু' দুবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে তার জন্য কিছু সংগ্রহ করে দিয়েছিল। আর পুল্লাইয়াকে দিয়ে চাওয়ানো যায় না। কি যে করবে রামু ভেবে পায় না। এমন সময় পুল্লাইয়াকে পাশ দিয়ে যেতে দেখল। এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে একথা-সেকথা বলতে বলতে তার সঙ্গে হাঁটতে লাগল। গোটা শরীরে হাঁটার মত একটুও ক্ষমতা তার ছিল না। তবু পুল্লাইয়ার বাড়িতে এসে সে চুপচাপ বসল। মল্লু হাঁটতে শিখেছে, "দাদু দিদা" বলছে। "দাদু দাদু" করতে করতে সে রামুর কাছে এল। রামু তার মুখের দিকে তাকাল। লম্ফর আলোতে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রামুর দাড়ি বেড়ে যাওয়ায় গোটা মুখ কালো দেখাচ্ছিল। রামু হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে "দাদু" বলে তার হাত ধরল মল্লু।

"মা নীলাম্মা তোকে বাঁচিয়ে রাখুক, দাদু। তুই হলি, আমাদের আঁধারের আলো। বুঝলে নীলি, এ হবে সমুদ্রের জাহাজের মত।"

পুল্লাইয়া ছেলের সামনে "ঝিনাক্ ঝিনাক্ তা তা" বলতে বলতে লাফাতে লাগল। ছেলে বাপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাফাতে গিয়ে পড়ে গেল। সবাই ভাবল মল্লু কাঁদবে। কিন্তু সে কাঁদল না। আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়াল। মল্লু "মা", "দাদু", "দিদা" যাই বলুক না কেন পুল্লাইয়ার মনে হয় ও "বাবা" বলছে। ছেলের মুখে "বাবা" ছাড়া অন্য কোন শব্দ ওর কানে যায় না।

নীলি রামুর কথা বলা আর বসার ঢং দেখে বুঝেছে সে কেন বসে আছে। চোল্লুর (অন্ধ্রে সরষের দানার মত একটি ফসল হয়। নাম চোল্লু। সেটা গুঁড়ো করে রুটি বানিয়ে অথবা ফুটিয়ে গরীবরা খায়।) আটার রুটি তৈরি ছিল। রামুকে সে খেতে দিল। রুটি ধরে চোখ আর কপালের কাছে ঠেকিয়ে রামু নীলাম্মা দেবীকে স্মরণ করল। তারপর সেইভাবে বসে বসে সে ঐ রুটিটাকে চিবিয়ে গিলে ফেলল। মুহূর্তে যেন সে শক্তি ফিরে পেল। মল্লুকে আদর করে উঠে বাড়ির দিকে পা চালাল। পুল্লাইয়া আবার ছেলের সঙ্গে গিয়ে খেলতে লাগল।

পাড়ার মাঝে কি যেন হয়েছে। হৈ-চৈ শোনা গেল। পিসাকে ঘিরে বহুলোকের ভিড় জমেছে। পিসা জোরে জোরে ঘোষণা করছিল :

"তোমরা আমার সব কথা বুঝতে পেরেছ তো··· ভগবান কৃষ্ণের কাছে যেমন ছিলেন অর্জুন, মহাত্মা গান্ধীর কাছে তেমনি আছেন নেহেরু। মহাত্মা গান্ধীই হলেন স্বয়ং একালের ভগবান। উনি জিদ ধরলে, ইংরেজদের যত সেনাই থাক, তিনি অটল থাকেন। ভগবান কৃষ্ণের আশীর্বাদে কৌরবরা শেষ হয়ে গিয়েছিল আর মহাত্মার কাছে গোরারা পিছু হটবে না? শোন, এবার দারুণ খবর বলছি, আজ রাত থেকে লাল-মুখোদের শাসন শেষ। কাল ভোর রাত থেকে আমাদের রাজত্ব শুরু হবে। এইবার দেখবে তোমরা! কাল ভোর থেকে আমরা সবাই স্বাধীন হব।"

এক কথা বহুবার তাকে বলতে হচ্ছিল। রামু পিসার ভাষণ ঐ ভিড়ের এককোণে দাঁড়িয়ে শুনছিল। লক্ষ্য করল, মোড়ল আরাম কেদারায় বসে পিসার ভাষণ শুনছে। পিসা নাটকীয় ভঙ্গীতে বলতে লাগল, "এখন যা কিছু দেখছ সব বদলে যাবে। তোমাদের আগেই বলেছি দেশের সব ক্ষমতা এবার কংগ্রেসের হাতে আসছে। নেহেরু হলেন তার মাথা। যাদের কাচ্চাবাচ্চা বেশী, তারা বেশী জমি পাবে। যাদের কম আছে তারা কম জমি পাবে।"

"যাদের বাচ্চা নেই ?" কে যেন ভিড় থেকে প্রশ্ন করল।

"যাদের নেই তাদের আমাদের সরকার খু-উ-ব কম জমি দেবেন।" পিসা গলা ঝেড়ে আবার বলল, "এবার থেকে শুধু যে শহরের বাবুরাই কালেক্টর হবে তা নয়, তোমার আমার ছেলেও কালেক্টর হবে।"

"দূর। গুল মারছে।" কে যেন বলল।

"তুমি হলে কুয়োর ব্যাঙ্। তুমি এসব জানবে কি করে ? সরকার চাইবে বুদ্ধিমান ছেলে, মেধাবী ছেলে। সে ছেলে তোমার হোক, আমার হোক, যারই হোক। সে ঐ সুযোগ পাবে। আমি বড় হই ছোট হই আমার ছেলে যদি ভালো হয় তার উন্নতির হাজার পথ খোলা থাকবে। মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকবে না। জাতিতে জাতিতে ভেদ থাকবে না। ধোপার মেয়ের সঙ্গে নাপিতের ছেলের, নাপিতের মেয়ের সঙ্গে বামুনের ছেলের বিয়ে হতে পারবে। যে বাধা দেবে তাকে আমাদের সরকার জেলে পুরে দেবে।"

"যে রাজাই সিংহাসনে বসুক আমাদের এই অভাব কি দূর করতে পারবে ?" একটা বুড়ি প্রশ্ন করেছিল।

"নিশ্চয়ই পারবে। যে অভাব সৃষ্টি করবে তাকেই জেলে পুরবে। ফলে রাতারাতি অভাব দূর হয়ে যাবে। খোদ আমাদের সরকার, আমাদের যাতে ভালো হয় তা দেখবে না ? তোমরা দেখো, এবার থেকে দেশের কাজ কেমন হয়। একেবারে ম্যাজিকের মত দেশের কাজ হবে। এই বলে রাখলাম। দুদিন পরেই দেখতে পাবে।"

এই কথাগুলো অনেকেরই হয়ত ভালো লেগেছিল। কিন্তু রামুর ভালো লাগেনি। আস্তে আস্তে ভিড়ের ভেতরে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে সে তাকাল। এক একজনকে দেখে তার মেজাজ গরম হয়ে গেল। মাত্র কদিনের মধ্যে যে সব ছেলে ছোকরাগুলো নিজেদের "স্বদেশী করি" বলে প্রচার করছে সেসব অকালপক্ক ছোঁড়াগুলো সেই ভিড়ের মধ্যে ছিল। রামু ওদের চেনে। সন্ধ্যে হলেই ওরা চোলাই মদ খায়। মাসে দশদিন শহরে সিনেমা দেখতে যায়। যেখানে সেখানে যার তার সামনে সিগারেট ধরিয়ে রিং করে ধোঁয়া ছাড়ে। তরুণী মেয়েদের কটাক্ষ করে। সুযোগ পেলেই তাদের ইজ্জত নষ্ট করে। ওরাই হল খুদে নেতা। এরা কারও কথা শোনে না, এমন কি মা-বাপের কথাও।

পিসার ভাষণ শুনতে শুনতে এসব ছোঁড়াগুলোই মাঝে মাঝে "বাঃ বেশ" প্রভৃতি ধ্বনি দিচ্ছিল। ওদের কথা শুনে পিসা আরও উত্তেজিত হয়ে যা নয় তাই বলে যাচ্ছিল।

একসময় আর থাকতে না পেরে রামু "পিসা" বলে চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকারের ফলে সমস্ত পরিবেশ কয়েকমুহূর্ত চুপ মেরে গেল। "তোমাকে কে বলেছে? ম্যাজিকের মত কাজ হবে তোমাকে কে বলেছে?"

পিসা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তার কথা শুরু করার আগে রামু বলল, "আমরা ঠিক থাকলে সবাই তো ঠিক থাকবে। গদিতে যেই বসুক, আমাদের যদি একটা নীতি না থাকে, কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় তা যদি আমরা না বুঝতে পারি তাহলে দেশ আরও রসাতলে যাবে··।"

নাইডু (মোড়ল) রক্তচক্ষু করে তার দিকে তাকাল। রামু আরও ক্ষেপে গিয়ে বলল, "এই যে সব মাতব্বরগুলো এখানে আছে এদের কজনের নীতিবোধ আছে? গাঁয়ের লোকে খেতে পাচ্ছে না, পরতে পারছে না আর এরা চোরাপথে কারবার করে রাতারাতি ফুলে ফেঁপে যাচ্ছে। এদের ছেলেরা সন্ধ্যে হলেই মাতাল হয়ে যা ইচ্ছা তাই করছে। এসব মাতালগুলো আমাদের মাতব্বর হবে পিসা?"

"চুপ কর নাপতে ব্যাটা।" মোড়ল বলল।

"চুপ করব রে করব। নেতা হওয়ার শখ হয়েছে তোমার। তুমি যদি সত্যি নেতা হও অনেক আগেই পুজো দিতে তুমি। মানুষের মঙ্গল চাও না। চাইলে অনেক আগেই ঘটা করে পুজো দিতে। মা খুশী হতেন। গাঁয়ে অভাব থাকত না। কিন্তু তোমরা তো তা চাও না।"

মাথা ফেটে যাওয়ার মতন একটা আঘাত রামুর মাথায় পড়ল। চারদিকে ধেনো মদের গন্ধ ভক্‌ভক্‌ করে ভেসে আসছিল। মার খেতে খেতে রামু মোড়লকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অনেক কথা শোনাল। তখনও তার পিঠে ঘুষি পড়ছিল। মার খেতে খেতে রামু চিৎকার করে বলল, "তোমরা যদি এক বাপের ছেলে হতে, তাহলে চোরাকারবারী করে যারা রোজগার করেছে তাদের খরচ করিয়ে গাঁয়ে যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের খেতে দিতে। লোকে খেতে পাচ্ছে না আর তারা বড়লোক হচ্ছে। তোমাদের লজ্জা করছে না?"

এসব চিৎকার পুল্লাইয়ার কানে যেতেই সে ছুটে এসে ঐ ভিড়ের ভেতরে ঢুকে গেল। ঢুকে দেখল চার-পাঁচটা লোক রামুকে মাড়িয়ে মেরে শেষ করে ফেলছে। তখনও রামু চিৎকার করে বলে যাচ্ছে, "তোমাদের কোন নীতি নেই। তোমরা জানোয়ার।" এই অবস্থা দেখে পুল্লাইয়া ধাক্কা মেরে ওদের সরিয়ে গর্জে উঠল, "তোমরা বলদেরও অধম। বলদেরও দয়ামায়া থাকে। ফের যদি কেউ রামুর গায়ে হাত দাও তার গলা টিপে শেষ করে দেবো। শালা মাতব্বর হয়েছে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।"

রাগে গজগজ করতে করতে মোড়ল জিজ্ঞেস করল, "কে রে ?"

"আমি পুল্লাইয়া। তুমি মোড়ল মোড়লের মত থাক।" কথার মাঝে রাজু "যা যা" বলে উঠল। পুল্লাইয়ার রাগ আরও বেড়ে গেল। এক ঝটকায় ওর হাত ধরে টেনে ছুঁড়ে ফেলল তাকে দূরে। মাটিতে ধপাস করে পড়ে সে বলল, "তোকে যদি আমি না দেখে নি তো আমি এর্‌রাইয়ার ছেলে নয়।"

"আরে চুপ কর হাঁদারাম। কে বলল তোর বাবা এর্‌রাইয়া ? তোর বাপের নাম তুই জানিস ? শুনে রাখ, তোর বাপের নাম হল গুড্ডি ভেঙ্কান্না।"

অবস্থা অন্যদিকে ফিরে গেল। চারজন লোক রাজুকে ধরে তার বাড়ির দিকে নিয়ে গেল। যেতে যেতে রাজু বলল, "ছাগল কখনও বাঘকে খায় না। তোকে শেষ করতে বেশী সময় লাগবে না।"

পুল্লাইয়া রামুকে তুলে দাঁড় করিয়ে হাত ধরে তার বাড়ির দিকে নিয়ে গেল। রামু দুঃখে কথা বলতে পারল না। পথে একজনের বাড়ির বারান্দায় গুড্ডি ভেঙ্কান্না ও গন্নেম্মা বসেছিল। কিছুক্ষণ আগে যা ঘটেছিল তা ইতিমধ্যেই সারা গাঁয়ের লোক জেনে গেছে। ঐ বাড়ির বউটা ওদের ফ্যান দিলে ভেঙ্কান্না বলল, "মা জননী, রামুটা সবাইকে বলছে, মায়ের নামে পুজো দিতে। লোকের যেমন নীতি নেই নীলাম্মারও নীতি নেই। মায়ের যদি নীতি থাকত রাতারাতি যারা বড়লোক হচ্ছে তাদের আবার রাতারাতি গরীব করে ফেলতে পারত না ?"

কথাটা কানে যেতেই রামু বলল, "ছি, ছি, মায়ের নামে তোরা ওকথা বলতে পারলি ? মায়ের নীতি আছে বলেই সুযোগ দিচ্ছে। যাতে তার সন্তানদের জ্ঞানবুদ্ধি হয়।" বলে সে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

রামুর চুলের মুঠি ধরে ওরা মেরেছিল। তার বাঁধা চুল খুলে গেল। খোলা চুলে হাঁটতে হাঁটতে রামু বলল, "বুঝলে পুল্লাইয়া, আমি আগে মিথ্যা কথা বলতাম। আবোল তাবোল কথা প্রচার করতাম। ভেক ধরে লোককে ঠকাতাম। তারপর মাকে চেনার চেষ্টা করেছি। মাকে আমি চিনতে পেরেছি। এতদিনে আমার একটা গতি হবে। আজ আমাকে যারা মারল ওরা আর আমাকে···" পুল্লাইয়া বলল, "তোমার কোন ভয় নেই।"

রামু একটু হেসে বলল, "ভয় পাইনি। নীতি ধর্মের কথা হচ্ছিল তো ? তাই ঐ নীতি ধর্মের ব্যাপারেই তো আমাকে মার খেতে হল। মার খেয়ে কেঁদেছি। কাঁদলে মাকে পাই। নেহাত আমার হাঁপানীর রোগ। তা না হলে আমার ঐ মারে কি হত। তুমি এখন এসো বাবা। মার উৎসব নিয়ে মাথা ঘামাবো না। কি দরকার ? তোমাকেও বলি, লাঠি খেলায় মেতে আর লাভ নেই। এদেশে কিচ্ছু হবে না।"

পুল্লাইয়া ঘুরে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। রামু ঘরে পা রাখতেই ছেলে যা মুখে এলো তাই শুনিয়ে দিল, "যত বয়স বাড়ছে তত তোমার বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। না ?

লোকে সেয়ানে সেয়ানে লড়ে। তুমি কার বিরুদ্ধে লড়ছিলে ? আমার সমস্ত মানসম্মান ডুবিয়েছ। যাও এখন থেকে তুমি আলাদা থাকবে।"

রামু ছেলের কথা শুনে আকাশের দিকে তাকাল। তারাগুলো মিটমিট করছিল। আকাশের বুকে দেখতে পেল সে নীলাম্মার পা। মায়ের চরণযুগল দেখে তার বড় শান্তি হল। সে মনে মনে হাসল।

পনের

বীরের মতন রাজু বাড়িতে পা রাখল। বউ মুখ খুলতেই মোড়ল আর কোন কথা বলল না। রাজুর বউ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সময় আসুক, আমি পুল্লাইয়ার অবস্থা এমন করে দেবো যে ও তোমার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইবে।" বাপ বলল, "দূর দূর, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে ?" মোড়লের বাবা দু'এক কথায় রামুকেই সমর্থন করল। সঙ্গে সঙ্গে তার বউমা ফোঁস করে উঠল। বুড়ো আর কোন কথা বলল না। কতবার সে মনে মনে ঠিক করে উচিত কথা বলবে না। কিন্তু তবু বলে ফেলে। কথা যখন খাটে না তখন বলে লাভ কি। ছেলের সঙ্গে যে বেলা ঝগড়া করে সে বেলা বউমা তাকে কম খেতে দেয়।

ধানের দর দিনকে দিন বেড়ে যেতে লাগল। ফ্যানের অভাবেও বহু পরিবার তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। খুদ, কুড়ো যার যা ছিল বিক্রি করে ফেলল। এখনও চাষের কাজ শুরু হয়নি। তাই চাষীর হাতে কাজ নেই। অথচ পেটে খিদে আছে। ফলে মিথ্যা কথা চালাচালি হল। গাঁয়ের গরীব মানুষ শহরের দিকে পা বাড়াল। শহরেও যারা খেতে পেল না তাদের কেউ চুরি চামারির পথ ধরল। কেউ বা ইজ্জত বিক্রি করল। চুরি করতে যারা পারল তারা ভালোমন্দ খেয়ে দুদিন কাটাল। আর যারা ধরা পড়ল তাদের জেলে কাটাতে হল বেশ কিছুদিন। এই অবস্থায় কিছু কিছু লোক ভেবেছিল পিসার কথা মিথ্যা। পিসা নিজেও কষ্ট পাচ্ছিল। আধপেটা খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। এক একদিন এমন অবস্থা হত যে সে খেলে বাচ্চারা খেতে পারবে না। সেদিন সে উপোস করত।

"জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে কি ছেলে হাঁটতে আরম্ভ করে ? কথা বলে ? ধৈর্য ধরুন। আমাদের সরকার যদি গরীব হয় আমরা ধনী হব কি করে। সরকার ধনী হলে আমাদের কি গরীব করে রাখবে ?" এই ধরণের কথা পিসা বোঝাতে গেলে লোকে বলত, "সরকার যদি ইচ্ছা করে, কী না করতে পারে। ছাগলকে বাঘ বানাতে পারে, বাঘকে ছাগল বানাতে পারে। জিনিসের দাম, সরকার যদি কমাবে ঠিক করে তাহলে কি আর কমাতে পারে না ?"

পিসা বলত, "আরে ঐ জন্তই তো সরকার কণ্ট্রোল বসিয়েছে। কণ্ট্রোলের নামে সরকারের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এদিকে দেখ ব্যবসাদারগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে, কণ্ট্রোলের জিনিস চোরাপথে বিক্রি করে ফুলে ফেঁপে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। টাকার পোঁটলা বাঁধছে। বাঁধছে বাঁধুক, কতদিন আর বাঁধবে। যেভাবে আসছে সেভাবেই চলে যাবে। টাকা হল বুদবুদ, যেমন আসে তেমনি যায়। একটা টোকা মারলে ঐ বুদবুদ ফেটে যাবে। এর ফলে হয়ত না খেতে পেয়ে তুমি আমি মারা যাব। কিন্তু ন্যায়-নীতি-ধর্ম তো আর মরবে না। আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমার সরকার ধনী হলে আমিও ধনী হব। তখন দেখবে আজ যারা রাতারাতি বড়লোক হচ্ছে তারা বুক চাপড়াবে। ওদের তখন দেয়ালের লিখন পড়তে হবে। নীতির জন্ত প্রয়োজন হলে মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করব না।"

কাছেই পুল্লাইয়া দাঁড়িয়েছিল। তার গা রি-রি করে উঠল। "বেশ বলেছ হে, না খেতে পেয়ে মরে যাব? এখন যদি না খেতে পেয়ে মরি তাহলে কি অন্যায়ের পায়ে মাথা ঠুকছি না। গাঁয়ের মাতব্বররা কি করছে, তা কি নজরে পড়ছে?" কেউ কেউ ঠিক বলেছে বলল। আবার কেউ চুপ করে রইল। রাজু মিটি মিটি হাসতে হাসতে এসে সেদিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে পিসা, রেশন নিচ্ছ না কেন? তোমার যদি দরকার না থাকে বল, ওটা অন্য লোককে দিলে উপকারে লাগবে।"

"আমি আমার রেশন অন্য কাউকে দেবো না। আমার হাতে পয়সা থাকলে কিনব না হলে কিনব না।" পিসা বলল!

"তোমার কার্ড না দিলে চলবে না।" বলতে বলতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মোড়ল চলে গেল।

পুল্লাইয়া বলল, "পিসা শুনলে তো কথাটা। টি.এস.ও কে এটা জানাতে হবে।"

"ওরা সব এক। ওর মেয়ের বিয়েতে দেখলে না গোটা তালুকের বড়লোকদের ভিড়। যাক্ সব সময় কি আর জল ঘোলা থাকবে। ভালো জল কি আর বইবে না? ফলভোগ সবাইকেই করতে হবে। তোমার আমার চোখ বন্ধ করতে পারে কিন্তু সবার চোখ বন্ধ করা যায় না। সবার উপরে আছে ঐ ভগবান। আর ওর চোখে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা কারোর নেই।" বলতে বলতে পিসা চলে গেল।

বাপ আসছে টের পেয়ে মল্লু দুহাত তুলে নাচতে নাচতে বারান্দায় দাঁড়াল। পুল্লাইয়া তাকে কোলে তুলে নিতেই সারা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগল সে।

ধানের কণ্ট্রোল দর এক গরিসে তিনশ টাকা। কিন্তু ঐ দরে কেউ পায় না। কালো বাজারে ধানের দর ছ'শ সাড়ে ছ'শ এমন কি সাতশ পর্যন্ত ওঠে।

সে বছর ধান ভালোই হয়েছিল। ক্ষেতের ধান ঘরে এলেও কারও তাতে হাত দেওয়ার উপায় নেই। নীলি কিছুটা ধান এদিক-ওদিক দানধর্ম করেছিল। পুল্লাইয়া রেগে গিয়ে বলল, "ধানের দাম এখন সোনার দাম। একটা দানাও নষ্ট করা উচিত

নয়।” নীলি হেসে বলল, “ধানের দাম সোনার সমান বলে আমি কি হাত বেঁধে রাখব? ধান আগলে বসে থাকলে আকালে যারা মরছে তাদের দেখবে কে? আমার মা বলত, কুয়োতে জল থাকলে শেওলা থাকবে। শেওলা থাকলে জল থাকবে।”

পুল্লাইয়া আর কোন কথা বলল না। মহাজন এবছর সরকারী অনুমতি নিয়ে একেবারে বাড়িতে এসে ধান মেপে নিয়ে চলে গেল। পুল্লাইয়া নীলিকে বলল, “ছেলে আমার পয়া। ও জন্মেছে বলেই ফসল এত ভালো হয়েছে।”

১৯৪৮ সাল শুরু হল। ক্ষেতের ধান ঘরে তুলে পোঙ্গলের আগেই পুল্লাইয়া ছেলের জন্য রূপোর ঘুনসি তৈরি করল। মল্লু প্রথম প্রথম সেটাকে ধরে টানত। পরে অভ্যস্ত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সে মাকে ছেড়ে বাপের কাছে বেশীক্ষণ থাকতে শুরু করে দিল। বাপের কাছে বসত। নীলি রাত্রে টেনে ঘুমোত। মাঝরাত্রে ছেলে উঠে কাঁদলে পুল্লাইয়া তাকে কোলে করে বেড়াত, কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে তাকে বুকে শুইয়ে পিঠে মাথায় হাত চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত। বাপের হাতের উপর মাথা না রাখলে ছেলের ঘুম হত না। পুল্লাইয়া আস্তে আস্তে হাতটা টেনে নিলে মল্লু কাঁউ করে কেঁদে উঠত। পর পর চার রাত্রি কাঁদার ফলে বুড়ি ভাবল, মল্লুর বাতাস লেগেছে। রণভেরী ফলের গাছের ডাল চালে গুঁজে রাখল। তারপর সে আর অত কাঁদলো না। এক একদিন বুড়ি পূর্বপুরুষদের কাছে প্রার্থনা করত, মল্লুর উপর নজর রাখতে। মাঝে মাঝে সে বড় বিরক্ত করত। বাপের আদর পেলে কান্নাটা কমত। এক একদিন এমন হত যতক্ষণ বাপ না ফিরত ততক্ষণ কাঁদত। মাঝে মাঝে সাত সকালে বাপের সঙ্গে যাওয়ার জন্য জিদ ধরত। না নিয়ে গেলে কান্নাকাটি করত।

বুড়ি গান গেয়ে মল্লুর কান্না থামাত। কান্না থামালেও তার বিরক্তি যেন কমত না। বুড়ি ভাবল নাতির হজম হচ্ছে না। মাটির পুতুল বানিয়ে পাঁচটা ডাল, পাঁচটা পাতা, পাঁচটা গজা, কালো ন্যাকড়া, চুল, ভাত কুলোতে রেখে একটা ছোট্ট প্রদীপ রাখল। নাতিকে ফুঁ দিয়ে সেটা নাতির উপর থেকে নীচে তিনবার ঘুরিয়ে পাড়ার দক্ষিণদিকে রেখে এল। তার পরের দিন থেকে মল্লুর কান্না কমে গেল। কিন্তু তার শরীর ভাঙ্গতে লাগল। পশ্চিমাকাশে রক্তবর্ণের মেঘ প্রায় প্রত্যেকদিন দেখা যাচ্ছিল। ঐ মেঘের দিকে তাকিয়ে বুড়ি বলত, আমরা বাপু এই কণ্ট্রোল ফণ্ট্রোল জানতাম না। পাশের বাড়ির লোকের দু'পয়সা থাকলে আশপাশের প্রতিবেশীদের একটু আধটু দিত। এখনকার মত “মরছে মরুক” এরকম মন নিয়ে বড়লোকরা মুখ ঘুরিয়ে থাকতো না।

নীলির ভাত ফ্যান যা জুটত তার থেকেই কিছুটা ভেঙ্কান্না বা গন্নেম্মার মত অসহায়দের খেতে দিত। একদিন সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু পুল্লাইয়া ফিরল না। কর্তার জন্যে ভাত রেঁধেছিল। একটা কুষ্ঠরোগী ভিখিরি এল। তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। পাড়ার ঐ প্রান্ত থেকে আর্তনাদ করতে করতে ভিক্ষে চাইছিল। “দু'দিন ধরে পেটে

একটাও দানা পড়েনি মা। পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা মা, আর হাঁটতে পারছি না মা। মা জননীরা, এভাবে সোজা গিয়ে আমি নদীতে ডুবে যাবো। আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে অন্তত কয়েকটা শিয়াল প্রাণে বাঁচবে।"

কানে যেতেই নীলি বলে উঠল, "রাম রাম একি কথা।"

"আমি কোন পাপ করিনি মা। আমাকে যে ভগবান কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন জানি না মা। কোন্ জন্মে যে কি করেছি জানি না মা। কোন্ জন্মের ফলে যে এত কষ্ট তা বুঝতে পারছি না মা। এ জন্মে কষ্ট করলে আগামী জন্মে আমার কোন রোগ-শোক থাকবে না মা। আগামী জন্মে আমি এককথার মানুষ হয়ে চলব মা।" ঐ কুষ্ঠ-রোগীটা বলল।

নীলি স্বামীর জন্যে যে ভাত রেখেছিল তার থেকে অর্ধেক ভাত ওর এ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে ঢেলে দিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চোখের পলকে সে ভাতটা শেষ করে দিল। অত চট করে খেয়ে ফেলাতে নীলি ভেতরে ঢুকে বাকী ভাতটা এনে ওর বাটিতে ঢেলে দিল। ঝট্ করে মুখে পুরে নিয়ে সে বলল, "মা জননী, পেট হল সমুদ্র। খিদে হল আগুন। খিদের সময় যাহোক কিছু খেতে না পেলে খিদেটা মানুষকেই পুড়িয়ে ফেলে। আমার প্রাণ বাঁচালে মা। তোমার ধর্ম, তোমার পুণ্য কাজ, তোমার মাথার ছাতা হয়ে তোমাকে আগলে রাখবে মা।"

নীলি উনুন ধরিয়ে রান্না করতে লাগল। তার শরীর গুলোচ্ছিল। তার মাথা ঘুরছিল। পুল্লাইয়া কাঁপতে কাঁপতে এসে বাড়িতে পা রাখল। ছেলে হাসতে হাসতে দু'হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগোলে সে তাকে ছুঁলো না পর্যন্ত। সোজা গিয়ে সে খাটিয়ার উপর বসে পড়ল। তার দুচোখের কোণ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছিল। সাড়া পেয়ে নীলি এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে একটি কথাও বলতে পারল না। হঠাৎ একসময় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল সে। বাপকে কাঁদতে দেখে মল্লুও কাঁদল। এদের দুজনের কান্না দেখে নীলির চোখেও জল এল। বুড়িরও চোখ ছলছল করে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল গোটা পাড়ার লোক যেন কাঁদছে। ছোট বড় মেয়েপুরুষ সবাই কাঁদছে। কান্নাটা যেন খুব ভেতর থেকে আসছে। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের চোখে জল। শুধু ওদের পাড়া নয়, গোটা গ্রাম কাঁদছিল, গোটা দেশ কাঁদছিল। খবরটা যখন কুষ্ঠরোগীর কানেও গেল সেও বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

সারা গাঁয়ের লোক নীলাম্মার মন্দিরের সামনে হাজির হল। কোন্ এক বুদ্ধিহীন অজ্ঞ লোক নাকি স্বয়ং ভগবানকে গুলি করেছে। "ভগবান নেই, মারা গেছে। আবার তিনি আছেন, তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ভগবান না থাকলে দুনিয়া থাকতে পারে ?" এই ধরণের কথা এক একজন এক একভাবে বলতে লাগল। তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য সবাই মন্দিরে নীলাম্মার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল।

দশদিনের দিন নীলাম্মা মন্দিরের সামনে কাঙালী ভোজন হল। গাঁয়ের সবাই এক

হয়ে এই কাজটা করেছিল। সেইসময় রামু নীলাম্মার মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। তাকে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। সকলের খাওয়া দেখতে তার খুব ভালো লাগছিল। কৃতজ্ঞচিত্তে সে নীলাম্মার মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল। আর থাকতে না পেরে, মনের আনন্দ আর চেপে রাখতে না পেরে সে সকলের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বলল, "ওহে দেখ, দেখ, তোমরা দেখ, মা হাসছেন! মা আজকে খুব খুশী হয়েছেন। ঐ মহাত্মা গান্ধী ভগবান ছিলেন—স্বয়ং ভগবান। তাঁর নাম করে তোমরা আজ ভালো কাজ করলে। ভালো কাজ করলে নীলাম্মা দেবী খুব খুশী হন। ভূত পেত্নী দূরে সরে যায়।"

পিসা দাঁড়িয়ে বলল, "আমাদের ভগবানকে আমরা ঠিক সেই রূপে দেখতে পাবো না। তাঁর কথামত চললে দেশের জমিদার যেমন খেতে পায় গরীবরাও তেমনি খেতে পেত। বাড়িতে একজন পেটভরে খেয়ে নাচানাচি করলে, অন্যেরা যদি না খেতে পায় তাদের কি অবস্থা হয়? যে বাড়িতে এরকম হয়, সে বাড়ি কি একটা বাড়ি? সে বাড়িতে কি ঐক্য থাকে? যে লোকটা সবাইকে না দিয়ে খায় সে কি মানুষ? যতদিন না ভালো ফসল ঘরে উঠছে ততদিন মিলেমিশে ভাগ করে খাওয়াই উচিত। যে মানুষ নিজে না খেয়েও অন্যকে খাওয়ায় সেই হল মহৎ। রাতারাতি সবাই কি আর মহৎ হয়ে যায়?"

বড়রা মুখ ঘুরিয়ে নিল। ছোটরা শ্রদ্ধাভরে তার কথা শুনছিল। এমন সময় সঞ্জীব এসে মোড়লের কানে কানে কি যেন বলল। সে তাড়াতাড়ি পিসার হাত ধরে বলল, "ভাষণ পরে হবে, আগে খাওয়াতে হবে। এখনও অনেক লোক বাকী। চল পরিবেশন করতে হবে।"

ভাষণ দেওয়া বন্ধ করে পিসা পরিবেশন করতে করতে বলল, "আর কার কি চাই বল? ভাত নেবে? পুলুসু (তেঁতুলগোলা ফোটানো ও ফোঁড়ন দেয়া জল) চাই?"

ষোল

মল্লু পল্লাইয়ার গলা জড়িয়ে ধরল। পুল্লাইয়া যেন এক দৌড়ে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখল। বাপ হাঁটছে, ছেলেও হাঁটছে। পুল্লাইয়া মাঝে মাঝে থামছিল, হাঁটছিল, ছুটছিল। মল্লুও তাই করছিল। ঐভাবে সে আদেম্মার বাড়িতে পৌছাল।

আদেম্মা পেটের ব্যথায় ছটফট করছিল। জোয়ান জিরের গুঁড়ো খেয়েছে কোন উপকার হয়নি। পাড়ার বৈদ্য ভাস্করলবণ দিয়ে গেল। তাতে কিছুটা কাজ হলেও পুরোপুরি ব্যথা সারেনি। মাঝে মাঝে ব্যথা উঠছিল। সেই ব্যথায় সে ছটফট করছিল।

প্রতিবেশীরা ছুটে গেল। পিসা পরামর্শ দিল, "শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। ওরা ফটো তুলে কি যে হয়েছে ঠিক ধরে ফেলবে।" তার পরামর্শ আদেম্মার জামাই কানে তুলল না। লোকটা এমনিতেই কিপ্‌টে। সমস্ত ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর তার কিপ্‌টেমি আরও যেন বেড়েছে। সে বলল, "কি দরকার, পাড়ার ডাক্তার বুক ঠুকে বলেছে সারিয়ে দেবে। একজন দেখছে যখন তখন অত হাঁকপাঁক করার কি আছে।" এরপর কেউ কিছু আর বলল না।

এক পুরিয়া ওষুধ খাওয়ার পর ব্যথা কিছুটা কমে গেল। ঐ অবস্থায় আদেম্মা, বিছানায় শুয়ে শুয়েই মল্লুকে দেখে, হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে ডাকল। কিন্তু মল্লু ভয় পেয়ে বাপকে কাছে ডেকে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার পিঠ চাপড়িয়ে পুল্লাইয়া ছেলেকে আদর করল।

পুল্লাইয়ার পেছনে অনেকবার আলোচনা করেছে। এখন তাকে দেখেই বলব বলব করে বলেই ফেলল জামাই। বিয়েতে পুল্লাইয়া যে দু'শ টাকা নিয়েছিল সেই টাকার তাগাদা দিল সে। "কাঠের দাম হু হু করে বাড়ছে, খুব তাড়াতাড়ি কিছু কাঠ কিনে রাখতে হবে। টাকার টান পড়েছে।" জামাই বলল। পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। আদেম্মা বলল, "অত তাড়াতাড়ি ও বেচারা কি করে দেবে গৌরাইয়া?" তৎক্ষণাৎ সে মুখের উপর জবাব দিল, "ওর দরকারের সময় আমরা দিয়েছি। আমাদের প্রয়োজনের সময় ও দেবে না? কাল যে কাঠের দাম একশ টাকা ছিল আজ সেটা একশ পঁচিশ টাকা হয়েছে। পুল্লাইয়া একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলে আমি টাকাটা নিজের কাজে লাগাতে পারি। আমার লোকসানটা একটু কম হয়।"

আদেম্মাকে দেখতে গিয়ে এরকম অবস্থায় পড়বে ভাবতে পারেনি পুল্লাইয়া। বাড়ি ফিরে এসে বউকে জানিয়ে সব বলল, "ব্যাটার টাকার নাকি টান পড়েছে? এক গরিসে ধান সাতশ টাকা করে বিক্রি করেছে। ওর অভাব কিসের?"

নীলি কিছুক্ষণ চুপ করে বলল, "এতদিন কিছু বলেনি, আর একটা ফসল ঘরে ওঠা পর্যন্ত যদি…"

কথা শেষ করার আগেই "ও কি এমনি দিয়েছে নাকি? সুদ দিচ্ছি না? সুদের ধান মেপে নিচ্ছে না?" পুল্লাইয়া বলল।

"সোনা রেখেই বা কি হবে?" বলে নীলি ঘরে যা সোনাদানা ছিল সব এনে স্বামীর হাতে দিয়ে বলল, "ঐ চিন্না স্যাকরার কাছে যাও।"

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে পুল্লাইয়া বলল, "এতে নাকি অনেক ময়লা ঢুকেছে। পান মেরে টেরে যা দাম হবে…আসলে কি জান…আমাদের একটু ঠকাতে চায়…তাই ভাবছি শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আসব।"

"সবাই শহরে গেলে স্যাকরা কাকে নিয়ে থাকবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে, ওকেও তো সংসার চালাতে হবে। আমরা যত টাকায় কিনেছি তার চেয়েও তো বেশী পাব…

ওর কাছেই বিক্রি করে দাও। শহরে আর গিয়ে কাজ নেই।" বলে জোর করে তাকে স্যাকরার কাছে পাঠিয়ে দিল।

যা পেল তাতে ধার শোধ হয়ে গেল। ধার শোধ করে কিছু টাকা হাতে রইল। সেই টাকা নিয়ে কো-অপারেটিভ স্টোর্সে গেল কাপড় কিনতে। সেখানে কাপড় নেই। কারণ জিজ্ঞেস করলে ওরা বলল, "কোন্ যুগে তোমার হাতে টাকা আসবে, তুমি সেই টাকা নিয়ে কাপড় কিনতে আসবে, তারজন্য তো স্টোর্সে কাপড রেখে দেওয়া যায় না। এখানে যা আসে, সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি হয়ে যায়।" ওদের বলার ভঙ্গীতে বিদ্রূপ ছিল।

পুল্লাইয়া গেল বুড়ো কাপড় ব্যবসায়ী সালি পাপাইয়ার কাছে। সে বলল, "তুলোর দাম আগুন। সুতোর টান পড়েছে বাজারে। কাপড থাকবে কোথেকে। নামেই কণ্ট্রোল, কিছুই তো পাইনা সেখান থেকে।" আরও অনেক দুঃখের কথা। বলে কিছু কাপড় বের করে দেখাল। পুল্লাইয়া বউয়ের জন্য একটা শাড়ি, নিজের জন্য একটা ধুতি এবং বুড়ির জন্য একটা থান কিনল। এই সেদিনও যে শাড়ির দাম দু'টাকা ছিল এখন সেই শাড়ি দশ টাকা দিয়ে কিনতে হল। গাঁয়ের সালি পাপাইয়ার কাছে কাপড় কেনা হয়েছে শুনে নীলি খুব খুশী হল।

নীলি নতুন কাপড় পূর্বপুরুষের নামে উৎসর্গ করে পূজো দিয়ে প্রথমে থানটা বুড়ীকে দিল। বুড়ী নতুন থান পরে নাতিকে কোলে তুলে আদর করছিল। দূর থেকে বাপকে আসতে দেখে মল্লু তাড়াতাড়ি তার কোল থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে তার কাছে হাসতে হাসতে ছুটে গেল। তাকে কোলে তুলে নিয়ে পুল্লাইয়া বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে খেলা করল। নতুন ধুতিটা আগে ছেলের গায়ে জড়াল। বুড়ী তা দেখে ফোকলা দাঁতে হাসল। কাপড় জড়িয়ে পুল্লাইয়া ছেলেকে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তুলল। ছেলে চালের দিকে হাত বাড়াল। মল্লুকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে অথবা দোলালে একটুও ভয় পায় না। দিনকে দিন মল্লু বাপের কাছেই বেশী করে থাকতে আরম্ভ করল। রাত্রে ঘুম ভাঙ্গলে যদি দেখে বাপ পাশে আছে তাহলেই মল্লু খুশী। বুড়ী বলত, একেবারে বাপের ছেলে হয়েছে। মা যেন ওর কিছু নয়। পুল্লাইয়া বলত, "যার কাছেই থাকুক এ তোমার নাতনিরই ছেলে।" এই কথা শুনে বুড়ী খুব খুশী হয়ে হাসত। নুয়ে পড়া কোমরটা নিয়ে বুড়ী যেখানেই বসুক তার একটা চোখ থাকত মল্লুর উপর। সব সময় তার মন পড়ে থাকত মল্লুর উপর।

মল্লুকে খেলাতে খেলাতে মাঝে মাঝে বুড়ী অতীতের কথা ভাবত। কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে যেত। কোনদিন বুড়ী কোনকিছুতেই অধৈর্য হয়নি। আনন্দে যেমন ফুলে ওঠেনি, দুঃখে তেমনি কোনদিন কুঁকরে যায়নি। মল্লু বাপের সঙ্গে ক্ষেতে যাবে। বুড়ি যেতে দিল না। মল্লুর কি রাগ। বুড়ীর চুল ধরে টানে। তবু সে যেতে দিল না। তখন তার নাকে মুখে আঙুল ঢুকিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড করে দিত। তবু বুড়ী বিরক্ত হত না। হাসতে হাসতে বলত, 'হুঁ জিদ আছে। কোন্ ঝাড়ের বাঁশ দেখতে হবে

তো...” এটা ওটা বলে বুড়ী তাকে ভোলানোর চেষ্টা করত। সেই সুযোগে পুল্লাইয়া অন্য পথে ক্ষেতে চলে যেত।

পুল্লাইয়া ক্ষেত থেকে ফিরে এসে মেঝের উপর ছেলেকে ঘুমোতে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে খাটিয়ার উপর শোয়াত। বাপের গায়ে হাত পড়তেই ছেলে টের পেয়ে “বাবা” বলত। বাপকে পেলেই তার ঘুম ছুটে যেত। কোলে উঠে গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরত।

গ্রামের গোমস্তা বাপের, হারানো সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্যই হোক, পরিবারের খরচখরচা পোষানোর জন্যই হোক, সে কণ্ট্রোলের যুগে দু'পয়সা রোজগার করবে ঠিক করল। গাঁয়ের ধান শহরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সে যাতে বাধা না দেয় তার জন্য এমনিতেই তার হাতে কিছু কিছু আসত। কো-অপারেটিভ স্টোর্স করেও তার আয় আরও বেড়েছিল। এছাড়া, গ্রামের ‘প্রক্যুরমেণ্টের’ হিসেবপত্র করে কিছু বাঁহাতের কাজ করেছিল। এত দিক থেকে পয়সা এলেও বুড়োর ঠিক মন ভরে না। যা রোজগার হচ্ছে তা কিভাবে রাখতে হয় সেই কৌশল বউমা জানত না। বউ একেবারেই জানত না। তাদের মত অন্য পরিবারে যেখানে মাসে দু'সের তেল লাগে এই পরিবারে লাগে পাঁচ সের। এ নিয়ে অনেকবার বকাবকি করেছে সে। কিন্তু বুড়োর কথা কেউ কানে তুলল না। যতই রোজগার হোক ঠিক যেন ওদের মন ভরে না।

পুল্লাইয়াকে কিছু ধান তার কাছে পাচার করতে বলেছিল। পুল্লাইয়া বলল, “তাতে আমার কি লাভ ?” ব্যাপারটা নীলি জানত না। সেবছর এপ্রিল, মে মাসে খুব জোর ‘প্রক্যুরমেণ্ট’ হবার কথা। এজেণ্টরা ঘোরাঘুরি করছিল। কণ্ট্রোল দরে এক গরিসে ধান তিনশ টাকা। আবার সেই এজেণ্ট রাত্রে কালোবাজারে কেনে সাতশ টাকা করে এক গরিসে। এই ডামাডোলের বাজারে সরকারী কর্তাদের বেশ দু'পয়সা হচ্ছিল। এতদিন খুচরো পয়সা ওদের হাতে পড়ত। এখন নোটের তাড়া পকেটে ঢুকছে। গোমস্তার কারসাজিতে কেউ ডুবছে কেউ ভাসছে। এছাড়া ওজনের হেরফের আছে। যারা গরীব, যারা ঘুষ দিতে পারছে না তাদের সবটাই প্রক্যুরমেণ্টের নামে কেড়ে নিচ্ছে। মোড়লের ঘরে দশ গরিসে থাকলে লেখা হচ্ছে এক গরিসে। এইভাবে সরকারী খাতা তৈরি হচ্ছিল। সেই খাতা ধরে ধরে পুলিশের সাহায্যে অফিসাররা এসে ধান আদায় করছিল। ওদের সঙ্গে ছোট ছোট চাষী কথা বলতেই পারছিল না। কথা বলার অবশ্য কিছুই ছিল না। মোড়ল, মহাজনরা সব সময় সরকারী আমলাদের সঙ্গে থাকত। ফলে সাধারণ লোকের কথায় কোন কাজও হত না।

পুল্লাইয়ার পালা এল। পনেরো পুট্‌লু (তিরিশ মণ) ধান আমলারা তার কাছে চাইল। সে বলল, “আমার গোলায় দশ পুট্‌লু (কুড়ি মণ) ধানও নেই। সারা বছর

পরিবারের সবাইকে খেতে হবে। এছাড়া পূজোপার্বন আছে। চাষের সময় বীজ ধান দরকার। যারা কাজ করবে তাদের খাওয়াতে হবে। এছাড়া ধার শোধ বাবদ···”

“ওসব শুনতে চাই না। যা খাতায় লেখা আছে তাই চাই।” বলে মোড়ল আর গোমস্তা বাড়ি ফিরে গেল। পুল্লাইয়া হাতে লাঠি তুলে নিয়ে বলল, “আমার ধানে কে হাত দেয় দেখব!” পুল্লাইয়া হাতে লাঠি তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঝট্ করে পেছিয়ে গেল। সেই সময় নীলি বাড়িতে ছিল না। তার আসার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি তাকে যা ঘটেছে জানাল। তৎক্ষণাৎ সে গোমস্তার বাড়িতে ছুটে গেল। গোমস্তা তখন পাড়ার কিশোর নেতাদের সঙ্গে তাস খেলায় মগ্ন ছিল। নীলি এই বিপদ থেকে তার স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করল। সে শুনেও না শোনার ভান করে যাহোক কিছু বলার মত বলল, “আরে ও সবের আমি আর কি করব? তোমার একার বুদ্ধি থাকলে কি হবে, তোমার কর্তার তো সে বুদ্ধি নেই। যা দেখছি ভদ্রভাবে বাঁচা যাবে না।”

নীলি যত কথাই বলুক না কেন গোমস্তা তাস খেলতে খেলতে অবহেলার সঙ্গে বলল, “যাও, যাও, একেবারে বাড়িতে ছুটে এসেছে?” নীলি মাথা নীচু করে বাড়ি ফিরে এল। ভয়ে তার বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল। পুল্লাইয়ার বুকে কোন ভয় নেই। “আরে, তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? ওরা আর আমার গোলায় হাত দিতে আসবে?”

বলতে বলতে সে ছেলের সঙ্গে ডিগবাজি খেতে লাগল। নীলি গালে হাত দিয়ে ঐভাবে বসে পড়ল। গোঁফে তা দিয়ে পুল্লাইয়া বলল, “এবার গোলায় হাত দিতে এলে আমার দরকার হবে না। আমার এই মল্লুই একা ওদের হটিয়ে দেবে।” বলে হো হো করে হেসে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এই ঘটনার চারদিনের দিন ওদের পাড়ায় পুলিশ এল। এফ. এস. ও., টি. এস. ও. প্রমুখ পুলিশের সঙ্গে ছিল। ছোট ছোট চাষীরাও ধান মেপে দিতে বাধ্য হল। ধান মেপে দেওয়ার সময় চাষীদের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। আবার কোন কোন চাষী সরকারী কাগজে ভুল লেখা আছে বলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পুল্লাইয়া হাতে লাঠি নিয়ে গোঁফে তা দিতে দিতে গোলার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বুড়ি খিড়কির দরজায় ঘুঁটে দিচ্ছিল। মল্লু দোলনায় ঘুমোচ্ছিল। নীলি পাতা কুড়োতে বনে গিয়েছিল। এমন সময় টি. এস. ও. সদলবলে পুল্লাইয়ার বাড়ির সামনে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, “তোমার নাম পুল্লাইয়া?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“সরকারী কাগজে যা লেখা আছে সেই অনুসারে তুমি পনের পুট্লু ধান মেপে দেবে, না জেলে যাবে?”

“চোখ রাঙিয়ে কথা বলছেন কেন?”

"কি বলতে চাইছ ?"

"মাপবো না।"

"তুমি না মেপে দিলে আমরাই মেপে নেবো। মেপে যত টাকা প্রাপ্য হয় তোমার মুখের উপর ছুঁড়ে দেবো।" বলে এক পা এগোতেই পুল্লাইয়ার সারা শরীরটা রাগে জ্বলে উঠল। সে লাঠিটা শক্ত হাতে ধরে বলল, "ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। আমার ধানে হাত দিলে আপনাদের পিঠ ফেটে যাবে। দশ গরিসে ধান যার হয় সে যত দেবে আমাকেও কি তত দিতে হবে ? আমার কি দশ গরিসে ধান হয়েছে যে অত ধান দেব ? সরকারী কাগজে আবোল-তাবোল লিখে আমাদের পেটে মারার তাল করা হচ্ছে ?" বলে পুল্লাইয়া ওদের সামনে লাঠি নিয়ে দাঁড়াল।

"ভাষণ বন্ধ কর। সরে যাও।" বলে টি.এস.ও. এগোতে গেলেই তাকে বাধা দিয়ে পুল্লাইয়া কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তক্ষুণি পুলিশের দিকে তাকিয়ে ঐ অফিসারটি ইশারা করল। তারপর গোলায় পা রাখতেই পুল্লাইয়া গর্জে উঠল, "ধানে হাত দেবে না ?" তা সত্ত্বেও হাসিমুখে ঐ অফিসার গোলায় ঢুকতে গেলে পুল্লাইয়া ঝট্ করে তার কাছে গিয়ে তাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

নীচে পড়ে ঐ অফিসারটির চোখ উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। চিৎকার করে বলল, "ওকে ধর, ওর হাতে হাতকড়া পরাও।" সেই মুহূর্তে পুল্লাইয়ার পেট জ্বলছিল, বুক জ্বলছিল, চোখেও ছিল আগুন। সে কাকে কি বলছে, কাকে কি করছে তা সে নিজেই জানে না। তার হাত পা ছোঁড়া, কথা বলা সব কিছুর মধ্যে ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে উঠেছিল। ঠিক সেই সময় নীলি ছুটতে ছুটতে সেখানে এল। এসে স্বামীর সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে সেও ঘাবড়ে গেল। দোলনায় মল্লু চিৎকার করে কাঁদছিল। বুড়ি সেদিকে তাকায়নি। পুল্লাইয়া বন্‌বন্ করে লাঠি ঘোরাচ্ছিল। ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপ তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। চার চারটে পুলিশ লাঠি হাতে তার দিকে এগোতে পারছিল না। ওরাও পুল্লাইয়ার উপর লাঠি চালাচ্ছিল। কিন্তু ওদের লাঠি পুল্লাইয়ার গায়ে পড়ছিল না। গোটা গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়েছিল সেখানে।

নীলি হাঁ করে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে মাথার ঝুড়িটা নীচে নামাল। ঝট্ করে স্বামীর পা ধরে কি যে বলছিল তা কেউ শুনতে পেল না। পুল্লাইয়ার গা দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছিল। সেই ঘাম ঝরে পড়ছিল নীলির গায়ে আর পড়ছিল মাটির বুকে। এতক্ষণে সে চারদিকের লোককে দেখতে পেল। পায়ের কাছে যে তার বউ আসছে এখন সে তা লক্ষ্য করল। লক্ষ্য করে এখন সে নিজের পা ছোঁড়া বন্ধ করে দিল। তখন নীলির দিকে তাকিয়ে তার মনে হল সে কি একটা ভুল করে ফেলেছে। ঠিক সেই সময় তার কানে গেল ছেলের কান্না। সে যেন এতক্ষণ এই জগতে ছিল না। আহত পুলিশগুলো এতক্ষণে তার দিকে এগিয়ে এল। ওদের দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়ার মনে দয়ার ভাব জাগল। ভাবল, এসব রোগা পটকা লোকের উপরে এতক্ষণ লাঠি চালালাম।

ঝট্ করে ছেলের দিকে ছুটে যেতেই পুলিশ তাকে ধরতে গেল। এক ঝটকায় পুলিশকে ফেলে দিয়ে দোলনা থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে আদর করতে করতে বলল, "মল্লু, তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ? তোকেই তো ধান পাহারার জন্যে এতক্ষণ রাখলে পারতাম। এইসব গোঁফহীন রোগা পটকা লোকের সঙ্গে তোর বাবাকে লড়তে হয়েছে। আমি কি গোঁফ রেখেছি এদের সঙ্গে লড়তে?"

বাপের কথা শুনতে শুনতে মল্লু তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন তার কথার অর্থ সে বুঝতে পেরেছে। বাপের কথা শুনতে শুনতে ছেলের সে কি হাসি! কিন্তু পরমুহূর্তেই কান্নার রোল পড়ে গেল। পুল্লাইয়ার হাতে হাতকড়া পড়ল। মাকে কাঁদতে দেখে মল্লুও কাঁদল। বুড়ি চোখ মুছতে লাগল। এত লোকের এত কিছু হচ্ছে যেন পুল্লাইয়ার কিছু করার নেই। হাতকড়া পরা অবস্থায় সে নীলির দিকে তাকাল। জল ভর্তি চোখে নীলি পুল্লাইয়ার দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারল না। মুখটা ঝট্ করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। পুল্লাইয়ার মনে হল সে কি একটা ভুল করেছে। কড়া পরা অবস্থায় পথের মাঝখান দিয়ে পুলিশ তাকে নিয়ে গেল। এই গোটা নাটকের যে নাটের গুরু সেই রাজু বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখে মনে মনে উপভোগ করছিল।

সতের

পিসা ও রামু ছুটে গেল শহরে। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে পরের দিন জামীনে আনতে যাবার কথা বলে দিল। উকিল লাগাতে হবে। ঘরে টাকাকড়ি নেই, নীলি ভাবছে, কার কাছে ধার নেওয়া যায়। এমন সময় রাজুর বউ এসে দু'চারটে সুখ দুঃখের কথা বলে না চাইতেই নীলির হাতে পঞ্চাশটি টাকা গুঁজে দিল। নীলি কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু করে নিল।

পরের দিন সকাল দশটায় আবার আগের দিনের মতই পুলিশ সদলবলে এল। ওদের দেখেই নীলি বেরিয়ে এল। আগের দিন যে অফিসার পুল্লাইয়ার হাতে হাতকড়া পরিয়েছিল সে-ই নীলিকে বলল, "ধান মেপে দিতে হবে যে মা।"

নীলি কোন কথা না বলে গোলার চাবি এনে দরজা খুলল। তারপর ঐ লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে নীলি বলল, "বাবু, ধান যা থাকার এতেই আছে। এছাড়া একটি দানাও অন্য কোথাও নেই। এর থেকেই বোনার ধান বের করতে হবে, সোম-বছর সবাইকে খেতে হবে। এখন আপনার দয়া। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের বাঁচাতে পারেন। নাহলে আমাদের না খেতে পেয়ে মরতে হবে। সুবিচারের ভার আপনার উপরেই রইল বাবু।"

অফিসারটি নীলির কথা শুনে কেমন যেন দমে গেল। তার মন গলে গেল। গোলার ভেতরটা উঁকি মেরে দেখে নীলির কাছে এসে বলল, "শহরে যারা আছে ওরাও তো তোমাদের মত মানুষ মা। তোমরা খাবে, ওরা খাবে না? চাষীরা ওদের মুখে ভাত যদি তুলে না দেয় তাহলে ওরা যে না খেতে পেয়ে মারা যাবে মা।"

"ঠিক কথাই বলেছেন বাবু। চারজনে বাঁচলে জগৎ বাঁচবে।"

"আমিও তো বুঝি। আমিও তো মানুষ নাকি? আমি কি তোমাদের কষ্ট বুঝি না? প্রক্যুরমেণ্টের জন্যে অন্তত এক পুটি (দু'মণ) ধান তো দেবে মা?"

নীলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। সে বলল, "এক পুটি কেন বাবা। দুই পুট্‌লু (চার মণ) নিন বাবা।"

অফিসার খুব খুশী হয়ে এজেণ্টকে এক পুটি ধান নিয়ে টাকা গুণে দিতে বলে অন্য বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ভর দুপুরে শহর থেকে হাঁটতে হাঁটতে এল পুল্লাইয়া, পিসা ও রামু। জামীনে ছাড়া পেয়ে পাড়ার ভেতর দিয়ে আসতে পুল্লাইয়ার ভীষণ লজ্জা করছিল। আঁকা বাঁকা পথে এসে সে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল। দু'দিন ধরে ছেলে একটানা কাঁদছিল বাপের জন্যে। বাপকে দেখে খুশীতে চেঁচিয়ে দুহাত বাড়িয়ে তার কোলে উঠে গেল। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে পুল্লাইয়া বলল, "হায়রে মল্লু, তোর এ কি দশা হয়েছে? তুই যে একদিনে একেবারে ঝাঁটার কাঠি হয়ে গেলি!"

পিসা হাসতে হাসতে বলল, "ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে তুমিও তো ঝাঁটার কাঠি হয়ে গেছ।"

এই মান অভিমানের পালা যতক্ষণ চলছিল নীলি একটি কথাও বলল না। ভাত খাওয়ার সময় নীলি সামনেই ছিল। কিন্তু পুল্লাইয়া তার দিকে তাকাতে পারছিল না। মনে মনে গ্রামের মাতব্বর আর সরকারী অফিসারদের উপর তার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ছেলে তার সঙ্গেই খেতে বসেছিল। নীলি তখনও কোন কথা না বলে ঠায় তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বুড়ি বারান্দায় বসে কাঠের চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। গোশালের বলদগুলো সেখান থেকেই যেন পুল্লাইয়ার দিকে তাকাচ্ছিল। ভাত খাওয়ার পর নীলি আম্বালি (অন্ধ্রে সরষের মত দেখতে এক ধরণের ফসল হয়—নাম চোল্লু। ওটা গুঁড়ো করে সেদ্ধ করে গরীব লোকেরা খায়। এই খাদ্যের নাম আম্বালি।) খেতে দিল। মল্লু খেতে গেলে নাকের উপর তর্জনী রেখে পুল্লাইয়া তাকে বারণ করল। ছেলে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। পুল্লাইয়া হেসে ছেলেকে কাছে টেনে নিল।

ইতিমধ্যে পুল্লাইয়ার আসার খবর সারা পাড়ায় চাউর হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই বাড়িতে এসে খবর নিয়ে গেল। ওদের চলে যাওয়ার পর ঘরে পায়চারি করতে করতে

আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল পুল্লাইয়া। মনে মনে ঠিক করল, "আমাকে যারা এই দশায় ফেলেছে তাদের একটিকেও আমি রেহাই দেব না। দেখব ব্যাটারা কিভাবে আবার আমার কাছে ধান নিতে আসে।" নিজের অজান্তেই সে কথাগুলো জোরে জোরে বলতে লাগল। এসব কথাবার্তা শুনে বুড়ি বলল, "অমন করছ কেন বাবা? যাদের গাল দিচ্ছ ওরাও তো মানুষ। মানুষের কি ভালোমন্দ থাকে না?" আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল পুল্লাইয়া "চুপ কর" বলাতে সে আর মুখ নাড়ল না। নীলি চুপ করে রইল। স্বামীর রাগ যতক্ষণ না পড়ে ততক্ষণ একটি কথাও সে বলল না। বারান্দায় যেতে গিয়ে ঝট্ করে কি যেন মনে পড়াতে খিড়কির দিকে গেল। আশ-পাশের সমস্ত গ্রামের লোক তার লাঠি ঘোরানো দেখে বাহবা দেয় পুল্লাইয়াকে। এতো আদর্শবান মল্লনাইডুর ছেলে সে। তাকে যে গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেছে তা চারদিকে প্রচার হয়ে গেছে। নামকরা লোকের ছেলে যে একরাত হাজতে ছিল সেটাও লোকে জেনে গেছে। এই ধরণের ঘটনা যে ঘটবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে পুল্লাইয়া বলল, "এটা ন্যায়ের যুগ নয়।" চরকা কাটতে কাটতে নীলি তার কথাগুলো শুনে বলল, "যুগের দোষ দিচ্ছ কেন?"

"দেবো না কেন? এই যুগে অন্যায় ঘটলে এই যুগকে দোষ দেব না?"

"যুগকে দোষ দিলে, আমরা কোন্ যুগের সে খেয়াল আছে? যে তুলো উড়ে তার আয়ু কতক্ষণ? ফুল গাছে থাকলেই তার সৌন্দর্য।"

"কি বলতে চাও?" পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করল। মল্লু এপাশ থেকে ওপাশে উ-উ করে ছোটাছুটি করছিল।

"তোমার রাগ, তোমার এই রাগের জন্যই এত ঝামেলা হচ্ছে।"

পুল্লাইয়া আর কোন কথা না বলে গোঁফটা পাকিয়ে ঠিক করে নিল। নীলি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার চরকা কাটতে লাগল। "তুমি যে বাবুকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে সেই বাবুকেই আমি দু'পুটলু ধান নিয়ে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু উনি মাত্র একটাই নিয়েছিলেন। যে রাজুকে তুমি যা-তা কথা শুনিয়েছিলে সেই রাজুর বউ আমার হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিয়েছিল। বলতে গেলে সেই তোমাকে হাজত থেকে বাড়ি আনিয়েছে। তুমি একজনকে যদি ভালো না বল সে তোমাকে ভালো বলবে কেন।"

পুল্লাইয়া বউয়ের দিকে তাকাল। আর কোন কথা বলে কিনা শোনার জন্য কিছু-ক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু সে আর কোন কথা বলল না। কিন্তু স্বামী যা করেছে তাতে যে সে সন্তুষ্ট নয় তা তার মুখে ফুটে উঠেছিল।

পুল্লাইয়া দু'দিন ঘর থেকে নড়ল না। খবর নিতে যারা আসার তারা এসেছিল। পুল্লাইয়া নীলির সঙ্গেও ভালো করে কথা বলল না। ওর যা কিছু কথা সব ঐ ছেলের

সঙ্গে হচ্ছিল। ছেলেটাও বাপকে এক মুহূর্ত ছাড়েনি।

এই কেসের তারিখ পড়তে লাগল বিভিন্ন দিনে। উকিলের খরচখরচা আছে। যতবার শহরে আসতে হয়েছে ততবার তাকে খরচ করতে হয়েছে। বিক্রি করার জন্য ধান ছাড়া ঘরে কিছুই ছিল না। যা আছে তা বিক্রি করে দিলে অনেক বেশী দাম দিয়ে দুদিন পরে কিনতে হবে। কিভাবে যে ধার করা যায় সেই হল ভাবনা। শুধু মুখের কথায় ধার দেওয়ার লোক কেউ নেই। সুদে টাকা নিতে হবে। চিরকুটে লিখে দিতে হবে। সরকারী ঘোষণা অনুসারে যত সুদ হওয়া উচিত তত সুদ কাগজে লিখতে হবে। তবে সেটা কাগজে পত্রেই থাকে। সেই হিসেব অনুসারে একশ টাকার এক মাসের সুদ আট আনা। কিন্তু কার্যত একশ টাকার জন্য এক বছরে তিন পুট্‌লু (ছ মণ) ধান দিতে হয়। এই রেট শুধু গ্রামের ব্যবসাদার পেরাইয়াই নয়, মোড়ল, মহাজনরাও ধার দিতে রাজী থাকে। পুল্লাইয়ার মতে এত সুদ বেশী নেওয়া অন্যায়। দেওয়াও অন্যায়। তাই সে নেয় না। কিন্তু না গিয়ে আর উপায় ছিল না। নিজের জমি বন্ধক রেখে রাজুর বউয়ের কাছে টাকা ধার করে আনতে হয়েছে। তার বউ নীলির অনুরোধে দু' পুট্‌লু ধান সুদ হিসাবে নিতে রাজী হয়েছে।

বারে বারে তারিখ ফেলে বর্ষাকালে বিচার হল। এই পাঁচমাসে দু'শ টাকার মত খরচ হয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট একশ টাকা জরিমানা করল। অনাদায়ে দু'মাস জেল খাটতে হবে। সেদিন কোর্টে নবিরি গ্রামের লোক প্রায় তিরিশজন ছিল। পুল্লাইয়ার ক্ষোভে, অভিমানে পৌরুষ চাগা দিয়ে উঠল। সে বলতে লাগল, "ঐ বিচারকের আসনে যে বসে আছে তার মধ্যে ন্যায় বিচার করার ক্ষমতা নেই। আসলে এই দুনিয়াটাতে সুবিচার নেই আর। সুবিচারের দিন শেষ হয়ে গেছে।"

এমন সময় রাজুর বউ এগিয়ে এসে অম্লমধুর অনেক কথাই নীলিকে শোনাল। নীলি কোন কথা বলল না। ফোকটে দেওয়ার মত তার হাতে একশটি টাকা গুঁজে দিয়ে রাজুর বউ বলল, "একটা চিরকুটের উপর লেখা নিয়ে দিনের পর দিন টাকা দিতে পারা যায় এইভাবে। সব কিছুর একটা সীমা আছে। তোমার কর্তাকে এসব একটু বুঝিয়ে বলো।"

নীলি মাথা নেড়ে রাজী হল। বিপদের সময় একশ টাকা ধার দেওয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানাল। পুল্লাইয়া এবার টানা এক সপ্তাহ বাড়ি থেকে নড়ল না। একমাত্র ছেলের সঙ্গেই তার খেলা আর কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাকে গরু বাছুর নিয়ে ক্ষেতে যেতে হল। যেত বটে, কিন্তু তার একটা অস্বস্তি ছিল। তার সবসময় মনে হত আশপাশের লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ তার দিকে তর্জনী দেখিয়ে বলছে, ঐ হল পুল্লাইয়া। টাকা জরিমানা দিয়েছে। না দিলে জেল খাটতে হত। মাঝে মাঝে সে ছেলেটাকে কাঁধে বসিয়ে নীলাম্মার মন্দিরে যেত।

সেখানে রামু মাঝে মাঝে তার উপর নীলাম্মা ভর করার মত হাঁক ডাক পাড়ত। পুল্লাইয়া ও মল্লু—বাপ ব্যাটাতে মন্দিরের সামনে বসত কিছুক্ষণ। সন্ধ্যের আগে মল্লুকে নিয়ে না ফিরলে বুড়ি পুল্লাইয়ার উপর গজগজ করত। তার ধারণা অন্ধকারে মল্লুর গায়ে 'বাতাস' লাগালে সে রোগা হয়ে যাবে।

এখনও ক্ষেতের ফসল পাকেনি। আরও একমাস না গেলে ক্ষেতের ফসল বাড়িতে তুলে আনা যাবে না। গোলায় একদানা ধানও নেই। চোল্লুও নেই। কারও কাছে ধার চাইতে পুল্লাইয়ার ইচ্ছে করল না। নীলি রাজুর বউয়ের কাছে আবার ধারের জন্য গেল। তখন ওরা টাকায় এক আড্ডা (এক সের) চাল দিচ্ছিল। জিনিসপত্রের দাম তুঙ্গে উঠেছিল। কণ্ট্রোলের চাল দেখতে লাল, পেরেকের মত। খেতেও পেরেকের মত। পশুও সেই চালের ভাত খেতো না। সস্তা বলে কিনে গুঁড়ো করে সেদ্ধ করে খাওয়া যায় না। বাইরে কিনতে গেলে ভালো চাল টাকায় এক আড্ডা। অন্যান্য ফসলের দাম—ডাল নুন তেল অসম্ভব বেড়ে গেছে। যাদের টাকা পয়সা আছে তাদের আরও বাড়ানোর যেন স্বর্ণ সুযোগ এসেছে। যাদের নেই তাদের পথে বসার দিনও এগিয়ে এসেছে। এরকম এক দুঃসময়েও নীলির দানধর্ম করতে ইচ্ছে করে। হাত উপুড় করে সে ভীষণ আনন্দ পায়। কোন জায়গায় যখন একমুঠো ভাত জোটে না তখন গাঁয়ের কুষ্ঠ রোগী, গুড্ডি ভেঙ্কান্না ও গন্নেম্মা নীলির বাড়িতে আসে।

রাজু টাকায় এক সের করে চাল ও দু সের করে চোল্লু ধার দিয়ে গেল। একশ টাকার চাল বা চোল্লু যারা ধার নেবে, ক্ষেতের ফসল উঠলে তাদের শোধ দিতে হবে সাড়ে তিনশ থেকে চারশ টাকার ধান। এই ছিল তার শর্ত। নীচু জমিতে ফসল ভালোই হয়েছিল। চরাই জমিতে অর্ধেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। পুল্লাইয়ার যে ফসল ফলেছিল তার তিনভাগের দু'ভাগ গেল সুদ দিতে। বাকী রইল পাঁচ পুট্‌লু (দশ মণ) ধান। ধোপা নাপিত ইত্যাদিদের দানধর্ম করার পর মহাজনকে দিয়ে থুয়ে ঘরে উঠবে মাত্র দু' পুট্‌লু ধান। এসব কথা ভাববার দরকার নেই বললেও পুল্লাইয়ার মন মানে না। তার মন মেজাজ বিগড়ে থাকে। তার লেঠেল চেলারা বলাবলি করল, "গুরু রোগা হয়ে যাচ্ছে!" ওদেরও বয়স বাড়ছিল। ওরা ভাবত, এই লোকটার আগে প্রত্যেকটা কাজে কত উৎসাহ ছিল। চারপাশের গ্রামে লেঠেল হিসাবে তার কত নাম হয়েছিল। পুল্লাইয়ার খুব আনন্দ হত ছেলের লম্ফঝম্ফ দেখে। মনে হত যেন সে পেট ভরে খেয়ে উঠেছে। সে ভাবত, আমার ছেলে যখন বড় হবে তখন কি ওরা ন্যায় নীতি ধর্ম এসব আবার প্রতিষ্ঠা করবে না? আমার ছেলে কি ইস্কুলে নাম করবে না? চারজনে কি আমার ছেলেকে সোনার চাঁদ ছেলে বলবে না? আমার এই ছেলে থাকতে কিসের অভাব? আপনমনে এসব কথা ভেবে নিজেকে উৎসাহিত করত। ছেলের কথা সগর্বে ভাবতে ভাবতে পাড়ায় যে নতুন টালির ঘর হত সেদিকে সে তাকাতো। ব্যবসাদার পেরাইয়ার ঘর ছিল

তারই ঘরের মত মাটির দেয়াল আর খড়ের চালার। এখন তার হয়েছে ছাদওলা কোঠা বাড়ি। মোড়লদেরও কুঁড়েঘর ছিল। ওদের এখন হয়েছে টালির ঘর। কেউ কেউ খড়ের ছাউনি নতুন করে ছেয়ে নিচ্ছে। আবার কেউ তারই মত যে কুঁড়েঘর সেই কুঁড়েঘরেই আছে। তারই মত অনেকের চালায় নতুন খড় দেওয়ার ক্ষমতা নেই। দিনকে দিন মানুষের কথার দাম থাকছে না। ভালোমন্দ, দোষগুণ, ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, সবকিছুই নির্ভর করছে টাকার উপর। মাঝে মাঝে এই ধরণের কথা সে আপনমনে বলে, "এসব কথা ভাবি বলেই হয়ত আমার চুল পেকে যাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর অভাবের অবস্থা দেখে আজকাল দিন নেই, রাত নেই, বড় নেই, ছোট নেই যেখানে-সেখানে যাকে-তাকে রামু এসবের কারণ জিজ্ঞেস করে। লোকে বলে, "রামু পাগল হয়ে গেছে।"

পিসা মাঝে মধ্যে পুল্লাইয়ার বাড়িতে আসে। মহাজনের ভাগের ধান দেওয়ার পর যা বেঁচেছিল তাও শেষ হয়ে এসেছে। যা আছে তা দিয়ে যে কি করে বাকী দিনগুলো চলবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। মল্লুর সঙ্গে খেলায় মেতে গেলে পুল্লাইয়ার এই অভাবের কথা আর মনে পড়ে না। পিসা দাদুর কাঁধে উঠে মল্লু তার চুল নাক কান সব টানত। টানত আর হাসত।

শিবরাত্রির দিন। গাঁয়ের প্রত্যেকের ঘরে পূজোর আয়োজন চলেছে। সবাই যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী খরচ করে। প্রত্যেক বছরের মত সে বছরও পুল্লাইয়াকে তাপ্পিডিগুল্লু (অন্ধ্রের এ এক অন্য ধরণের বাজনা। করতাল দুহাতে দুটো হাতে নিয়ে, কোমরে, বুকে অনেকগুলো করতাল বেঁধে দুহাতে করতালে তালি বাজাতে বাজাতে মাঝে মাঝে বুকে কোমরেও মেরে করতাল বাজানো হয়।) বেঁধে বাজাতে বাজাতে নাচতে হবে। মল্লুর গায়েও যতক্ষণ না তাপ্পিডিগুল্লু বাঁধা হয়েছে ততক্ষণ সে কেঁদেছে। নিয়ম অনুসারে পুল্লাইয়া উপোস করেই বাজাতে বাজাতে নাচছিল। বেশীক্ষণ নাচতে পারল না, হাঁপিয়ে উঠল। চারদিকে যারা জমেছিল তারা বলল, "হাঁপিয়ে পড়েছ থেমে যাও।" মল্লুও বাপের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়ে কিছুক্ষণ নাচল। লোকে ভেজা মুগডাল আর পাকা কলা এনে দিল পুল্লাইয়াকে। পিসাও নাচে আর বাজনায় যোগ দিল। কিন্তু সেও বেশীক্ষণ নাচতে পারল না। তার পায়ে ব্যথা ধরে গেল। আগের দিন রাত্রে সে শুধু জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। লোকের কাছ থেকে ডাল কলা যা পেয়েছিল তার কিছুটা খেয়ে বাকীটা সে বাড়ি নিয়ে গেল।

ছেলে ছাড়া জগতে আর কোনকিছুরই প্রতি পুল্লাইয়ার টান নেই। নীলি যা খেতে দিত সে খেত। ক্ষেতের কাজ থাকলে করত। বাকী সময়টা মল্লুর সঙ্গে খেলত। মল্লুর বয়স এখন আড়াই বছর হল। এখনই সে বাপের সঙ্গে ক্ষেতখামারে যায়। তার যেন মাকে দরকারই নেই। খাওয়াও বাপের সঙ্গে একপাতে বসেই খায়। মাসকলাই

যা হয়েছিল তার থেকে মহাজনকে দিয়ে, বীজের জন্য রেখে, বাকী যা বেঁচেছিল তা বিক্রি করে দিল পুল্লাইয়া।

একদিন অন্ধকার হয়ে গেলে বুড়ি সকাল সকাল খেয়ে বারান্দায় বসল। নীলিও খাওয়াদাওয়া সেরে তার দিদিমার পাশে বসল। পুল্লাইয়া ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। কি যেন বিড়বিড় করে বলতে বলতে টলতে টলতে রামু ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আসলে তার খুব খিদে পেয়েছিল। মন্দিরে প্রদীপ ধরানোর জন্য যাচ্ছে বটে কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে। তার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছিল হয় সে পাগল নয় মাতাল। পুল্লাইয়ার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রামু ডাক দিল, "ও বাবা পুল্লাইয়া···" বলতে বলতে দাওয়ায় বসে পড়ল।

নীলি বলল, "ও তো পাড়ায় বেড়াতে গেল কাকা।" রামুর কথা শুনে মনে হচ্ছে তার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। তার কথাগুলো কেমন জড়ানো জড়ানো। সে বলছিল, "নীলাম্মা দেবী যদি রেগে যায় তাহলে সমস্ত ভূচক্র ঘরঘর করে ঘুরবে। এদের সবাইকে বাঁচাতে রোজ রোজ প্রদীপ ধরিয়ে·· মায়ের পা ধরে···নীলাম্মা দেবী সব ওলট পালট করে দেবে···"

হাঁপাতে লাগল রামু। আর যেন কোন কথা বলার ক্ষমতা তার নেই। খিদের জ্বালায় তার সমস্ত শরীরে টান ধরেছে। না খেতে পেলে যে মরা বাঁচার সংগ্রাম চলে তা তার ভেতরে চলছে। সে আবার টেনে টেনে বলল, "মা, মাগো, সব মায়া···জীবন মরণ, স্বপ্ন জাগরণ···মা আর ··"

নীলি ঝট্ করে ঘরে ঢুকে লম্ফ নিয়ে বাইরে এসে রামুকে দেখল। তাকে দেখে মনে হল সেখানেই সে পড়ে মরে যাবে। নীলির ভয় করল। চোখ আধবোজা রেখে রামু ইশারায় কি যেন বলল। নীলি ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে এক বাটি ভাত এনে চট্‌পট্ মেখে তাড়াতাড়ি রামুর মুখে পুরতে লাগল। পেটের আগুন নেভার সঙ্গে সঙ্গে রামু চোখ খুলল। দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। বাঁহাত দিয়ে চোখের জল মুছে ডান হাত দিয়ে তাকে খাওয়াতে খাওয়াতে রামুর শরীরের ঐ বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে নীলিরও দুচোখ ছেপে জল এল। সে ঝট্ করে আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছে নিল।

খাওয়ার শেষে রামু জল খেল। বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। অনেকক্ষণ চুপচাপ ঐভাবেই বসে রইল। শেষে উঠে এগিয়ে যেতে গিয়ে থেমে সমস্ত অভিমান কৃতজ্ঞতা মাখা গলায় নীলিকে বলল, "মা, মা নীলাম্মা, কতদিন পরে এই রামুকে দর্শন দিলি মা।" বলতে বলতে আস্তে আস্তে পা ফেলে রামু চলে গেল।

আঠের

রামু চলে যাওয়ার পর পুল্লাইয়া মল্লুকে নিয়ে ফিরল। নীলি তখনও রামু সম্পর্কে ভাবছিল। রামুর বউ অনেকদিন আগেই মারা গেছে। একমাত্র ছেলে সেও পাঁড মাতাল। তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। বউটা হাবাগোবা। টুকটাক যা কিছু ছিল সবই ছেলে শেষ করে দিল। বিশ্বাস করা বা নির্ভর করার মত রামুর ওঁদিকে আর কেউ নেই। নীলি ভাবছিল এই বুড়ো বয়সে রামুর কি দুর্ভোগ।

মল্লু মার সামনে এসে "ঝিনাক্ ঝিনাক্ ঝা" বলে নাচতে লাগল। নীলির ভাবনা-গুলো ছড়িয়ে গেল। সে ছেলেকে দেখে হাসল।

অনেকদিন পরে খেতে বসে পুল্লাইয়া হয়ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। তার পাতে যে পরিমাণ ভাত পড়েছিল তা এক নিমেষে শেষ করে, "ঠিক পেট ভরেনি" এমন ভাব করে তাকাল নীলির দিকে। ছেলে একবার খালি থালার দিকে তাকাল আর একবার মায়ের মুখের দিকে। অন্য দিনে এতক্ষণে তার মা থালায় ভাত ভরে দিত। কিন্তু আজ সে কিছুই করছে না দেখে একবার মার দিকে এবং বাবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ পুল্লাইয়া উঠে পড়ল। পিছু পিছু ছেলেও উঠল।

মল্লুকে খাটিয়ায় শুইয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে পুল্লাইয়া খাটিয়ার পাশে বসে যখন তার পিঠ চাপড়াল তখন মল্লুর ঘুম এল। পুল্লাইয়ার একটা চোখ ছিল বউয়ের দিকে। "এখনও কি তার এত কাজ!" আপনমনে সে বলল।

নীলি রান্নাঘরের কাজ সেরে ঘরে এল। বুড়ি এক কোণে শুয়েছিল। শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে গান গাইছিল। পুল্লাইয়া বলদগুলোর সামনে খড় দিতে গেল। নীলি খিড়কির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার রাত্রি। সারা আকাশ নক্ষত্রে ভরে রয়েছে।

বলদগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খড় চিবোচ্ছিল। পুল্লাইয়া আড়চোখে দেখে নিল বউকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে। তার মনে হল সে হয়ত যা খাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী খেয়ে নিয়েছে। হয়ত নীলির খাওয়ার জন্য কিছুই নেই। মনে সে ব্যথা পেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ধান শেষ হওয়ার কথা। নিজেদের জমি বন্ধক রেখে আরও ধার আনলে এই বছরেই জমি বেহাত্ হয়ে যাবে। এটা বেহাত্ হলে আর তো কিছুই থাকবে না। তারপর···

পুল্লাইয়া নীলির কাছে এসে দাঁড়াল। তার দিকে তাকালে তার মন আনন্দে ভরে যায়। গর্বও হয়। আরও একটি আসছে ভেবে তার প্রতি করুণা জাগল। খাওনি কেন এই প্রশ্নও তাকে করা গেল না। অথচ না করেও স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার কাঁধে হাত রেখে পেছনে দাঁড়াল। নীলি ঘাড় ফিরিয়ে চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। পুল্লাইয়া আলতোভাবে তার গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "কিগো, গোলা যে

খালি হয়ে গেছে!"

"আজকেই হল।"

"আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। দিনকে দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে। সব দিকে কেমন যেন ভয় করছে। সামনের দিনগুলোতে দুমুঠো খেতে পাবো কিনা বুঝতে পারছি না।" পুল্লাইয়া বলল।

নীলি শান্তস্বরে বলল, "শুধু খারাপ দিনের কথা ভাবছ কেন। শরীর যদি ঠিক থাকে অন্যের অধীনে চাকরি করেও পেট ভরে যাবে।"

চাকরি কথাটা পুল্লাইয়ার ভালো লাগল না। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে তার পরিবারের কেউ চাকরি করেনি। তাদের রক্ত পুল্লাইয়ার মধ্যেও আছে। সেই রক্তই তাকে অন্যের গোলামী করতে দিতে চায় না।

"কাল থেকে আবার সেই রাজুই কি আমাদের গতি?"

স্বামীর গলায় নিরাশার সুর বেজে উঠতেই নীলি তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তার বুকে মাথা রেখে নীলি বলল, "দেখ, ধৈর্যই নাকি লক্ষ্মী। মাসকলাই বিক্রি করে যা টাকা পেয়েছি সেই টাকা দিয়ে ধান কিনব। সেটা ঢেকিতে ছেঁটে চাল বিক্রি করে দেবো। খুদ আমরা খাবো, আর তুষ গরুকে খেতে দেবো। আর যদি চাল বাঁচে তাহলে মাঝে মধ্যে আমরাও ভাত রেঁধে খাবো।"

"ধান ভাঙ্গার রেওয়াজ আমাদের পরিবারে নেই।"

"আহা, অমন করছ কেন গো? আমরা কি ভিক্ষে করতে যাচ্ছি? গ্রীষ্মকালে চোল্ল দিয়ে কিছুদিন চলে যাবে। কোমার্তি থেকে ঝিঙের বিচি নিয়ে এস। শবজির বাগানে ঐ বিচিগুলো ছড়াব। যা ঝিঙে হবে হাটে বিক্রি করা যাবে।"

পুল্লাইয়ার কাছে কথাগুলো নতুন ঠেকছিল। এর আগে তার পরিবারে কেউ কোনদিন এসব কথা ভাবেনি, এসব কাজ করেনি। অন্য কোন কথা না বলে তার জবাব এড়িয়ে সে বলল, "আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। মনটা কেন জানি দমে আছে।"

নীলি মাথা তুলে স্বামীর দিকে তাকাল। পুল্লাইয়া বলল, "এই রাজুটা আমাদের জমি গিলে ফেলার জন্য তাক করে বসে আছে। বাচ্চা হয়েছে। ওদের কি দেবো? শালা গোটা দেশটা অন্যায় আর অধর্মে ভরে গেছে। গর্মেণ্ট যদি ওদের জেলে পুরে দিত বেশ হত।

নীলি প্রসঙ্গটা ধরল। "শুধু অন্যের অন্যায়ের দিকে নজর না রেখে নিজেরা কোন অন্যায় করছি কিনা দেখতে হবে তো। টাকা ঘরে এলে আমাদের টাকার প্রতি কি আর লোভ হত না। পোড়া কপাল আমার, তুমি আর কথা পেলে না, ওদের জেলে পোরার কথা ভাবছ? জানো, অন্যের ক্ষতি চাইলে নিজের পাপ হয়। আমি কষ্ট করে বাঁচব বললে কে আমাকে বাধা দিতে আসবে। ওরা আমার কি ক্ষতি করবে?"

"বাধা দেবে না ? ক্ষতি করবে না ?"

"যার পাপ তাকেই খায়। তুমি আমি ইচ্ছে করলে কি আর ওদের খেতে পারব ? হাত-পা ঠিক থাকলে আমরা কি পেট চালাতে পারব না ? ঐ কুষ্ঠ রোগীটার হাত-পা খসে পড়েছে তবুও তো সে বেঁচে আছে। সবাই মানুষ, সবাই বাঁচতে চায়। একটা গাছেরও কি সব ফল সমান হয় ? তুমি মনে কর সব কিছু তোমার হাতে আছে। যা নয় তাই ভাবো বলেই দিনকে দিন তোমার এই দশা হচ্ছে। খালি অন্যের উপর রাগ পুষে রেখে আমাদের কি উপকারটা হচ্ছে শুনি ? মানুষ সবাই ভালো। তোমার জন্য আমার ভালো হবে আমার জন্য তোমার ভালো হবে। সবসময় অন্যের দোষ দেখলে তাদের গুণ দেখব কখন ?"

এতক্ষণ ধরে নীলি আস্তে আস্তে যা বলল তা ধৈর্য ধরে পুল্লাইয়া শুনল। একটি কথাও জবাব দিল না। তার দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই সে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ভরা তারা দেখে বেশ মনোরম লাগছিল তার। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এই মর্ত ভূমির সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। তার মধ্যে যে রাগ দ্বেষ ছিল তা যেন উবে গিয়েছিল। মাথা নাবাতেই লক্ষ্য করল নীলি তার দিকে একদৃষ্টিতে তখনও তাকিয়ে আছে। তার মুখটাকে নিজের বুকে চেপে ধরে সমস্ত ক্ষোভ, অভিমান যেন সে চোখের পাতায় এনে ফেলল।

মল্লুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখল পাশে বাবা নেই। "বাবা" বলে চিৎকার করতে লাগল। গায়ে হাত দিয়ে বাবা না শুলে তার ঘুম হয় না। ঘরে এসে নীলি আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পুল্লাইয়ার চোখে ঘুম এল না। নানা চিন্তায় তার মাথা গজগজ করতে লাগল। এত দুশ্চিন্তা এর আগে তার কোনদিন হয়নি। কোনদিন তার বুক এত ভার হয়ে যায়নি। আজকাল যখন তখন ভাবনাগুলো তার মনে চেপে বসে। যে কোন জিনিস নিয়ে তার ভাবনা হয়। "এই বুড়িটা মাঝে মাঝে হাঁপাচ্ছে। কখন যে থেমে যাবে কে জানে। ওর কিছু হয়ে গেলে 'কাজ' করতে হবে। কাজের পেছনে খরচ আছে। কত খরচ হবে কে জানে। অন্তত জাতভাইদের তো ডেকে খাওয়াতে হবে।" পুল্লাইয়া এসব কথা ভাবতে লাগল।

ছেলে বড় হয়ে ভাত খাওয়ার সময় একটার পর একটা বিপদ জাঁকিয়ে বসছে। ক্ষেতখামারের কাজ গুটিয়ে আসছে। রাজু আগামী বছরের মধ্যে জমিটা গিলে ফেলবে। হাতে থাকবে শুধু ভাগের চাষ। মোড়ল-মহাজনদের কোন কথার ঠিক নেই। আজ বলে এক কথা কাল বলে অন্য কথা। এখন জমির দর বেড়েছে। হঠাৎ যদি বিক্রি করতে চায় তাহলে তো মুশকিল ! না তা বিক্রি করবে কি করে ? বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে তার জমিতে লাঙ্গল চালাচ্ছে। সে যখন বিক্রি করতে চাইবে তখন যদি কেনার মত টাকা থাকত বেশ হত। ঐ ক্ষেতে ধান যা উঠত তা দিয়ে সারা বছর চলে যেত।

শুধু চলাই নয়, নীলি তার থেকে ইচ্ছেমত ভিক্ষে দিতে আর বিলোতেও পারত। কিন্তু টাকা কোথায়? তাছাড়া বিক্রি করবে কি করে? বুকের পাটা চাই। এসব কথা ভেবে নীলির পরামর্শই ভালো লাগল।

সকালে পুল্লাইয়ার ঘুম ভাঙল। মল্লু তখনও ঘুমোচ্ছিল। নীলিকে বলে সে ঝিঙের বিচি আনতে কোমার্তি গ্রামে গেল।

মল্লুর ঘুম ভাঙতেই "বাবা" বলে ডেকে উঠল। বারান্দা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত থপ্‌থপ্‌ করে পা ফেলতে ফেলতে "বাবা বাবা" বলতে বলতে গেল। বাপকে দেখতে না পেয়ে গোশালে তাকে খুঁজল। বুড়ি হাতমুখ ধুচ্ছিল। পিছন দিক দিয়ে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে জিজ্ঞেস করল, "বাবা কোথায়?"

"উফ্‌, ছাড়, ছাড়, বলছি।"

মল্লু ছেড়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ভেংচি কাটল। মাকে আসতে দেখে বলল, "মা, বাবা? বাবা কৈ?"

"কোমার্তি গেছে। একটা কাজ সেরে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। যাও, দিদিমা মুখ ধুয়ে দেবে।"

"আগে বাবা আসুক।" বলে সে ভীষ্ম-পণ ধরে বসে রইল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। কিন্তু তার বাবা এলো না। পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার চোখ পচে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার চোখ ছেপে জল আসছিল। যে কোন মুহূর্তে বাবা বলে চিৎকার করে সে যেন কাঁদতে শুরু করে দেবে। এমন সময় দেখতে পেল তার বাবা আসছে। দেখেই এক দৌড়ে বাপের কাছে গিয়ে কোলে উঠল। বাপ কোলে তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দুঃখ, কান্না, অভিমান উবে গেল। ছেলেকে কোলে নিয়ে পুল্লাইয়া বারান্দায় পা রাখতেই বুড়ি বলল, "ছেলেটি কি মার না বাপের?"

মল্লু বাপের কোলে লাফাতে লাফাতে হাসতে হাসতে বলল, "বাবা, বাবা।"

সেদিন পুল্লাইয়া ধান কিনেছিল। সারা গাঁয়ের লোক জেনে গেছে পুল্লাইয়া এবার থেকে চাল বিক্রি করবে। এত লোকে জেনে ফেলায় তার খুব লজ্জা করল। হপ্তা-খানেকের মধ্যেই নীলির কথামত লাভ হল। পুল্লাইয়া ধান ভানে আর নীলি ধান ঝাড়ে। এইভাবে দিনের পর দিন কাটল। গ্রীষ্মকাল এল। দাওয়ায়, বারান্দায় পায়ের ছাপ সকালে নজরে পড়ল। মোড়লরা পাড়ায় চোর ঢুকছে বলত। কিন্তু চোর ধরার ব্যবস্থা ওরা কেউ কোনদিন করেনি।

নীলি আর মল্লু যে ঝিঙের বিচি ছড়িয়েছিল সেগুলোর গাছ হয়ে দেখা দিল। এক একটা গাছে ছোট ছোট ঝিঙে হয়েছে। এখন পুল্লাইয়ার হাতে অনেক কাজ। আজে-বাজে কথা ভাববার তার সময় নেই। নীলি অন্যের চোল্লু আর শবজির বাগান দেখা-শোনা করার ঠিকে কাজ নিল। সেটা পুল্লাইয়ার পছন্দ হল না। চারজনে চাররকম কথা বলবে বলে পুল্লাইয়া নীলিকে বারণ করল। কিন্তু নীলি বলল, "আমি তো কারও

বাড়িতে চুরি করতে যাচ্ছি না, ইজ্জৎ বিক্রি করতেও যাচ্ছি না। গায়েগতরে খাটতে যাচ্ছি। বদনাম হবে কেন?"

এতদিন ধারের জন্য রাজুর কাছে যাওয়ার দরকার হয়নি। এখন দরকার হয়ে পড়েছে। টাকা পয়সা না থাকলে লাঙ্গল দেওয়া, বীজ ছড়ানো এসব কাজের সময় যে খরচ হবে তা আসবে কোত্থেকে?

মল্লুর তিনবছর হল। মালকোচা দিয়ে সে ছোট কাপড় পরছে। হাতে একটা ছোট্ট লাঠি ধরেছে। ছোট্ট নাকে সোনার রিং পরেছে। গলায় রুপোর মালা উঠেছে। সে বাপের সঙ্গে ক্ষেতে যায়। মাঝে মাঝে কোদাল খুরপি হাতে করে নাড়াচাড়া করে। কাজ করতে করতে অন্যেরা গান ধরলে ওদের সঙ্গে গায়। মাঝে মাঝে রাস্তায় কোদাল ফেলে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে, "আগে পয়সা দাও তারপর যাও।" বলদগুলোকে "হৈ-হৈ, ট্র-ট্র" বলে এদিক ওদিক চলে গেলে লাঠি নিয়ে তাড়া করে বলদগুলোকে ঠিক জায়গায় আনে। মাঝে মাঝে বাপের হাত ধরে তেঁতুলগাছের ছায়ায় নিয়ে যায়। সেখানে বাপকে ডাম্বেল ভাঁজতে বলে। বাপকে ডাম্বেল ঘোরাতে বলে সেও খালি হাত ঘোরায়। পুল্লাইয়া খুশী হয়ে মল্লুকে তুলে নিয়ে ডান হাতের তালুতে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম মল্লু ভয় পেয়েছিল। ক্রমশ মল্লুর সেই ভয় কেটে যায়। জানুতে থাবড়ে কুস্তি করতে পুল্লাইয়া ডাকলে মল্লুও জানুতে হাত দিয়ে আওয়াজ করে বাপের দিকে এগিয়ে আসে।

কাজকর্ম শেষ। আবার অখণ্ড অবকাশ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, থামছে। নদীর জল বইছে।

এইসময় নদীর জলে কাঠকুটো ভেসে আসে। ভাসতে ভাসতে তীরে থেকে যায়। অনেক সময় পরক্ষণেই আর এক ঢেউ এসে ঐ কাঠকুটো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেকেই তীরে গিয়ে এই কাঠ কুড়োয়। কেউ কেউ মোটাসোটা সোলা দিয়ে ভেলা বানিয়ে নদীতে ভাসিয়ে ভাসমান কাঠকুটো কুড়োয়। অন্যদের মত নদীর তীরে নীলিও দাঁড়ায়। পুল্লাইয়া ভেলায় চেপে কাঠকুটো ধরে তীরে ছুঁড়ে ফেলে। নীলি সেগুলো কুড়িয়ে রাখতে থাকে। সঙ্গে মল্লুও ভেলায় যেতে চায়। একবার যেতে চাইলে না বলবার উপায় নেই। তীরে মল্লুর চলাফেরা, কাঠকুড়ানো দেখে লোকে অবাক হয়ে যায়।

ধানের দর আরও বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য জিনিষের দামও বেড়ে যেতে লাগল। এক গরিসে (ষাট মণ) ধানের দাম তেরশ পর্যন্ত উঠল। অর্থাৎ টাকায় তিনপো চাল। পুল্লাইয়া একাই একটাকার চাল একবেলায় খেতে পারে। কিন্তু সেই চাল দিয়ে বাড়ির সকলের দুবেলা চালাতে হয়।

পিসা রোজ একবার করে এসে নাতিকে দেখে যেত। কিন্তু আজ চারদিন হল সে আসেনি। পাঁচদিনের দিন সন্ধ্যার সময় সে এলে মল্লু "দাদু দাদু" বলে তার দিকে এগিয়ে গেল। মল্লুকে কাঁধে বসিয়ে ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল পিসা।

খুশীতে মল্লুর সে কি হাসি !

"তোর জ্বালায় কেউ কোন কাজ করতে পারবে না।" বলতে বলতে পুল্লাইয়া মল্লুকে পিসার কাঁধ থেকে নামাল। নীলি সেখানে এল। নীলিকে মাঝে রেখে পিসা বলল, "দেখ মা, যতই হোক জমিটা মহাজনের। সবকিছুর দাম বেড়েই চলেছে। এই জমিটা বিক্রি না করলে মহাজনের মেয়ের বিয়ে হবে না। এরকম একটা কাজে আমরা কি বাধা দিতে পারি ?"

পুল্লাইয়া বলল, "তোমার বাপের আমল থেকে যে জমিতে লাঙ্গল চালাচ্ছ সেটা তোমার না মহাজনের ? আমার মহাজনকে বল না আমার জমিতে একবার পা রাখতে। জমি কি ওদের বাপ-ঠাকুর্দার রোজগারের টাকায় কেনা হয়েছে ?"

নীলি হাসতে হাসতে বলল, "আবার একশ টাকার ধাক্কা···"

পুল্লাইয়ার আত্মসম্মানে যেন বাধল। সে বলল, "দেখবে এবার আর আমি ভেজা বেড়ালের মত গুটিয়ে থাকব না।" বলে গোঁফে তা দিতে লাগল। পিসা নীলিকে শুনিয়ে বলল, "ওরা আমাদের কাছে বিক্রি করতে চাইলেও আমাদের তো আর কেনার ক্ষমতা নেই মা ! আমি কি বলি জানো মা, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। জমির মালিক আমাদের বিশ্বাস করে জমি দিয়েছে। এখন তার টাকার দরকার পড়েছে, বিক্রি করতে চাইছে। আমরা কি তাকে বাধা দিতে পারি মা ? সেটা কি আমাদের ধর্ম হবে ? আমি যা ভালো বুঝছি তাই বলেছি।"

পিসা নীলির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল তার কথার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নীলির মনে। সে আবার শুরু করল, "গাঁয়ে দিনকে দিন চুরি বেড়েই যাচ্ছে। আমার ছেলেমেয়ে বেশী। তাই কিছু কিছু ছেলে ছোকরাদের ধারণা যে সংসার চালাতে না পেরে আমিই নাকি এসব করছি। পেছনে যে যাই বলুক মা আমি তো আমাকে চিনি। আমার ছেলেমেয়ে অনেক বেশী এটা ঠিক, তবে আমার ছেলেগুলোও একদিন বড় হবে, আমাদের সরকার কি আর ওদের চাকরির ব্যবস্থা করবে না ? এখন না হয় খারাপ দিন পড়েছে কিন্তু সুদিন তো আসবেই।"

সুদিনের প্রতীক্ষারত পিসা অনেকক্ষণ মল্লুর সঙ্গে খেলা করে বাড়ি ফিরে গেল।

উনিশ

নীলির মেয়ে হল। ছেলে হওয়ার সময় যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল তা এখন নেই। দিন বদলে গেছে। অবস্থার হেরফের হয়েছে। "কি সুন্দর মেয়ে হয়েছে।" যে দেখল সেই বলল। পুল্লাইয়া শুধু একটিবার নিরীক্ষণ করল মেয়েকে। বিড়বিড় করে বলল, "এর জন্য একটা ভালো পাত্রের সন্ধান করতে হবে।" সবচেয়ে খুশী হল বুড়ি। "বাড়ির

নাম হোক, বদনাম হোক, হয় মেয়ের জন্যে। 'অমুকের মেয়ে গরীবের দুঃখ কষ্ট বোঝে,' বললে তার বাবা-মার কত আনন্দ হয়।" বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে বলল। কেউ কেউ মেয়ে দেখতে এসে মল্লুকে বলল, "একে আমরা নিয়ে যাবো।" তারপর থেকে মল্লু দোরগোড়ায় লাঠি হাতে বসতে লাগল।

এখনও ধান কাটা শুরু হয়নি। গাঁয়ের দুরবস্থা চরমে উঠেছে। প্রত্যেক রাত্রে চুরি হচ্ছে। কিন্তু চোর ধরা পড়ছে না। বাগানে কলাটা মুলোটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। এক বাড়ির পান্তাভাতের হাঁড়ি চুরি হয়ে গেছে। আর এক বাড়ির সামনের গোলা থেকে অর্ধেক মাসকলাই চুরি হয়ে গেছে। চুরির সময় একটুও সাড়া-শব্দ হয়নি। কেউ টেরও পায়নি। কত বাড়ি থেকে যে পোষা হাঁস-মুরগী চুরি হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেকে বলাবলি করল, "এত যে চুরি হচ্ছে কৈ মোড়ল তো প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করছে না।" মোড়লের বউ তিনজনকে পাহারা দিতে বলল। দুজন মাথা নেড়ে রাজী হল। তৃতীয়জন মালারামু রাজী হল না। লোকটা যেমন লম্বা তেমনি মোটা। যেসব বাচ্চারা খেতে চায় না তাদের তার নাম করে খাওয়ানো হয়। তার নাম শুনলেই বাচ্চারা ভীষণ ভয় পায়। তার যা বলার সে মুখের উপর বলে দেয়। তা সে তসিলদার হোক অথবা মোড়লই হোক। কাউকেই সে ভয় পায় না। পাড়ার এক প্রান্তে সে হাঁক পাড়লে অন্য প্রান্তের লোক শুনতে পায়। তার ছেলে চাষ-আবাদের কাজ দেখে। নাতি ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করছে। রামু কারও কাছে এক পয়সা চায় না। তার কাছ থেকে কেউ কিছু চাইলে, থাকলে "না" বলে না, দিয়ে দেয়। এরজন্য তার বউ ছেলে এক হয়ে তাকে অনেক কথা বলে। ওদের কথা শুনে সে হো হো করে হাসে।

"চোরকে ধরে কি করতে বলছ মা?" রামু জিজ্ঞেস করল।

"টানতে টানতে নিয়ে এসো। পঞ্চায়েতে বিচার হবে।" মোড়ল গিন্নী বলল।

"বিচার হবে? চাবুক খাওয়াবে? জানো মা, পেটে যতক্ষণ দানাপানি থাকে ততক্ষণ সব ভালো। আইন কানুন মেনে চলতে ইচ্ছে করে। পেট জ্বললে কিছুই মনে থাকে না মা। পেটে একটু ফ্যান ঢোকানোর জন্য যদি কেউ চুরি করে তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।" রামু কথাগুলো দৃঢ়তার সঙ্গে বলল। এই ধরণের কথা বলেও সে রাত্রে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তার গোপন উদ্দেশ্য ছিল, যদি কেউ অন্য দুজনের হাতে ধরা পড়ে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া।

হপ্তাখানেক ওরা ঘুরল। চুরি কমে গেল। বাড়িতে চুরি বন্ধ হল কিন্তু বাগানে আর ক্ষেতের চুরি বেড়ে গেল। এইভাবে আরও একমাস কেটে গেল। চাষীরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে ক্ষেতের দিকে। কবে ধান কাটা হবে। গুড্ডি ভেঙ্কান্না ও গন্নেম্মার দুরবস্থা চোখে দেখা যায় না। ভেঙ্কান্নার ইচ্ছা নয় নীলির কাছে যাওয়া।

একবার তার দরজায় দাঁড়ালে সে হয়ত নিজের জন্য রাখা ফ্যানটা ঢেলে দেবে তার থালায়। তার দুঃখের কথা শুনবে। তার দেওয়া ফ্যান খেয়ে তার কথা শুনে বুক ভরে যাবে। কিন্তু গন্নেম্মার ওসব বিচার নেই। সে কোথাও কিছু না পেলে টুকটুক করে নীলির দোরগোড়ায় পৌঁছে যেত। ভেঙ্কান্না শুনেছিল রাজুর স্ত্রীর মন নাকি নরম। ভিখিরিদের সে নাকি দুমুঠো দেয়। কিন্তু ওদের বাড়িতে ভিক্ষে করতে যেতে তার ইচ্ছে করল না। সেখানে গেলে তার অনেক কথা মনে পড়ে। সে অন্ধ বটে কিন্তু সেখানে দাঁড়ালে সব দেখতে পাবে। দুঃখে অভিমানে তার সমস্ত শরীরটা কুঁকরে যায়।

একদিনের কথা। অন্ধকার হয়ে গেছে। সারাদিন ভেঙ্কান্না বা গন্নেম্মার পেটে কিছুই পড়েনি। ওরা নীলাম্মার মন্দিরের কাছে একটা পাথরের উপর বসল। কিছুক্ষণ পরে রামু এসে মন্দিরের দরজা খুলে প্রদীপ ধরাল। সেদিন আর নীলাম্মা তার উপর ভর করেনি। সে নীরবে মায়ের সামনে বসে রইল। অনেকক্ষণ বসে মন্দির থেকে বেরিয়ে ফেরার সময় ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলল।

"আর কতদিন, আর কতদিন এই আকাল থাকবে ?" গন্নেম্মা জিজ্ঞেস করল।

"দেশের ভাগ্য খারাপ। তাই তো ভালো লোকদের মগজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যে যা আছে তাই তো হবে ? এই তোমার কথাই ধরো না, একদিন কী না ছিল তোমার, আর আজ ভিক্ষে করে বেড়াতে হচ্ছে !" বলে সে চলে গেল।

গন্নেম্মার অবস্থা একসময় খুব ভালো ছিল। কী না ছিল তার ! ওর স্বামী ছিল ভীষণ কৃপণ। তার চেয়ে কিপ্‌টে এই গন্নেম্মা সে নিজে। গা ভর্তি সোনার অলঙ্কার ছিল। গোলা ভর্তি ছিল ধান। তবু সে এঁটো হাতে কাকতাড়ায়নি। পাছে এক-দানা ভাত কাকে খেতে পায়। হাত উপুড় করতে সে জানতো না কোনদিন। আত্মীয় স্বজন পারতপক্ষে তার বাড়িতে আসতো না। এলে একবেলাও থাকত না। টাকা অন্ত প্রাণ তার। স্বামীর চেয়েও টাকা সে বেশী ভালোবাসতো। একবার স্বামীর খুব অসুখ করেছিল। ভেবেছিল এমনি সেরে যাবে। দিন যায়, মাস যায়, অসুখ সারল না। যত টোটকা ওষুধ জানা ছিল সব শেষ হয়ে গেল। শেষে সে যখন আর বিছানা থেকে উঠতে পারল না তখন পাশের গাঁয়ের এক কবিরাজকে ডেকে পাঠাল। কিন্তু তার পয়সার হাঁক শুনে দুদিনেই সে তাকে বিদেয় করল। তারপর সাধুসন্ন্যাসীর কাছ থেকে কবচ এনে পরাল। কিন্তু দিনকে দিন তার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শেষে আবার টোটকা শুরু হল। প্রতিবেশীরা বলল, "এভাবে চোখের সামনে একটা লোক মরবে ! শহর থেকে একটা ভালো ডাক্তার আনালে লোকটা বাঁচত।" কিন্তু ওদের কথা গন্নেম্মা কানে তুলল না। তাকে দেখতে যে আসত সেই বলত, "আর দেরী করা উচিত নয়, শহর থেকে ডাক্তার আনান।" তখন গন্নেম্মা বলত স্বামীকে, "ওগো, এরা তোমাকে দেখতে এসেছে। দেখতে তো নয়, তোমার টাকাপয়সা যাতে তাড়াতাড়ি

শেষ হয় তার ব্যবস্থা করতে এসেছে।" তারপর সে ওদের বলল, "দেখতে এসেছেন দেখে যান, আজেবাজে উপদেশ দেবেন না। কবিরাজ বৈদ্য সবাই আসছে। ওষুধ যা দেওয়ার দিচ্ছে। আমার সোয়ামীর অসুখ, আমার ভাবনা নেই, ভাবনা হয়েছে আপনাদের।" টোটকা ওষুধের বৈদ্য বলেছিল, "এক সপ্তাহের মধ্যে অসুখ উড়িয়ে দেব।" বদ্যির এই কথার এক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ মানুষটাই উড়ে গেল।

মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা গন্নেস্মাকে সারা গাঁয়ের লোক যা মুখে এল তাই শুনিয়ে দিল। ওদের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে বলল, "ওরে পোড়ার-মুখোরা, ওরে আঁটকুড়িরা, ওঁর ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে! তোরা আমাকে দোষ দিচ্ছিস কেন? তোদের যখন যম নিতে আসবে তখন তোদেরও যেতে হবে।" এই কথা শুনে আর কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। ওরা বলাবলি করল, "বুঝবে, এর ফল একদিন ফলবে। স্বামী মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত সোনাদানা বাড়িতে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখল। যারা তার স্বামীর কাছে অলঙ্কার বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছিল তাদের ঐ অলঙ্কার সে ফেরত দিল না। স্রেফ "জানি না" বলে দিল। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে তার লোভ হু হু করে বাড়তে লাগল। লোভের কি সীমা আছে। ঠিক এরকম সময়ে তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় এল। দুদিন ওখানে থেকে তার লোভ আরও বাড়াল। ভালো ভালো কথা বলে সে গন্নেস্মার লোভ আকাশ ছোঁয়া করল। জানালো যে সে একটি ব্যবসা করে। ঐ ব্যবসাতে এত লাভ যে শুধু লাভের লোভে ব্যবসাটা ছাডতে পারছে না। এতো লাভ যে বলার নয়। যত টাকা ঢালে তার দ্বিগুণ টাকা দু'দিনেই উঠে আসে। গন্নেস্মা ঐ টোপ খেলো। প্রথমে তাকে একশো টাকা দিল। দু'দিনের মধ্যে সে একশো টাকার লাভ পঞ্চাশটাকা গন্নেস্মাকে দিল। গন্নেস্মার চোখের সামনে বিরাট আশার আলো জ্বলে উঠল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে পাঁচশো টাকা ব্যবসায়ে খাটাতে দিল। সেই টাকারও ভালোই লাভ পেয়ে গন্নেস্মার আশা আরও বাড়ল। সে লোকটার সঙ্গে শহরে দু'একদিন গেল। তার দু'একটা মালগুদাম দেখল। দেখে তার খুব বিশ্বাস হল। তারপর লোকটা বলল, "এভাবে ব্যবসা করে আনন্দ নেই। এতো টাকা গাড়িভাড়া চলে যায় যে বলার নয়। অথচ নিজের একটা লরি থাকলে টাকাটা ঘরেই থাকতো।" তারপর লরি কেনার তোড়জোড শুরু হল। সে বলল, "লরিটা কিন্তু আমি তোমার নামেই কিনতে চাই। লরির টাকা তোমার, লাভও তোমার। ঐ টাকায় আমি হাত দেবো না।" গন্নেস্মা প্রথমে গায়ের গয়না বিক্রি করল। বাড়িতে যত সোনাদানা ছিল সব বিক্রি করল। তাতেও কিছু হল না। টাকার টান রয়ে গেল। তখন নিজেদের যত জমি ছিল সব বিক্রি করে দিল। তারপর কেনা হল একটি লরি। সেই লরিতে বসে গন্নেস্মা দুদিন ঘুরেও ছিল। মনের আনন্দে লোকটার সঙ্গে বসে সিনেমাও দু'একদিন দেখেছিল। উঠতে বসতে ঐ আত্মীয়ের সে প্রশংসা করতে লাগল। প্রতিবেশীরা গন্নেস্মার চালচলন

দেখে যা বলার নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করল। তাকে আর কেউ ঘাঁটাল না। লরি কেনার পরেও দুদিন আলাদা দুটো গুদাম দেখে এসেছিল গন্নেস্মা। লোকটা বলল, "ব্যবসা চলছে শহরে। রোজ রোজ তোমাকে এভাবে কষ্ট করে শহরে আসতে হয়। তোমার এত কষ্ট আমি সইতে পারি না। ভাবছি শহরেই একটা বাড়ি কিনে ফেলব।" বলে লোকটা কিছু ইংরেজী লেখা কাগজপত্র গন্নেস্মার হাতে দিয়ে বলল, "এসব কাগজ যত্ন করে রেখো। এগুলো হারালে লরি নিয়ে ঝামেলা হবে। এটা থাকলেই প্রমাণ হবে যে লরিটা তোমার, হারালে লরি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।" লোকটা যে বিশ্বাসী সে ব্যাপারে গন্নেস্মার আর কোন সন্দেহ রইল না।

একদিন সকালে গন্নেস্মা উঠে দেখে আত্মীয়টি নেই! গন্নেস্মা মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চিৎকার করতে লাগল। ঐ ইংরেজী লেখা কাগজগুলো লোককে দেখাল। লেখাপড়া জানা লোক ঐ কাগজ দেখে বলল, "এতে তো লরির কথা কিছু নেই। লরি নেই, তোমার নামও নেই।" শুনে গন্নেস্মা ঐ আত্মীয়ের উদ্দেশ্যে যেসব গালাগাল হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়েছিল সেগুলো অভিধানে নেই। লোকে বলাবলি করল, "জলজ্যান্ত স্বামীকে খেলো, ওর কি কখনও ভালো হতে পারে? এবার বুঝবে!"

তারপর গন্নেস্মার বসে বসে খাওয়ার পালা শুরু হল। ঘরে একপয়সাও ছিল না। বাড়িটি বন্ধক রেখে টাকা এনে খরচ চালাতো। বসে বসে খেলে কদিন আর চলে। শেষে একদিন নিজের বাড়িটিও হাতছাড়া হয়ে গেল। তারপর থেকে গন্নেস্মা পথের ভিখিরি।

ধান কাটা শুরু হল। সোনালী ধানের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গোলায় তোলার আগে পুল্লাইয়া মহাজনের ধান মেপে আলাদা করে রাখলো। মন মেজাজ অন্য বছরের মত ভালো নেই। মল্লু লাঠিখেলা শেখা তখনও শুরু করেনি। রাজুর কাছে যত টাকা এনেছিল তারা তার সুদ বাবদ ধান দিতে হবে। ওকে যত ধান দিতে হবে তত দেওয়ার পর বাকি যে ধান থাকবে তাতে পরিবারের সকলের মাত্র একমাস চলবে। তাই নীলি অনুরোধ করল, "সুদটা টাকায় নিতে। এবছর ধান দিলে মাসখানেক পরেই নিজের খাওয়ার জন্য চড়া দামে ধান কিনতে হবে। সবে ধান কাটা হচ্ছে। এখনি এক গরিসে (ষাট মণ) ধানের দাম কালোবাজারে এক হাজার টাকা। দুদিন পরে তার দাম হবে পনের শো। তাই বলছি, আপনি এবছর ধান না নিয়ে টাকা নিন। এটুকু দয়া করুন। তা না হলে ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।" নীলি অনুরোধ করল। শেষে রাজু জমি তার নামে লিখে দিয়ে টাকা নিতে বলল। "আগেকার মত সুদের ধান অত বেশী করে নেবেন না। একশ টাকার সুদ দু'পুট্লু (চার মণ) ধান না নিয়ে আর একটু কমান। আগামী বছর থেকে আবার আমি সুদ বাবদ ধান দিয়ে আসব।" রাজু বলল, "পরের কথা পরে হবে। লেখাপড়ি হয়ে

গেছে। এখন তোমাদের যেমন প্রাণ চায় তেমনি কর। তোমাদের জমি আমার হাতে এলেও শুধু ধান কেন, ঐ জমিতে তোমরা অন্য ফসলও ফলাতে পারবে।" এককথায় তাদের প্রস্তাবে রাজু রাজী হওয়াতে নীলি খুব খুশী হল। পুল্লাইয়ার মনে একটু খটকা ছিল। তাই সে জমিটা রাজুর নামে লিখে দিতে প্রথম প্রথম রাজী হল না। কিন্তু নীলির চাপে পড়ে রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে রাজুর নামে জমিটা লিখে দিয়ে আসতে হল।

গ্রীষ্মকাল। একদিন মল্লু তার সমবয়সীদের সঙ্গে লাঠিখেলা খেলছিল। আর তালে তালে বলছিল, "ঝনক্ ঝনক্ ঝা।" পাও ফেলছিল তালে তালে। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে পুল্লাইয়ার মনে মনে খুব গর্ব হল। বাঘের থাবার মত মল্লু তার হাতের পাঞ্জা নাড়তে লাগল। পুল্লাইয়া লক্ষ্য করল ছেলে ঠিক ঠিক ভাবে পা ফেলছে আর হাত নাড়ছে। শরীরটা যেভাবে নড়া উচিত সেইভাবে তার শরীর নড়ছে। "টাকা পয়সা থাকলে ছেলেটাকে মনের মত তৈরি করতে পারতাম।" ভাবতে ভাবতে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল সে। ভাবনাগুলো এগিয়ে চলল। "আমি যদি বিড়ালের মত একটা ডিগবাজি খেয়ে মাথা নিচু করে পা উপরে তুলতে পারতাম···মল্লু বেয়ে বেয়ে একেবারে আমার পায়ের পাতার উপরে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ত। লোকে বলাবলি করত, উপরে যে ছেলেটা আছে সে হল নিচে যে লোকটা আছে তার ছেলে।" মনে পড়ে গেল অতীতের কথা, "সেই যে বুড়ো, যে বুড়ো হলেও বুড়োর মত দেখাচ্ছিল না, যে ছিল বয়সে বুড়ো অথচ উৎসাহে যুবক, যে ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে ঐ কথা বলেছিল বলেই বসতে হল আমাকে পিঁড়িতে। আমার মনে সে ছেলের স্বপ্ন ঢুকিয়েছিল। এই মল্লু আমার সেই স্বপ্নের ছেলে। বুড়োটা যে এখন কোথায় আছে কে জানে ?"

"দেবো নাকি একটা ডিগবাজি।" পুল্লাইয়া মনে মনে বলল, "ছেলেকে উঠতে বললেই উঠবে। কিন্তু ওঠার পর যদি আমি ঠিকভাবে ওকে রাখতে না পারি! আমি না রাখতে পারলে সে যদি উপর থেকে পড়ে যায়···হাত-পা ভেঙ্গে···না থাক···আর ডিগবাজি খেয়ে কাজ নেই।" তারপর এক পা এক পা করে ছেলের কাছে এল। মল্লু লাঠিখেলায় ডুবেছিল। ওর খেলা দেখতে দেখতে অনেকেই আশপাশে দাঁড়িয়েছিল। একটা মেয়ে মাথায় কলসি নিয়ে পুকুরের জল আনতে আনতে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সে যেতে যেতে বলল, "এমন ছেলে একাই একশো।" তার কথা পুল্লাইয়ার কানে গেল। তার মন ভরে গেল আনন্দে। বাপকে দেখেই একদৌড়ে এসে সে কাঁধে উঠে পড়ল। বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে মল্লু বলল, "বাবা, মার জ্বর হয়েছে···জ্বর হলে মরে যায় ?" এতক্ষণ যে আনন্দ পুল্লাইয়ার মনে ছিল তা যেন কর্পূরের মত উবে গেল।

"শিবু বলেছে, কে নাকি হাতিতে চড়ে আসবে। পেরাণ নিয়ে চলে যাবে। হাতি

নিয়ে ও কবে আসবে বাবা? আমি লাঠি হাতে নিয়ে মার কাছে বসে থাকব।” মল্লু বলল।

পুল্লাইয়া হেসে বলল, “ওরে না, ওসব বাজে কথা।” মল্লু বাপের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, “বাজে কথা। শিবুর দু চোখ কানা হয়ে যাক। আমার মা মরতে যাবে কেন?”

উকিল সীতারামস্বামীর যে দূরদৃষ্টি আছে তা ছেলের বিয়ের সময় একবার প্রমাণিত হয়েছিল। এখন আর একবার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ আর কিছু নয়, সামনে নির্বাচন। বিভিন্ন প্রার্থী যে যার দলের কথা ঢাক পিটিয়ে বলবে। বেশির ভাগ ভোট গ্রামেই আছে। গ্রামের লোককে বোঝালে, ছাপানো জিনিস পড়ালে, প্রচারের কাজ খুব বেশি এগোয় না। ওদের কিছু একটা করে দেখাতে হয়। আর ওরা কি পাবে, কি দেওয়া হবে সেকথা জোর গলায় বলতে হয়। সেই জন্যই প্রত্যেক প্রার্থী 'জমি যার লাঙ্গল তার' এই শ্লোগান দিয়ে থাকে। এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে যাত্রা, নাটক লেখা হয়, করা হয়। এমন কি সিনেমা করেও বেশ দু পয়সা আসে। ফলে গাঁয়ের লোকের মনে কিছুটা এসব ব্যাপার গাঁথে। এইসব নাটক সিনেমা দেখে আর ভাষণ শুনে অনেক সময় কৃষকেরা একটু গরম হয়, মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়িও হয়। বাড়াবাড়ির ফলে কিছু লোকের ক্ষয়ক্ষতি হয়। শেষে আবার যে-কে-সেই। এই আকালের সময় তো কথাই নেই। কত ভালো ভালো ঘরের মেয়েকে বিপদে পড়তে হচ্ছে। কত চাষী পরিবারের ছেলেমেয়েকে ভিক্ষে করতে হচ্ছে। ধানের দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই। কমার কোন লক্ষণ নেই। এই সময় বহু চাষী ধার মেটাতে না পেরে মহাজনের কাছে নিজের সামান্য জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। যার সামান্য জমি আছে সে এই আকালের সময়, প্রাণের দায়ে, ইজ্জতের ভয়ে, বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। জমি নিয়ে মারামারিও হচ্ছে। মামলা মোকদ্দমা হলে কি হবে যার টাকা বেশী তার জয় হচ্ছে। এইভাবে গরীব পথে বসছে, ধনীর সম্পদ বাড়ছে।

সীতারামস্বামী বহুদিন আগে অনুমান করতে পেরেছিল এরকম একটা দিন আসবে; এরকম পরিস্থিতিতে জমির মালিকের সঙ্গে কৃষকের বিরোধ হতে বাধ্য। তাই সে অনেকদিন আগেই জমি বিক্রি করার কথা ভেবেছিল। কারণ বিক্রি করে দিলে লোকে জানবে সে জমির মালিক নয়। ভোট পেতে সুবিধে হবে। কিন্তু বাধা দিলে তার বউ। পুল্লাইয়া বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যেক বছর তার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে যায়। তাই জমিটা বিক্রি করা তার হল না। সামনের বছর নির্বাচন। এখন থেকেই তোড়জোড় চলছে। গদিতে যারা বসে আছে তাদের এখন আরও ভালো ভালো কথা বলতে হচ্ছে। অনেক জায়গায় শুধু কথায় চিড়ে ভিজছে না। চাষীরা বুঝে নিয়েছে জমিদারী প্রথা কাগজে কলমে উঠেছে। কিন্তু আসলে তেমন কিছু হয়নি। তাই এবার ওদের হাতেনাতে কিছু করতে হবে। একজনেরটা নিয়ে আর একজনকে দিতে হবে।

নির্বাচনে দাঁড়াতে হলে এখন থেকেই শহরে একটা বাড়ি কিনে রাখা দরকার। যোগা-যোগ থাকে। শহরে বাড়ি কিনে ভাড়া দেওয়া যায়। রোজগার বাড়ে। আবার সেই রোজগারের দিকে কারও অত নজর পড়ে না। এসব কথা সীতারামস্বামী স্ত্রীকে একদিন বুঝিয়ে বলল, "সারা জগতে এত বড় জেলা নেই। যারা আগামী দিনে গদিতে বসবে তাদের 'জমি যার লাঙ্গল তার' এই শ্লোগান দিতেই হবে। এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই চাষীর হাতে কিছুটা জমি দিতেই হবে। তখন চাষীর অবস্থা একটু ভালো হবে। ওরা শহরে যাতায়াত করবে। জিনিসপত্র কিনবে। শহরে দোকানের সংখ্যা বাড়বে। বেড়ে যাবে শহরের ঘরভাড়া। তাই বলছি, সব জমি বিক্রি করে শহরে ঘরবাড়ি কিনে রাখা ভালো।" শেষপর্যন্ত তার বউ, পুল্লাইয়া যে দু একর জমিতে চাষ করে সেটাই বিক্রি করতে রাজী হল। হিসেব করে দেখা গেল ঐ জমি বিক্রি করে যে টাকা পাবে তাতে শহরে বিরাট একটা বড় বাড়ি কিনতে সে পারবে।

ঐ দু একরের মধ্যে এক একর রাজু কিনবে। আর এক একর জমি মোড়ল কিনে নেবে ঠিক হল। পুল্লাইয়াকে সীতারামস্বামী ডেকে পাঠাল। "দেখ পুল্লাইয়া, তুমি তো আমাকে চেনো। খুব একটা বিপদে না পড়লে মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলি না। আমার টাকা ভীষণ দরকার পড়ে গেছে। তোমার ঐ দুএকর জমি বিক্রি না করলে কিছুতেই আমার আর চলছে না।"

পুল্লাইয়া বলল, "বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে ঐ জমিতে ভাগে চাষ করে আসছি। ধান কাটার পর আপনার প্রাপ্য ধান ঠিকভাবে দিয়ে যাচ্ছি। শুধু ধান কেন, যখন যে ফসল ফলিয়েছি তাই দিয়ে গেছি। উপরন্তু আপনাদের গরুর জন্য খড়ও দিয়ে যাই। কোন চাষী যা দেয় না তাই আমি প্রত্যেক বছর দিয়ে যাই। এখন আপনি বিক্রির কথা বললে আমরা কোন নদীতে ঝাঁপ দিই, বলুন তো।"

"দেখ, আমার তো উপায় নেই। আমি যে অগ্রিম টাকা নিয়ে বসে আছি। বিক্রি আমাকে করতেই হবে।" সীতারামস্বামী বলল।

পুল্লাইয়া অনেক আবেদন নিবেদন করার পর সে বলল, "ঠিক আছে, বিক্রি করে আমি তোমাকে কিছু দেবো।"

"তাহলে যারা কিনবে তারা আমাকেই চাষ করতে দেবে তো? সেইভাবেই লেখাপড়া করিয়ে দিন।"

"তা হয় না। যারা কিনবে তারা নিজেরাই চাষ করবে। সে পরে তুমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, ওরা দেয় দেবে। আইনত আমি কিছু করতে পারি না।"

আবেদন নিবেদনে যখন কোন কাজ হল না তখন ঝট্ করে পুল্লাইয়া দাঁড়িয়ে বলল, "ওসব আইন-টাইন আমি বুঝি না বাবু। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে যে জমিতে ভাগ চাষ করে আসছি সেই জমিতেই চাষ করব। ঐ জমিতে আমার হক্ আছে। যে গর্মেন্ট আমার হক্ নেই বলবে তাকে আমি দেখে নেব। কোর্ট কাছারিতে

আপনারা ঘুরে বেড়াতে পারেন, আমি ঐ জমির মাটি কামড়েই পড়ে থাকবো।" বলে মুখ ঘুরিয়ে বাইরে সে পা রাখল। সীতারামস্বামী চিৎকার করে বলল, "জমি আমার, তোর আবার হক্ কিরে? বিক্রি করে কিছু দেবো বলেছি তাতে হলো না? বেশি লম্ফঝম্ফ করলে যা দেবো বলেছি তাও দেবো না।"

পুল্লাইয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে দেখা যাবে। তোমার কাগজপত্রে আমার হক্ না থাকলে গাঁয়ের সবাই জানিয়ে দেবে, আমার হক্ আছে কিনা!" বলে পুল্লাইয়া বাড়িমুখো হল। পুল্লাইয়ার চলে যাওয়ার পর রাজু একটা চাষীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। রাজু বলল, "আপনি জমিটা আমাকে বিক্রি করে দিন। পুল্লাইয়াকে কিভাবে জমিছাড়া করতে হয় আমি তা জানি। ওর আর বেশিদিন নেই। রাজুর কথায় সীতারামস্বামী খুব খুশী হয়ে লেখাপড়ি করে নিতে রেজিষ্ট্রী অফিসে গেল।

নবিরি গ্রামের বড় পাড়ায় পিসার বাড়ির সামনে এই জমি বিক্রির কথা উঠল। রেজিষ্ট্রেশনের কথা পুল্লাইয়ার কানে যেতেই আগুন হয়ে গেল সে। পিসা বলল, "বাবা পুল্লাইয়া, রাগ করছিস কেন? ঐ ভগবানই বিচার করবে।"

"ভগবান! হুঁ। আমার জমিতে যে পা দেবে তার মাথা আমি ফাটিয়ে দেবো।"

"ওরে পাগল, ওদের লোকবল, অর্থবল দুটোই আছে। যার টাকা আছে তার সব আছে। তবে তোর আছে ধর্ম। ভগবান আছে ধর্মের পক্ষে।" পিসা বলল।

পিসার কথা শুনে পুল্লাইয়ার ভেতরটা যেন জ্বলে উঠল। সে বলল, "সবসময় ভগবান, ভগবান বলে বসে থাকো। এই নাকি তোমার ভগবান? এই ভগবানের ধর্ম? দেখোগে যাও, তোমার ভগবান কোন্ অন্ধকারে গুমরে মরছে? এখনও তুমি ভগবান ভগবান বলে বসে থাকো?"

"ওহে আছে, আছে। ভগবান আছে। এই যে তোমার মুখের আদল আর আমার মুখের আদল একরকম নয়, কেন জানো? তুমিও নবিরি গ্রামের ছেলে, আমিও নবিরি গ্রামের ছেলে। তবু আমাদের অবস্থা আলাদা কেন? শোন, প্রত্যেক মানুষ যেমন আলাদা, প্রত্যেকের ভাগ্যও তেমনি আলাদা!..."

পুল্লাইয়ার আর ধৈর্য রইল না। তার কথা শেষ না হতেই বলল, "কালকেই আমি জমিতে লাঙ্গল দেবো। দেখব, কার গোঁফে কত তেজ, কে বাধা দেয়।" বলে গোঁফটা পাকিয়ে নিল। বাপের দেখাদেখি গোঁফহীন মল্লুও পাকাতে লাগল।

এসব দেখছিল শুনছিল এক কুষ্ঠ রোগী। সে পা টানতে টানতে যাওয়ার সময় রাজুর সামনে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে রাজুর কানে সব কথা চলে গিয়েছিল। সে সঞ্জীবকে বলল, "দেখি ও ব্যাটা কিভাবে লাঙ্গল দেয় ঐ জমিতে।" এই কথা কানে যেতেই কুষ্ঠরোগী হাঁকপাঁক করে নীলির কাছে এসে বলল, "মাগো, ও মা, কাল ক্ষেতে লাঙ্গল ফেলতে গেলে পুল্লিবাবু আর বাঁচবে না মা,...রাজু জিদ ধরেছে। ও নাকি তোমাদের জমিটা কিনে নিয়েছে? সেই নাকি জমির মালিক। গর্মেণ্টও নাকি ওর

পক্ষে। ভগবান কি আর তোমাদের দেখবে না মা ?"

নীলি উদ্বিগ্ন হল। কিন্তু বাইরে সে তা প্রকাশ করল না। রাত্রে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, অপেক্ষা করল স্বামীর মুখে শুনতে। কিন্তু পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। সারাদিন গম্ভীর রইল। বুড়ির শরীর ভালো ছিল না। এককোণে শুয়ে সে গোঙাচ্ছিল। কোলের বাচ্চাটা উঠে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। মায়ের বুকের দুধে তার কুলোচ্ছিল না। একমাসের মেয়েকে নীলি ভাত চটকে খাওয়ায়। দুধ কেনার পয়সা নেই। বাচ্চাটার মুখে মাই পুরে দিয়ে তার কান্না থামাবার চেষ্টা করল নীলি। মাই দিতে দিতে লক্ষ্য করল পুল্লাইয়া এপাশ ওপাশ করছে। নীলি ভাবল, এই সেই পুল্লাইয়া···এই সেদিন তেঁতুলগাছের আড়ালে তাকে জোর করে ধরে রেখেছিল···বিয়ের দিন এই লোকটাই তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়েছিল। এই তাকে শহরে মহাজনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ছিল।···ঐ পুল্লাইয়ার সঙ্গে আজকের এই পেটভরে না-খেতে-পাওয়া চাষীটার কত তফাত। তার দিকে তাকাতে তাকাতে নীলির মন দুঃখে ভরে গেল। সারাদিন যে কেন সে জমির ব্যাপারটা বুকে চেপে রেখেছে তা নীলি জানে। বাইরে যতই দাপাদাপি করুক লোকটার মন যে খুব নরম তাও সে জানত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাই চুষতে চুষতে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল। বুড়ি গোঙাচ্ছিল। মল্লু বাপের পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলি লম্ফের সলতেটা নাবিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে স্বামীর পাশে বসল। সে পাশে বসে যতক্ষণ না গায়ে পিঠে হাত বুলোল ততক্ষণ পুল্লাইয়া টের পায়নি। সে তাকাল নীলির দিকে। নীলির চোখে সেই ভালোবাসার স্নিগ্ধ চাউনি। ঠোঁটের ফাঁকে তার হাসি। একবার তার দিকে তাকিয়ে ঝট্ করে পুল্লাইয়া মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাত বুলোতে বুলোতে নীলি তার মুখের উপরে নিজের মুখ রাখল। সঙ্গে সঙ্গে পুল্লাইয়ার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। আস্তে আস্তে শান্ত স্বরে নীলি বলল, "এত কিছু ঘটে গেল, গাঁয়ের সবাইকে বললে, আর আমার কাছেই লুকোলে ?"

পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। সমস্ত শরীরটা যেন তার অস্বস্তিতে ভরে গেল। অপরাধীর মত সে কুঁকড়ে গেল। হঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, "গাঁয়ের কাউকে আমি ভয় করি না বুঝলে ?"

নীলি স্বামীর গা ঘেঁষে শুয়ে নিজের বুকে তার মাথাটাকে চেপে রাখল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেমে এল দুঃখের জোয়ার। পরস্পরকে গভীরভাবে জড়িয়ে রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দুজনেই কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা ছিল না। নীলি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। নিজের কোলে স্বামীর মাথা রেখে তার চোখের দিকে না তাকিয়েই সে বলল, "কালকে বাড়ি থেকে নড়বে না। কথায় বলে, রেগে গেলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। পশুর অধম হয়ে যায় সে। কি করবে বল, আমাদের কপাল! হাত-পা শক্ত সমর্থ থাকলে···"

বলতে বলতে নীলি থেমে গেল। আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরোল না। তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল বেরিয়ে স্বামীর গায়ে পড়ল। স্ত্রীর যে কোথায় ব্যথা তা বুঝেও পুল্লাইয়া বলল, "আমাদের উপর যে ওরা অন্যায় অবিচার করছে তা চারজনকে জানাতে হবে না ?"

"এই কাচ্চাবাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার রাগ একটু দমিয়ে রাখো। জমি জায়গা কারও চিরকাল থাকে না। ধনসম্পত্তি আজ থাকে, কাল চলে যায়। অত কেন, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে ? ভালোমন্দের বিচার সবসময় সঙ্গে সঙ্গে হয় না। যখন হওয়ার হবে, না হলে কি করা যাবে। এক চোখে জল গড়ালে অন্য চোখে হাসি ফোটাতে পারলেই তো জীবন। আমার কথা আমি বললাম। তোমার প্রাণে যা চায় তাই করো।" নীলি বলল।

নীলি আর কোন কথা বলতে পারল না। তার গলা ধরে গেল। আস্তে আস্তে উঠে বাচ্চার পাশে শুয়ে পড়ল।

সকাল হল। সূর্যের আলো সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। রাত্রে যা কিছু ঘটেছিল পুল্লাইয়ার কাছে স্বপ্নের মত লাগল। সামান্য ফ্যান ছিল তাও টেনে খেয়ে নিল। একটু আম্বালি ছিল, খেয়ে নিল। ততক্ষণে সারা গাঁয়ে বলাবলি করছে, "আজকে পুল্লাইয়ার সঙ্গে রাজুর একটা কিছু ঘটে যাবে।" কারও কারও ধারণা, মাথা ফাটাফাটি হবে। মুহূর্তের জন্য পুল্লাইয়া ভাবল, "না গেলে কেমন হয়।" কিন্তু পরক্ষণেই তার হাত পড়ে গেল গোঁফে। সঙ্গে সঙ্গে আপন মনে বলে উঠল, এত তাড়াতাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলতে হবে ! দূর শালা, মরবো তো একদিন। যাবো যখন বলেছি, যাবো। পুরুষমানুষের কথাই আসল। কাপুরুষ হতে পারব না। যতই হোক, আমি মল্লনাইডুর ছেলে ! বাবা ছিলেন, এক কথার মানুষ। আমি তার ব্যাটা। লোকে নিজের চোখে দেখে, বিচার করবে, আমি বাপকা ব্যাটা কিনা।"

পুল্লাইয়া বগলে লাঠি গুঁজে বলদগুলোকে নিয়ে লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে, বাইরে পা রাখল। পেছনে রইল মল্লু। নীলি একপাশে দাঁড়িয়ে যা যা করছে দেখছিল। পুল্লাইয়া স্ত্রীর দিকে একবারও তাকাল না। বেরিয়ে পড়ল। ওর বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়ার উপর শোয়ানো বাচ্চাটা "ওয়া" করে চেঁচিয়ে উঠল। অসুস্থ বুড়ি এগিয়ে মল্লুকে ধরতে গেল। কিন্তু সে তার চুল ধরে টেনে, তাকে ঘুষি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে, বাপের পেছনে চলে গেল। নীলি শেষ মুহূর্তেও স্বামীর মুখে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। আর পারল না নীলি। খাটিয়ার উপর থেকে বাচ্চাটাকে তুলে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পেছন থেকে পুল্লাইয়ার বগলের লাঠিটা ধরে টেনে নিল। পেছন দিকে ঘুরে তাকানোর সময় লাঙ্গলের ফলা নীলির মাথায় ঠক্ করে লাগল। তার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে লাঠি ছেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

এগিয়ে গেলেও তার যেন চোখ ছিল পেছনের দিকে।

ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে পুল্লাইয়া ভাবল, বাচ্চা বয়স থেকে এই ক্ষেতটা আমার ছিল। এই আলের ঘাস কেটে ভেড়া আর গরুবাছুরকে খাইয়েছি। আমার মত আমার ছেলেও এই ক্ষেতে কাজ করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ এই অবস্থা হল! মা-বাবাকে যত ভালোবাসতাম তার দ্বিগুণ ভালোবাসি এই ক্ষেতের মাটিকে আর এই মাটি আজ থেকে আমার নয়!

সে লাঙ্গল নাবালো। ছেলে ছোট একটা বেত নিয়ে বলদগুলোকে দাঁড় করাল। বলদগুলোকে লাঙ্গলে বাঁধল পুল্লাইয়া। ক্ষেতের পূবদিকে মুখ রেখে মাটিতে লাঙ্গলের ফলা চালাতেই পিসা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "ওরে পুল্লাইয়া, ওরে দলে দলে লাঠি হাতে আসছে রে! আমার কথা শোন পুল্লি, চল ফিরে যাই। ঐ দেখ ওরা আসছে··· ঐ তো আসছে! ঐ দেখ কিভাবে ছুটে আসছে! বাবা শোন, আমার কথা শোন, তোমার পায়ে ধরে বলছি, চল ফিরে যাই।"

পিসা ভয়ে কাঁপতে লাগল। হাঁপাচ্ছিল সে। পুল্লাইয়া যেভাবে লাঙ্গল চালিয়ে যাচ্ছিল তাতে মনে হল না যে পিসার একটি কথাও তার কানে ঢুকল। পিসা আবার চিৎকার করে বলল, "ঐ দেখ এসে গেছে! দেখ, দেখ ক্ষেতের চারদিকে কিভাবে দাঁড়াচ্ছে! বাবারে, একটা লোককে মারার জন্য তোরা এত লোক আসছিস! তাও খালি হাতে নয়, এতগুলো লাঠি নিয়ে ধেয়ে আসছিস! তোরা কি মানুষ রে? দেশে কি ন্যায়, ধর্ম বলে কিছুই নেই। এসব কি বনে চলে গেছে!"

রাজু ক্ষেতে পা রেখে পিসাকে ধরতে গেলে সে তাকে এড়িয়ে মল্লুকে কোলে নিয়ে ক্ষেতের বাইরে পালাতে গেল। মল্লু কাঁদতে কাঁদতে তার পিসা দাদুকে মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তার ছোট্ট কাছাটা খুলে গেল। কাছাটা গুঁজতে গুঁজতে সে আবার বাপের কাছে ছুটে গেল। রাজু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পিসাকে ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল। ক্ষেতের বাইরে দাঁড়িয়ে পিসা চিৎকার করে বলতে লাগল, "বাবা পুল্লি, হুট্ করে কিছু করতে যেও না।"

রাজু বলদগুলোর সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পুল্লাইয়া বলদগুলোকে হাঁকলো। ওরা এগোতেই দুজন লাঠিধারী এসে সেখানে দাঁড়াল। বলদগুলোকে থামিয়ে ওদের বাঁধন খুলে দিল। পুল্লাইয়া দাঁত কট্‌মট্ করতে লাগল। চারদিকে কে আছে না আছে তা দেখল না। তার সমস্ত শরীরে রাগের আগুন জলতে লাগল। তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছিল। মাথার ভেতরে যেন টগ্‌বগ্ করে লাভা ফুটছে। চোখে সে অন্ধকার দেখছিল। ক্রমশ তার চোখের সামনে কালো পর্দা নেমে আসছিল। জল ভরে যাচ্ছিল তার চোখে। কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। রাজু বলদগুলোকে সরাচ্ছিল। সে যেন হঠাৎ দেখতে পেল নীলিকে। মনে হল সেই বলদ-গুলোকে খুলে ফেলেছে। মনটা তার আর্তনাদ করে উঠল, "কি? আমার বলদ-

গুলোকে রাজু নয়, নীলি খুলে ফেলছে ! নীলি !···আমার নীলি এই কাজ করল !"

বিরাট মূর্তিতে যেন ফাটল ধরল। মল্লুর দিকে চোখ পড়তেই নিজেকে সে আরও অসহায় মনে করল। হাতের লাঠিটাও নীলি কেড়ে নিল! এইসময় লাঠি হাতে থাকলে তার মাথার উপরই পড়ত।

প্রথমে বলদগুলো নড়েনি। হঠাৎ রাজু সামনে লাঠিপেটা করতে থাকলে সেগুলো লেজ তুলে ক্ষেতের বাইরে চলে গেল। মল্লু রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "আমাদের বলদগুলোকে মারছিস কেন ?" বলে হাতের বেত দিয়ে রাজুকে মারল। ঝট্ করে কান ধরে রাজু তাকে টানতে টানতে ক্ষেতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় মল্লু তার জানুতে কামড়ে দিতেই তাকে ছেড়ে ছিল। ছাড়া পেয়ে আবার সে ছুটে এল বাপের কাছে।

রাজুর ভীষণ রাগ হল। লাঙ্গলটাকে ছুঁড়ে ফেলে বিচ্ছিরি ধরণের খিস্তি করে পুল্লাইয়াকে চিৎকার করে বলল, "বেরিয়ে যা আমার ক্ষেত থেকে।"

পুল্লাইয়ার মাথা গরম হয়ে গেল। সিংহের মত একলাফে সে রাজুর উপর পড়তে গেল। কিন্তু পা হড়কে তার আর রাজুর ঘাড়ে পড়া হল না। পড়ে গেল মাটিতে। তৎক্ষণাৎ উঠে রাজুকে ধরতে যাবে এমন সময় তিনজন লাঠিধারী তার পথ আগলে গর্জে উঠল, "আর এক পা এগিয়েছ কি মাথা কাটিয়ে দেব !"

ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে লাঠির ফাঁক দিয়ে পুল্লাইয়া দেখতে পেল তার সামনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাজু তো আছেই। ওদের সকলের মুখ সে পরিষ্কার দেখতে পেল না। হঠাৎ আপনমনে সে বলে উঠল, "নীলি না! আমার নীলি··· আমার নীলির ঘাড়েই কি আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেলাম !"

সামনে দাঁড়ানো ঐ তিনজনের মধ্যে দুজন পুল্লাইয়ার দুটো হাত ধরল। মল্লুকে ধরল আর একজন। রাজুর নির্দেশে ঐ লাঠিধারী গুণ্ডারা পুল্লাইয়া ও মল্লুকে ক্ষেতের উপর দিয়ে টানতে টানতে এনে ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল। ছুটে এসে পিসা পুল্লাইয়ার চোখে জল দেখে বলল, "বাবা পুল্লি, তোর চোখে জল দেখতে হল। বাঘ বিড়াল হয়ে গেল বাবা। কি দিন পড়েছে রে বাবা !" বলতে বলতে কপাল চাপড়ে হাউমাউ করে পিসা কাঁদতে লাগল।

কুড়ি

সেদিনের দুপুরটায় গুমোট গরম ছিল। যেমন রোদের তেজ তেমনি গুমোট গরম। সেদিনের দুপুরটা ছিল অনেকক্ষণ। দুপুরের পর বিকেল হল। এখানে সেখানে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি হল। আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। দ্রুত আকাশের রং বদলাতে

লাগল। নীল থেকে সাদা হয়ে কালো। মেঘগুলো পশ্চিমদিকে এগিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যের দিকে পাহাড়ের গায়ে বিদ্যুতের চমক দেখা দিল।

সেইসময় নীলাম্মা মন্দিরের কাছে পাথরের উপর একা বসেছিল গুড্ডি ভেঙ্কান্না। হাতে লাঠি আছে। গন্নেম্মা তার হাত ধরে এনে সেখানে ছেড়ে দিল। জীবনে সেটাই তার পুণ্য কাজ। সেখানে তাকে ছেড়ে সে চলে গেল। লাঠিটাকে সামনের দিকে রেখে গুড্ডি ভেঙ্কান্না বসে রইল।

একটু শব্দ হলেই "কে ?" বলে জিজ্ঞেস করল। সঞ্জীব বলল, "আরে গুড্ডি ভেঙ্কান্না যে! অন্ধকারে এখানে কি করছ ?"

"এই রামুর জন্য অপেক্ষা করছি বাবা। দেখি ওর মুখ দিয়ে নীলাম্মা কি বলায়।"

"ও তো নিজের জ্বালায় মরছে। ও আর এখানে আসবে কি করে ? চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।"

"না, রামু আসবে। রামু এখানে আসবেই।" বলে ভেঙ্কান্না গুছিয়ে বসল।

নদীর জল বইছে। জলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রাস্তা দিয়ে গরুরগাড়ির শব্দও ভেসে আসছিল। মাঝে মধ্যে "ট্র ট্র হেই হেই" গাড়োয়ানদের হাঁক শোনা যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে বাসের শব্দ পাড়ার কঠিন নীরবতা ভঙ্গ করছিল। বাসের আলো অন্ধকারের বুক চিরে যাচ্ছিল। আবার পায়ের শব্দ কানে যেতেই প্রশ্ন করল গুড্ডি ভেঙ্কান্না, "কে যায় ?"

প্রতিপক্ষের কোন জবাব এলো না।

"কে ? নাম বল ?"

কি একটা কুঁ কুঁ শব্দ ভেসে এল।

গুড্ডি ভেঙ্কান্না লাঠি তুলে বলল, "কে যাচ্ছ বল ? না হলে পিঠে লাঠি পড়বে।"

"আমি···রামু।"

"সর্বনাশ! চুপ করে থাকলে তো মাথা ফেটে যেতো হে! রাজু এদিকে আসবে শুনেছি। তার জন্যই অপেক্ষা করছি।"

রামু কোন কথা না বলে মন্দিরের দরজা খুলল। আজ তার পরনে যে ধুতিটা আছে তার দিকে তাকানো যায় না। অনেক কাণ্ড করে সে জোড়াতালি দিয়ে পরেছে। ওটাই কাচে, শুকোতে দেয় আর পরে। কালকেও সে এই কাপড়টাই পরে এসেছিল। কালকেই তার ছেলে তাকে দেখে যাওয়ার নাম করে তার কাছে এসেছিল। রামুর গায়ে তখন খুব জ্বর। জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে সে বেঘোরে পড়েছিল। ছেলে এসে তার পোঁটলায় যে পট্টবস্ত্রটা ছিল সেটা চুরি করে নিয়ে গেল।···সারা গাঁয়ের লোক চাঁদা তুলে ঐ পট্টবস্ত্রটি রামুকে কিনে দিয়েছিল। সেটি তার ছেলে চুরি করল মদ খাওয়ার জন্য। চারভাগের একভাগ দামে সে ঐ বস্ত্রটি বিক্রি করে দিল। কিনল ব্যবসাদার

পেরাইয়া। সেটি চুরি হওয়ার পর রামুর সমস্ত শক্তি যেন লোপ পেল। তার সব কিছুই যেন হারিয়ে গেল। চলাফেরা করতে না পারলেও যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ নীলাম্মা দেবীর পূজো করার আগ্রহ তার ছিল। এক-পা, এক-পা করে এগোয়, হাঁপিয়ে যায়, থেমে যায়। অনেকক্ষণ হেঁটে এক-পা-এক-পা করে এগিয়ে সে নীলাম্মার মন্দিরে ঢুকল। কথা বলার মত শক্তি তখন রামুর ছিল না। তাই সে ভেঙ্কান্নার জবাব দিতে পারছিল না।

প্রদীপ ধরিয়ে কুঁকড়ে বসে রইল রামু। কে কার ঘাড়ে ভর করবে! রামু শীতে কাঁপছিল। মাথায় পাকাচুল, দাড়িও সাদা। মাঝখানে মুখের কিছু অংশ দেখা যায়। একটিও দাঁত নেই। চোখগুলো ভেতরে ঢুকে গেছে। রামু দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

গুড্ডি ভেঙ্কান্না হাতড়ে হাতড়ে আস্তে আস্তে এসে মন্দিরের দরজায় বসে রামুর গোঙানি শুনতে পেল।

"কি হল ?" রামু এমনভাবে বলল যেন আর কোন কথা বলার ক্ষমতা তার নেই।

গুড্ডি ভেঙ্কান্না আস্তে আস্তে বলল, "কি আর হবে। রাজুর হুকুমে ঐ কচি ছেলেটাকে গুণ্ডারা হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল। পুল্লাইয়ার চাষের জমি বলতে আর কিছু রইল না। এই আকালে কত লোকের যে ঘটিবাটি চলে গেছে তার হিসেব নেই। ঐ রাজুটা যতদিন না নিজের রক্ত নিজের চোখে দেখছে ততদিন ওর সুবুদ্ধি হবে না। কি হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

রামু বিড়বিড় করে বলল, "বাঘ নয়, সিংহ নয়, মানুষ। কিন্তু হলে কি হবে, একটা মানুষকে শেষ না করে আর একটা মানুষ আনন্দ পায় না।"

"ধর্ম বলে আর কিছু রইল না দেশে। ধর্ম নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। দেখ, তুমি ওদের সবাইকে কত করে বুঝিয়ে বললে কিন্তু কি হল ? ওরা চোখ থাকতেও অন্ধ। এখন আমার চোখ নেই কিন্তু ওদের দেখতে পাই।"

রামু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "যার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ফাঁড়া থাকলে কেউ এড়াতে পারবে না। অন্ধকার না থাকলে আলোর মর্ম কি করে বুঝবে ? খারাপ আছে বলেই তো ভালোর এত কদর।"

রামুর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। তবু সে বলে যাচ্ছিল, "সন্ধ্যের সময় সূর্যকে পশ্চিম-দিকে দেখি, তাই বলে কি ওটা পুবদিক ?···পূর্বদিকে সূর্যকে দেখতে হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আজকে গরম পড়েছে, কালকে ঠাণ্ডা পড়বে।···আজকে সংসারে কত লোক জন্মেছে আবার কত লোক মরেছে।···এসব মরা বাঁচা তো সংসারের নিয়ম।" আর কথা বলতে পারল না। হাঁপাতে লাগল। মেঘের গর্জন শোনা গেল। বজ্রের ধ্বনিতে মন্দিরের দেয়ালগুলো ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। আকাশে মেঘের ঘনঘটার শব্দ।

ভেঙ্কান্না বলল, "কি হল কথা বলছ না কেন ?"

ভেঙ্কান্না বুঝল, রামুর উপর নীলাম্মা ভর করছে। দেবী কি বলে তা শোনার জন্য নিজের কান নিজের হাতে মূলে সে হাতজোড় করে বসে রইল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কিন্তু সলতে সামনের দিকে ঠেলবে কে ? আস্তে আস্তে প্রদীপটা দপ্‌দপ্‌ করে নিভে গেল। অন্ধকার মন্দির। কিন্তু সেই অন্ধকারের রূপ ভেঙ্কান্না দেখবে কি করে। তার মনে খুব আনন্দ হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নীলাম্মার কথা শুনতে পাবে এই আশাতেই সে ঠায় বসে ছিল।

ঝড় শুরু হল। মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল। ভেঙ্কান্না হাতড়ে হাতড়ে মন্দিরে ঢুকে গেল। মন্দিরের দরজা সে ভেজিয়ে দিল। কিন্তু ঝড়ের ধাক্কায় দরজা পরক্ষণেই খুলে গেল। দরজা বন্ধ করার খিল নেই। ঝড়ের তালে তালে দরজাগুলো ফট্‌ফট্‌ করে বন্ধ হচ্ছিল আর খুলে যাচ্ছিল। তার শব্দ মন্দিরের ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ভেঙ্কান্না সাষ্টাঙ্গে নীলাম্মার সামনে শুয়ে পড়ল। পড়তেই তার হাত প্রদীপের উপর পড়ল। বৃষ্টির ঝাপটায় তার জামাকাপড় ভিজে গেল। আস্তে আস্তে সে এককোণ থেকে অন্য কোণে গেল। সেখানে বসে হাতড়াতেই তার হাত ঠাণ্ডা জিনিসের উপর পড়ল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে একটু একটু করে হাতটা সরাতে লাগল। বুঝতে পারল সেটা রামুর শরীর। শরীরের কোথাও কোন উত্তাপ নেই। ঐ হিম শীতল দেহটাকে ভেঙ্কান্না বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "ওরে রামু, তোকে না খেতে পেয়ে মরতে হল। ওরে রামু, আমার রামুরে, মা নীলাম্মার কাছে আর কে প্রদীপ ধরাবে রে ! মা নীলাম্মা আর কার উপর ভর করবে রে ? ওরে রামু, তুই শেষে না খেতে পেয়ে মরে গেলি রামু !" ভেঙ্কান্নার আর্তনাদ মিশে গেল মেঘের গর্জনে, তার চোখের জল ভেসে গেল বৃষ্টির জলে।

একুশ

পরের দিন সকালে প্রকৃতির সেই ভয়ঙ্কর রূপ ছিল না। সূর্যালোকময় প্রসন্ন সকাল। প্রশান্ত প্রকৃতি। আগের রাত্রে যে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল তার চিহ্ন চারদিকে ছড়ানো ছিল। বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়েছিল যত্রতত্র। কোন কোন বাড়ির টিন, টালি উড়ে দূরে পড়েছিল। যেখানে সেখানে সে এক বীভৎস রূপ। রামুর জন্ম এই মাটিতে। মৃত্যুও তার এই মাটিতেই। নদীর তীরে সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

দুপুরে নদীতে বান এল। জলের সে কি গর্জন ! এক প্রান্তের শব্দ আর এক প্রান্তে শোনা যায়। তীর ভেঙ্গে বৈরী গ্রামে জল ঢুকে গেছে। গাঁয়ের মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিল। নবিরি গ্রামে নদীর তীর অনেক উঁচু। এই গ্রামে

কোনদিন নদীর জল ঢোকেনি। দক্ষিণ দিকটায় অনেক উঁচু উঁচু বালির ঢিপি আর গাছ থাকার ফলে জল যতই বাড়ুক নদীর জল কোনদিন নবিরি গ্রামে ঢোকেনি।

জল ক্রমশ উঁচু হতে লাগল। নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল গাছ, মরা গরু, কাঠ-কুটো, আরও অনেক কিছু। জলের গতি দ্রুত। ভালো ভালো সাঁতারুও সেই স্রোতে সাঁতার কাটতে পারবে না। নদীর সেই রুদ্র রূপ দেখে সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল। পাকা বাড়ির লোকের মনেও ভয় ঢুকল। নদীর জলের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। স্নিগ্ধ প্রবাহিত শান্তরূপিণীর সে কি বীভৎস ভয়ঙ্কর রূপ! কেউ কেউ মনে মনে নদীর উদ্দেশ্যে বলল, "কেন মা তোমার এই রুদ্র রূপ! এত গাছ পশু তুমি ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো মা? জ্যোৎস্নারাত্রে কি সুন্দর শান্ত রূপ তোমার দেখেছি! প্রবাহের সময় তোমার পায়ে আমরা নূপুরের ধ্বনি শুনেছি। তোমার ঢেউয়ের ফেনাগুলো আমাদের কাছে মণিমাণিক্যের মত লাগত। আর সেই তুমি এত নির্মম! এত নিষ্ঠুর! তোমার মধুর ধ্বনি শুনে তোমার পাশে যারা ঘর করে থাকে তাদের কথাগুলোও মধুর হয়ে ওঠে। ওরা তো মা তোমার কাছেই গান গাইতে শিখেছে। তোমার কাছেই শিখেছে ওরা কথা কইতে।

নদী যেন হাসল। গভীর অন্ধকারে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। নিরাশার মধ্যে আশার আলো। অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রদীপ্ত জ্যোতি। নদী যে বীভৎস হতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রশান্ত যে দুর্দান্ত হতে পারে তা জানানোর প্রয়াস। গ্রীষ্মে সে হয় নিঃস্ব। তার সবকিছু শুকিয়ে যায়। তার বুকে হাওয়া দিলে ওড়ে বালি। খাওয়ার জলও সে দিতে পারে না। তার বুক তখন খাঁ খাঁ করে। আবার সে ভরে ওঠে প্রাণপ্রাচুর্যে। দুকূল ছাপিয়ে সে ঘোষণা করে তার প্রাচুর্যের সংবাদ।

যে কোন দেশের ইতিহাস, যে কোন মানুষের জীবনের ইতিকথাই যেন নদীতে প্রতিবিম্বিত। জীবনের প্রতীক যেন নদী। জীবনে যেমন প্রাচুর্য আছে নদীতেও তেমনি। জীবনে যেমন দারিদ্র্য আছে নদীতেও তেমন আছে।

রামুর জীবনটা যেন নদীর মত। তার জীবনেও ঢেউ ছিল। উত্থান ছিল পতন হল। গ্রীষ্মের বংশধারা নদীর মতই সে সব হারিয়ে সব ভুলে নিথর হয়ে গেল। লোকটা চিরকালের মত হারিয়ে গেল।

নবিরি গ্রামে অনেকেই জন্মেছিল—অনেকেই মরে গেছে। তেমন কোন অভাব কেউ বোধ করেনি। কিন্তু রামুর অভাব অনেকেই বোধ করতে লাগল। নীলাম্বার মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানোর লোক আর রইল না। তার মুখ থেকে শোনা কথায় অনেকের ভারী বুক হাল্কা হত। তার মুখের কথা শুনে অনেকে সান্ত্বনা পেত। দেবীর নামে সে যা বলত তাতে অনেকের মনে ভবিষ্যতের আশা ধ্বনিত হত। তার কথা শুনে

কারও উপর রাগ হত না। কারও প্রতি ঘৃণা জাগত না। রামু মরেও নবিরি গ্রামের লোকের মধ্যে বেঁচে রইল। দু'মুঠো ভাত দেওয়ার সময় যে বৌমা মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলত তার সেই শ্বশুর রইল না। বাপকে কুরে কুরে যে খাবে ছেলেটার সেই বাপ আর নেই। বউমা যে স্বামীর উপর রাগ করে শ্বশুরের কাছে কিছু বলবে তার উপায় রইল না। এখন ওদের মনে মাঝে মাঝে জাগে যে বুড়োটা মন্দ ছিল না। ছেলের এখন মনে পড়ে বাপের কথা। একটু দুঃখ-টুঃখ পায়। বউমার অনুতাপ হয় শ্বশুরের প্রতি অনেক অবিচার করেছে বলে। মাঝে মাঝে বাপের কথা মনে পড়লে ছেলের চোখ ফেটে জল আসে। তাই বাপকে ভুলে থাকার জন্য তাকে এখানে সেখানে ছুটোছুটি করতে হয়। মনটাকে ভুলিয়ে থাকার জন্য বেশী করে খেনো মদ খেতে হয়। বেশী করে মদ খাওয়ার জন্য চুরিচামারি করেই হোক অথবা রোজগার করেই হোক বেশী করে টাকাপয়সা জোগাড় করতে হয়। যে কোনভাবে বাপকে তার ভুলতেই হবে। ফলে আরও বেশী করে বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। জ্বালা বাড়ে তার বউয়ের। চার বাড়ি ঝিগিরি করেও কুলোতে পারে না। মাঝে মাঝে বেপাড়ায় গিয়ে ভিক্ষে করে আসতে হয় তাকে।

একদিন সন্ধ্যের সময় রান্না সেরে বারান্দায় বসে নীলি তুলো বাছছিল। বুড়ি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। একটা না একটা কিছু করে। বুড়ির বয়সের তো গাছপাথর নেই। পেটে তেমন খাওয়াও পড়ে না। তাই ইদানিং সে যখন তখন জ্বরে পড়ে। সেদিন জ্বরটা কম ছিল। তাই এটা ওটা করতে আরম্ভ করে দিল। ভেঙ্কান্না ঠুকঠুক করতে করতে এল। তাকে একমুঠো ভাত আর একটু ফ্যান দিল নীলি। তখনও তার খাওয়া শেষ হয়নি। এমন সময় পিসার গলা শোনা গেল। পথে যাকে সে দেখতে পেল তাকেই সে বলতে লাগল, "ওরে শুদ্রকে ডাল খাওয়ালে কি হবে? আজ বাদে কাল তরবারি আর বন্দুক নিয়ে লড়বে কে? শুদ্র সবসময় খাবে মাংস। বন্দুক ধরা কি চাট্টিখানি কথা। সবসময় এক বগলে রাখতে হয় ভগবানকে আর অন্য বগলে থাকবে মদের বোতল। কি ঠিক বলিনি?"

হেসে ওরা মাথা নেড়ে চলে যেত। পিসা জোরে জোরে আরও নাটকীয় ভাবে বলত, "ঐ গর্মেণ্ট অল্প দামে ভালো জিনিসই দিত। চোরচোট্টাগুলো খারাপ জিনিস আমাদের কাছে বেশী দামে বিক্রি করে আমাদের জানে প্রাণে মেরে ফেলছে। সব জানি বুঝলে হে···সব খবর রাখি। আমার গর্মেণ্ট কক্ষনো খারাপ কাজ করতে পারে না।"

তার কথা শুনে সবাই হাসিমুখে মাথা নেড়ে চলে যায়নি। দু একজন পাল্টা প্রশ্ন করল, "তোমার গর্মেণ্ট চোরচোট্টাদের ধরে খাঁচায় পুরতে পারে না? কোনদিন তো তোমাকে মদ খেতে দেখিনি। আজ তোমার কি হল? একদিকে লোকে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর অন্যদিকে মোড়ল, তহশিলদার, মদের দোকানদার ফুলে ফেঁপে

বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। কি করে হচ্ছে ?"

পিসা হো হো করে হাসতে হাসতে হঠাৎ থেমে বলে, "কি কি বললে ? ধরছে না কেন ? আমার গর্মেণ্ট ওদের চিনতে পেরেছে···ওরে পাগল, শোন, উপরে আছে আমাদের গর্মেণ্ট। নীচে আছি আমরা। গর্মেণ্টও ভালো আমরাও ভালো। মাঝের লোকগুলো হল যত নষ্টের গোড়া। আল্লা ঠিক দেয় কিন্তু মাঝের মোল্লাটা দেয় না। আল্লা তাল দিলে মোল্লা আমাদের হাতে দেয় তিল। তহশিলদার গর্মেণ্টের কাছে ভুল হিসেব দেয়। ওরই কারসাজিতে পুল্লাইয়াকে হাজত খাটতে হয়। তবে এমন দিন তো চিরকাল থাকবে না দিন বদলাবে।"

অদূরেই বসে নীলির বাড়ির সামনে ভেঙ্কান্না খাচ্ছিল। ভেঙ্কান্নার পেট তখন খিদের জ্বালায় জ্বলছে। পেটে কিছু পরার পর তার আগুন কিছুটা নিভল। সে আর থাকতে না পেরে বলল, "হ্যাঁ তা আর বদলাবে না কেন ? উপরে ভগবান যখন আছে সুবিচার একদিন হবেই। তবে তার আগে আমরা ঘাটে যাবো। কাল রামু গেছে আর আগামীকাল আমরা যাবো। তবে এখন ভগবান চোখ বুজে বসে আছে।"

পিসা তার দিকে এগিয়ে এসে নীলিকে দেখতে পেয়ে বলল, "কিগো মা জননী, কাকে যত্ন করে খাওয়াচ্ছো ? এ ব্যাটা কি কম পাপ করেছে। যার যখন দিন শেষ হয়ে যাবে তখন যেতেই হবে। আমরা কি টেনে রাখতে পারবো ? সবই কর্মফল। যার পাপ তাকেই খায়।"

ভেঙ্কান্না উঠে "আসি মা" বলে লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চলল। দু'পা গিয়ে থেমে জোরে জোরে বলল, "যার পাপ তাকেই খায়। কথাটা ভালোই। তাই বলে নিরপরাধ ছেলেদের হাতে হাতকড়া পরানো ঠিক নয়। কুকুরদের মাথায় তুলে নাচা-নাচিও করা ঠিক নয়। সবাই জানে কে চোর। তবু ঐ চারটে চোরকে কেউ বেঁধে পঞ্চায়েত বসাতে পারছে না। খালি মুখে বড় বড় কথা।"

অনেকদিন পরে ভালো ভালো কথা শুনে পুল্লাইয়া খুব খুশী হয়ে বলল, "কি হল ভেঙ্কান্না, অত বকছ কেন ?" ভেঙ্কান্না যেতে যেতে আবার থেমে গেল। "দেখ বাবা পুল্লাইয়া, আমার পরে এই তুমি, তুমিই রাখলে গাঁয়ের নামটা। আমি তো অন্ধ হয়ে গেছি। তবে তোমার তো চোখ আছে। প্রাণ যায় যাক, নীতিতে অটল থাকবে। গাঁয়ে তোমার চেয়ে গরীব অনেক লোক আছে। ওরা ঝিমোচ্ছে। ওদের তোল, ঐ আধমরাদের জাগাও বাবা ! ওদের জাগালেই ভগবান জাগবে। ওরা না জাগলে ধর্ম জাগবে না। অন্যায় চলতেই থাকবে। এই ভাবেই পড়ে পড়ে মার খেতে হবে বাবা !"

ভেঙ্কান্নার কথায় পুল্লাইয়া নতুন করে উৎসাহ পেল। জবাবে কোন কথা বলল না। মল্লু কিন্তু তার ভেঙ্কান্না দাদুর একটা কথা না বলে পারল না, "মার শালাকে, দাদা পালিয়ে আয়।" এমন সময় পিসা সেখানে হাজির হল। মল্লু তার ঘাড়ে উঠে বলল, "মার শালাকে, দাদা পালিয়ে আয়।"

"বাঃ, বাঃ বেশ বলেছিস দাদু।" খুব খুশী হয়ে পিসা আবার বলল, "চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্তকে বল সাবধান হতে।"

মল্লু তাই বলল। পিসা আরও খুশী হয়ে তাকে আদর করল। নীলি তার কাছে গিলে আস্তে আস্তে বলল, "বাবা, তুমিও মদ খেলে?"

এই একটি কথায় পিসার নেশা যেন ছুটে গেল। যে কথা বুকে চেপে রেখেছিল তা যেন তক্ষুণি বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু পারল না। "মা" বলে থেমে গেল। ঢোঁক গিলে আস্তে আস্তে বলল, "এমনি কি আর খেয়েছি মা! দেখতে পারি না, একগাদা ছেলেমেয়ে, খেতে পাচ্ছে না। ঘরে থাকতে পারি না, শুনতে পারি না ওদের কান্না। যতক্ষণ নেশাটা থাকবে ততক্ষণ ভুলে থাকবো। এই ভুলে থাকার জন্যই খাওয়া মা। প্রাণে তো সুখ এলো না, এটা ওটা খেয়ে দুঃখকে ঠেকিয়ে রাখা আর কি।"

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। "আর কি, এই তো দিনকালের অবস্থা। দু'দিন পরে তোমার অবস্থায় পড়তে হবে।" এই কথাটা বলতে গিয়ে নীলির দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়া আর বলল না।

বাইশ

এক সেন্ট জমিও যখন হাতে নেই তখন বলদ রেখে কি হবে। তাই একের পর এক বলদ কেনার লোক আসছে। পাঁচবছর ধরে যে বলদগুলো তার কাজ করেছে তার হাতে খেয়েছে তাদের বিক্রি করতে পুল্লাইয়ার ইচ্ছে করল না। তাই সে বেশী দাম বলত। ক্রেতারা ফিরে যেতো। কয়েকদিন পরে নীলি বলল, "এভাবে বলদগুলোকে রেখে কি হবে? আর কিছুদিন পরে হয়ত ওদের খেতে দিতে পারব না। পেটে খিদে থাকলে ওরা কি বাঁচবে? আর কেন, বিক্রি করে দাও।" পুল্লাইয়াও মাথা নেড়ে রাজী হল।

পাশের গ্রামের চাষী এসে বলদগুলো কিনে দড়িতে হাত দিতেই মল্লু পথ আটকে দাঁড়াল। তার হাতে বেত। দড়ি ধরলে টান মারলেও বলদগুলো পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। নড়ল না। চাবুক মারার পর ওরা গোশাল থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল। নতুন মালিক ওদের পেছনে ছুটল। মল্লু যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। শুধু একবার "ঐ" বলে চেঁচিয়ে উঠল। তার সেই হাঁক পুল্লাইয়ার কানে গেল। তার মনে হল মল্লুকে বলদগুলো মাড়িয়ে দিতে পারে। সে তাকে রাস্তা থেকে সরে যেতে বলল। নতুন মালিক হকচকিয়ে বলদগুলোকে ধরার চেষ্টা করল। সে পারল না। তবে ওরা থেমে গেল। মল্লুর কথা শুনে। মল্লুর কাছে এসে বলদগুলো মাথা নাড়তে লাগল। মল্লু চিৎকার করে বলল, "বাবা এদের বাঁধো।"

পুল্লাইয়া এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সেখান থেকে সরে গেল। বলদগুলো ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আবার পিঠে চাবুক পড়তেই ওরা সামনের দিকে ছুটতে লাগল। হাতে বেত নিয়ে মল্লু বাপের কোলে ছিল। কোল থেকে সে নামতে চাইল। নতুন মালিক বলদদের নিয়ে যেতে লাগল। পুল্লাইয়া ছেলেকে কোলে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল। বাড়ির দিকে এগোতেই মল্লু সব বুঝতে পারল। সে কান্না জুড়ে দিল।

খিড়কির দরজা থেকে ওরা চলে গেল। ছেলেকে নাবাতেই সে পা ছুঁড়ে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। পুল্লাইয়া একদৃষ্টিতে গোশালের দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখের সামনে তখনও বলদগুলো নড়ছে। সে চোখ কচলে তাকিয়ে দেখে বলদগুলো আর নেই। তার মনে হল হাত-পায়ের কব্জি ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যেন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আর কোনদিন সে ফিরেআসবে না। এমন মনে হল তার। তার মনে হল সে চাষী নয়। একথাটা মনে হতেই তার খুব দুঃখ হল। তার ভেতরে যে চাষীর রক্ত আছে সে রক্ত যেন পাতলা হয়ে গেছে। সেই রক্তের তেজ যেন কমে গেছে। ভাবতে ভাবতে তার বুকটা যেন ভার হয়ে গেল। ছেলে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। তাকে তুলে একটা ন্যাকড়া দিয়ে তার গায়ের মাটি মুছে দিল। মুছে দেওয়ার পরেও তার গায়ে মাটি লেগে ছিল। "কাঁদছিস কেন বাবা। কালকে আবার ওরা বলদগুলোকে ফেরত দিয়ে যাবে।"

নদীতে বাপ-ব্যাটা চান করল। অদূরেই যে চাষীরা পুল্লাইয়ার বলদ কিনতে চেয়েছিল তাদের মধ্যে একজন বলল, "পুল্লাইয়া, বলদগুলোকে কত দামে বিক্রি করলে?"

"একশ পাঁচ টাকায়।" পুল্লাইয়ার এই কথা শুনে মল্লু বাপের দিকে তাকাল।

"বাবা, বলদগুলো আসবে না। তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ। তুমি না বললে, মিথ্যা কথা বললে মানুষ কানা হয়ে যায়?"

পুল্লাইয়া জবাব দিতে পারল না। মাথা নেড়ে নীচু করে রইল।

সেবছর পুল্লাইয়া বাধ্য হয়ে অন্যের ক্ষেতে কাজ করতে গেল। নিরুপায় হয়ে গেল বটে, কিন্তু কাজের কোন উৎসাহ তার ছিল না। মল্লু বাপের সঙ্গে লেগে থাকত। মাঝে মাঝে এলোপাথারি প্রশ্ন করত তাকে। এক একবার এক একটা প্রশ্ন শুনে দুঃখে বুক ভার হয়ে যেত। "মাত্র এক একর জমিও যদি থাকত শুধু ঘাম দিয়ে ফসল ফলিয়ে দিতাম।" কাজের তেমন চাপ নেই। বলদ বিক্রির টাকা চাল কিনতেই শেষ হয়ে গেল। সে না খেলে ছেলে খায় না। সে রোগা হয়ে যায় যাবে। কিন্তু ছেলের স্বাস্থ্য খারাপ না হয়ে যায়। রাজুর কাছে ধারের জন্য গেলে সে বলল, "আর কি হিসেবে তুমি পাবে? হিসেব টিসেব করে এসো যদি তোমার কিছু প্রাপ্য হয় দেবো।" পুল্লাইয়া ভীষণ অপমান বোধ করল। সুদের টাকা না দেওয়ার ফলে কি যে ওরা মাথামুণ্ডু হিসেব করে

তার কিছুই সে বুঝতে পারে না। নীলি দশ টাকা অনুরোধ করে ধার করে এনে ধান কিনল। সেই ধান ভানল। চাল বিক্রি করে দিল। একবেলা ওরা ভাত খেল। অন্যবেলা ফ্যান। কয়েকজন ধারে চাল কিনতে চাইল। কেউ কেউ ধারে নিয়ে গেল। যারা নিল তারা নিল। আর টাকা দিতে পারল না। নীলির দেখাদেখি আরও দশ বাড়ির লোক ধান কিনে ভেনে চাল বিক্রির ব্যবসা শুরু করে দিল। কেউ কেউ অন্য গ্রামে গিয়ে চাল বিক্রি করত। নীলি রাজুর বউয়ের কাছে অনুরোধ করে পঁচিশ টাকা এনে কাঠ কিনে বিক্রি করতে লাগল। দিনে এক বাঁক কাঠ অন্য গ্রামে গিয়ে বিক্রি করতে পারলে একটাকা দেড়টাকা লাভ হয়। এসব ব্যাপারে পুল্লাইয়ার গোড়ার দিকে কোন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু বউকে এতখানি উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে দেখে সে আর বেশীদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। কিন্তু কাজে নাবতে বড় লজ্জা করল। একদিন যে পুল্লাইয়ার লেঠেল হিসাবে সাতগ্রামে নাম ছিল তাকে আজ কাঠের বোঝা বাঁকে করে বিক্রি করে বেড়াতে হবে। তবু বউ ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকে বেরোতে হল। ক্রেতারা পুল্লাইয়ার মুখের দিকে না তাকিয়ে দর দাম করত। প্রথম দিনই যেন তার শরীরটা ভেতরে ভেতরে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কি করবে ? বউ ছেলেমেয়েদের প্রতি তো তার একটা কর্তব্য আছে। কদিন পরে কাঠ বিক্রি করা তার অভ্যেস হয়ে গেল।

পরিবারের অবস্থা দেখে একটা কথা ভেবে সে মনে মনে খুশী হল। আর যাই হোক তার অবস্থা পিসার মত চরমে উঠবে না। বউয়ের কথা মত চলতে তার ভালো লাগছিল। সে সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে যেভাবে বিচার করে তা পুল্লাইয়ার কাছে বাস্তব মনে হল। বউ যদি পরিশ্রম করে, সে পরিশ্রম করতে পারবে না কেন। জিনিসপত্রের দাম দিনকে দিন বাড়তে লাগল। তবে তার জন্য তার কিছু এসে যায় না। সেও এক টাকায় যত কাঠ বিক্রি করত তা এক টাকা চার আনায় বিক্রি করছে। বউ টাকায় এক আড্ডা (এক সের) চাল বিক্রি করে। তার এক একবার মনে হল কাঠের দাম আর একটু কমে বিক্রি করলে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে প্রশ্ন জাগল চারদিকে কাঠের যা দাম তার চেয়ে কমে আমি বিক্রি করব কেন। কিছুদিনের মধ্যেই এক বাঁক কাঠের দাম একটাকা চার আনা থেকে দেড়টাকা হয়ে গেল। এক বাঁক কাঠ বিক্রি করে সে পেত বারো আনা। "এক বেলা খেটেই বারো আনা পাচ্ছি।" মনে মনে বলে সে খুব আনন্দ পেল। তবুও কম দামে বিক্রি করতে তার ইচ্ছে করল না। এখন সে বুঝতে পারল রাজু আর ব্যবসাদার পেরাইয়া কিভাবে কত পয়সা করেছে। মাঝে মাঝে তার মনে হত সেও ব্যবসাদার। রামুর কথা তার মনে পড়ত। রামু বলত, মানুষ সবাই ভালো। তার কথাই ঠিক। এইভাবে পুল্লাইয়া ভাবতে লাগল।

তিনমাস এইভাবে চলল। আকালের সময় যারা টাকাপয়সা রাতারাতি করে

ফেলেছিল তারা নতুন নতুন ব্যবসায়ে টাকা খাটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। সাধারণত মোড়লরাই টাকাপয়সা গুছিয়ে নিল। আর সাধারণ চাষীরা পথে বসল। ওদের ছোট ছোট জমিগুলো ধনীরা কিনে ফেলল। ওদের ক্ষেতে যে ধান হল সেই ধান দিনের দিন কালোবাজারে চলে যেত। মোড়ল মাতব্বররা চাষীদের জমি ঝট্‌পট্‌ কিনে ফেলেছিল। কিনে ফসলও তুলল। সে ফসল কালোবাজারে বিক্রি করে অনেক পয়সাও করল। কিন্তু ঐ বিক্রির টাকায় নতুন জমি কিনতে না পারায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। একজন তো আর থাকতে না পেরে কালোবাজারে পাওয়া টাকায় রাস্তার ধারে একটা ধানকল বসিয়ে দিল। মিলের পাশে খুচরো চাল বিক্রির দোকানও সে করল। মাসখানেকের মধ্যেই যে দশটি পরিবার চাল বিক্রি করে সংসার চালাত ওদের ব্যবসা ডকে উঠল। চালের ব্যবসা করে ফ্যানের পয়সাও তারা তুলতে পারল না। সামান্য ধানও মিলে নিয়ে গিয়ে লোকে ভানিয়ে আনত। ধান ভানার জন্য পয়সা না দিলেও মালিকের কিছু যায় আসে না। খুদকুটো যা থাকে তাতেই তার হয়ে যায়। ফলে গাঁয়ের বুড়িরাও অল্প ধান থাকলেও চলে যেত মিলে। ইতিমধ্যেই মহাজনের বাড়িতে যারা দিনমজুরীতে ধান ভানত তাদের চাকরি গেছে। গাঁয়ের মানুষের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। মিলে ভানা ভাত নাকি খুব ফর্সা হয়। ঝরঝরে ভাত হয়। এইধরণের কথাবার্তা অনেকে বলতে লাগল। কিন্তু এর ফলে কত বাড়ির ভাতের হাঁড়ি যে শিকেয় উঠল তার হিসেব কে রাখে। মিলের মালিক আরও ধনী হল। মহাজনের বউ এতদিন ধান ভানিয়ে ফাঁকে ফাঁকে পয়সাকড়ি জমাত। সেও ধান ভানত পয়সার লোভে। আর সেই বউ বসে বসে খেয়ে সেজেগুজে আরামে থেকে অসুখে পড়ে গেল। তাকে দেখতে এল শহরের ডাক্তারের এক সহকারী ডাক্তার। ঐ ডাক্তার নাকি ইন্‌জেকশন দেয়। গাঁয়ের লোকে বলাবলি করল এই ডাক্তার ইণ্ডিশন্‌ দিয়ে রোগ সারায়। ছুঁচের মুখটা গায়ে না ঠেকালে পয়সাওলাদের কাছ থেকে পয়সা পাওয়া যায় না। তাই সেই ডাক্তার আস্তে আস্তে গাঁয়ে বসে রাতারাতি যারা টাকাপয়সা করে ফেলেছিল তাদের সবাইকে দেখতে লাগল। খোসপাঁচরা হোক, কালাজ্বর হোক চলল ইণ্ডিশন্‌। ইণ্ডিশনের ছুঁচ ঠেকালেই শরীরের ভেতরে জল হোক ওষুধ হোক গেলেই রোগ সেরে যেত। একবার ইণ্ডিশন দিলে রোগীর সব মিলিয়ে খরচ পড়ত তিন টাকা। ওরা দেখত ডাক্তার এ্যাম্পুল কাটছে কিনা। এ্যাম্পুলে জল আছে কি ওষুধ আছে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।

নীলি ও পুল্লাইয়ার ব্যবসাতেও টান পড়ল। ওদের চালের ব্যবসা ডকে উঠল। রইল খালি কাঠের। তাতেও আগের বাজার নেই। আগে যেমন একটা দুটো গাছ বিক্রি হত সেই গাছ কেটে কাঠ বিক্রি করে পুল্লাইয়া পয়সা পেত। এখন একটা দুটো গাছ বিক্রি হয় না। বড় বড় বাগানকে বাগান কণ্ট্রাক্ট নিয়ে নেয় বড়লোকেরা। বিরাট বিরাট বাগান মাত্র তিন চারজন বড়লোকের হাতে আছে। ওরা গাছ কেটে নিয়ে

যায়। পুল্লাইয়ার মত ছোট ছোট কাঠের ব্যবসাদাররা খুব জোর গাছের গোড়া পেতে পারে। বালির উপর ঐ গাছগুলো থাকাতে অনেকখানি খুঁড়ে বালি আর পাথর সরিয়ে গুঁড়িগুলো তুলতে হয়। পরিশ্রম অনেক বেশী হয় তাতে। এত কাণ্ড করে বিক্রি করে যা হয় তাতে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। পরিশ্রম বেশী পয়সা কম। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই পুল্লাইয়ার শরীর ভীষণ ভেঙ্গে গেল।

একদিন সকাল দশটায় কুড়ুল আর করাত নিয়ে গাঁয়ের দক্ষিণদিকের বাগানে পুল্লাইয়া গেল। সেই সময় মল্লু বাড়িতে ছিল না। গাঁয়ে একটা মুসলমান বাঁদরের খেলা দেখাতে এসেছিল। সব ছেলেমেয়ে সেই খেলা দেখতে ছুটে গেল।

পুল্লাইয়া কাজের জায়গায় গিয়ে কুড়ুল আর করাত রেখে দিয়ে কষে ল্যাঙ্গট বেঁধে নিল। করাত নিয়ে একমনে কাঠ চিড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাজে ডুবে গেল।

রোদ মাথায় উঠল। তার ঘামে বালি ভিজতে লাগল। পাশের গাছে পাখিগুলো গরমে আর রোদে কিচির্মিচির করতে লাগল। দূর থেকে একটা কাক অনেকক্ষণ ধরে কা কা করতে লাগল। অনেকদূরে একটা কাক হয়ত ছিল। একটা গর্ত থেকে শেয়াল বেরিয়ে ছুটে গেল।

পুল্লাইয়া এসব দেখেনি। কোন শব্দই তার কানে আর যাচ্ছে না। অদূরে প্রবাহিত নদীর কুলুকুলু ধ্বনিও তার কানে গেল না।

কখনও খুঁড়ে কখনও কুড়ুল চালিয়ে গাছের গোড়ায় অনেকখানি মাটি আর বালি তোলা হয়ে গেল। গর্তটা বেশ বড় হল। গর্তে নামার আগে চারদিকে একবার দেখে নিল। কুড়ুল কাঁধে নিয়ে গর্তে নামার আগে চারদিকে তাকিয়ে একটি লোককেও দেখতে পেল না। নেমে উপরের দিকে তাকাল। উপরের দিকে তাকাতে পারল না। ঠিক তার চোখের দিকে সূর্য তাকিয়েছিল। ঝট্ করে চোখ বুজে তার মনে হল তাকে কে যেন ডাকছে। সে যেন একটা কুয়োর ভেতরে ছিল। ভাবল, হয়ত কেউ ডাকছে কোথাও। পরমুহূর্তেই মাত্র কিছুদিন আগে মরে যাওয়া আপ্পান্নার কথা তার মনে পড়ল। যত কাজে মন বসাতে যায় ততই আপ্পান্নার ছবি তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আপ্পান্নার সঙ্গে তার যেন অনেক মিল ছিল।

আপ্পান্না তারই মত খুব পরিশ্রমী ছিল। মহাজনের হাতে তার জমি চলে গেল। বাকি যে এক একর জমি ছিল সেই জমিটাও মোড়ল অসৎ উপায়ে হাতিয়ে নিল। তিনটি ছেলেমেয়ে ছিল তার। বউও ছিল। বড়ছেলে মল্লুর বয়সী। আপ্পান্না ছেলেকে ডাকতো বাবা বলে, ছেলেও বাপকে একইভাবে ডাকতো। সেও তারই মত কাঠ বিক্রির ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল। গতবছর গ্রীষ্মকালে ঐ পাশের বাগানে ঠিক এই ধরণের একটা গর্তে সে নেমেছিল···ঠিক এই দুপুরে···নীচে নেমে কুড়ুল দিয়ে গাছের গোড়া কাটার সময় চারদিক থেকে হুড়হুড় করে বালি পড়ে তাকে ঢেকে দিল। একটা

জ্যান্ত লোককে বালি পুঁতে ফেলল। শেষবারে সে নাকি একবার "বাবা" বলে আর্তনাদ করেছিল। "আমাকে তোল" বলেও নাকি চিৎকার করেছিল। ভরদ্বপুরে আজও নাকি লোকে এই পথে যাওয়ার সময় শুনতে পায় "আমাকে তোল"। হয়ত সেই এখন চিৎকার করে ডাকছে। হ্যাঁ ঐ তো তারই গলা ক্রমশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। হয়ত আপ্পান্না তারই দিকে এগিয়ে আসছে। এই তো বালি একটু একটু গড়িয়ে পড়ছে। হয়ত সে এসে গেছে। কিন্তু আপ্পান্না তো আমারই মত ছিল। সে আমাকে মেরে ফেলতে চাইবে কেন। আপনমনে পুল্লাইয়া বলে উঠল, "দূর মরা মানুষকে পুল্লাইয়া ভয় পাবে।" গাছের গোড়ায় দু'বার জোরে জোরে কুড়ুল দিয়ে মেরে কাটল। লক্ষ্য করল উপর থেকে বালি গড়িয়ে তার মাথায় পড়ল। বালি ঝেড়ে উপরের দিকে তাকাল সে। তখনও সে শুনতে পাচ্ছিল "বাবা" "বাবা" বলে চিৎকার। যে ডেকেছিল সে যেন ডাকতে ডাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। ডাকটা যতই পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল ততই তার মনে মরার ভয় দানা বাঁধছিল, "আমি মরে গেলে আমার ছেলেমেয়ে বউকে কে দেখবে ?"

আর তার সাহসে কুলোল না। ঐ গর্তে বসে আর কাজ করতে পারল না। সে জানে ঐ গোড়া কেটে, ঐ কাঠ বিক্রি না করলে সেই রাত্রে ওরা কিছুই খেতে পাবে না। তা সত্ত্বেও সে ঐ গর্তে একমুহূর্তও থাকতে পারল না। বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। চারদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। শুধু সেই ডাক যেন তখনও শোনা যাচ্ছিল। কুড়ুল আর করাত কাঁধে ফেলে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। দশ-পা এগোতেই চমকে উঠল। এখন সেই ডাক কানে যেতেই উৎসাহে আনন্দে তার মন ভরে যেতে লাগল। বালিতে দুটো পা ডুবে গেছে মল্লুর। গরম বালিতে তার প্রায় অর্ধেকটা শরীর ডুবে গিয়েছিল। যত উঠতে গেল তত সে ডুবতে লাগল। তত সে পুরতে লাগল। পুরতে পুরতে সে প্রাণপণে ডাকছিল বাবাকে। পুল্লাইয়া একলাকে সেখানে ছুটে গিয়ে ছেলেকে বালি থেকে একটানে তুলে ফেলল। তুলেই কোলে জড়িয়ে ধরল। বাপের আর ছেলের ঘাম মিশে একাকার হয়ে গেল।

তেইশ

দিনকে দিন পুল্লাইয়া রোগা হয়ে যাচ্ছে। কোনদিন যে চিন্তাগুলো তাকে পীড়িত করত না সেগুলো যেন আজ তার সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। সারা গ্রামের লোকের অবস্থা প্রায় এক। কাজ নেই যে করে, খই নেই যে ভাজে। পরিশ্রম করে কাঠ বিক্রি করত তাতেও চলছে না। সে তো হচ্ছেই, সঙ্গে তার ছেলেমেয়েও রোগা হয়ে যাচ্ছে। দিনরাত তার এক ভাবনা, ভবিষ্যতে কি হবে। নীলির মনে দুশ্চিন্তা স্থান

পায় না। মাঝে মধ্যে তা উঁকি মারলে সে তৎক্ষণাৎ মন থেকে সেটা সরিয়ে ফেলে। মুহূর্তের জন্য তার চরকা ঘোরানো থেমে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চলতে থাকে।

গ্রামে যেন ধারদেনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। নীলির কাছে যারা ধার নিয়েছিল তারা মুখ ফুটে কিছু না বললেও মনের ভাবটা যেন, "আমাদের আর কি আছে? কি দিয়ে মেটাবো ধার?" কেউ ব্যবসাদার পেরাইয়ার কাছে দু আড্ডা (দু সের) চাল ধার আনতে গেলে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলে,"বাড়িতে থেকেও আমি যদি না বলে থাকি তো আমি ডোমের বাচ্চা।" সেদিন ওর এই কথা শুনে পুল্লাইয়ার গা জ্বলে উঠেছিল। সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, "তুমি তো নিজেই মেথর আবার ডোম হবে কি?" পুল্লাইয়ার এই কথা সে বয়স্ক লোকদের বলে বেড়াল। কিন্তু তাতে তেমন কোন কাজ হল না।

মল্লু রোগা হয়ে যাওয়াতেই বাপের যত দুশ্চিন্তা। এক একবার মল্লু খেতে বসে আরও ভাত বা ফ্যান চাইলে পুল্লাইয়ার ভীষণ দুঃখ হত। মনটা তার ভীষণ দমে যেত।

বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে গাঁয়ে পুল্লাইয়ার যে গৌরব ছিল তার একশভাগের একভাগও এখন আর নেই। আগে গ্রামে কিছু হলে, সে বয়সে ছোট হলেও তার ডাক পড়ত। বিয়ের আগে গাঁয়ের পুজোপার্বনে উৎসবে সে কি কম খরচ করেছে। তখন দুহাতে খরচ করেছে বলেই বিয়ের জন্য তাকে ধার করতে হল। এখন সে দিনমজুর। চারজন অবস্থাপন্ন চাষী অথবা মহাজনদের কথামত কাজ করতে হয়। সারাদিন খেটে সন্ধ্যের সময় চুবড়ি করে ধান আনতে হয়। ওটাই মজুরী। তারই যখন এই অবস্থা, তার ছেলের অবস্থা কি হবে। এইভাবেই দিনকালের অবস্থা থাকলে পরিণতি কি হবে। পুল্লাইয়া ভাবতে লাগল কিভাবে কি করলে ছেলেকে দাঁড় করানো যাবে। "চুরি করব? না, মরে গেলেও চুরি করব না। ছেলে মেয়ে বউ না খেতে পেয়ে মরে যাক তবু ওপথে যাবো না।" আপনমনে বলে ওঠে সে।

মাঝে মাঝে ভাবতে ভাবতে সে কুঁকড়ে যায়। আবার কখনও পয়সাওলাদের ধুয়ে দেয়। যাদের কিছুই নেই তারা তাদের আর কি সাহায্য করবে। আর যাদের আছে অনেক কিছু তারা তার আচরণে সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় তার ক্ষতি হোক। তার ক্ষতি করার জন্য তারা ওৎ পেতে থাকে।

একবার পিসার বাড়ির সামনে কথার পিঠে কথা উঠল। গুড়িড ভেঙ্কান্না বলল, "গাঁয়ের সবাই এক না হলে দিন বদলাবে না। এই গাঁয়ে চারটে খুন না হলে গরীব লোকের পেটে ভাত পড়বে না।" পুল্লাইয়া তার কথায় আপত্তি করল না।

পিসা হাসতে হাসতে বলল, "আচ্ছা অত মাথা নীচু করে বসে থাকার কি আছে? আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে কেউ কি তুলে নিয়ে গেছে যে গালে হাত দিয়ে বসে থাকব? দেখই না, কি হয়? চারজনের আশা এখন বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হচ্ছে। আশার ঐ বেলুনটা ফুলতে ফুলতে একসময় তো ফেটে যাবে।

ধৈর্য ধরে দেখ না—সবুরে মেওয়া ফলবে। এখন আমরা কষ্ট করছি কিন্তু কষ্ট না করে কে কবে কৃষ্ণকে পেয়েছে বল।"

কথাটা ওদের দুজনের কারও পছন্দ হল না। ওরা অনেকক্ষণ কথা বলে ঠিক করল যে জিনিসপত্রের দাম অন্তত অর্ধেক কমাতে হবে। তবে তা মুখের কথায় হবে না। কথায় যে হবে না এ ব্যাপারে সবাই একমত হল।

ভেঙ্কান্না দ্বারে দ্বারে ঘুরে কথায় কথায় এসব কথা শোনালে কেউ কেউ বলত, "তুমি অন্ধ, অন্ধের মত থাকো। তোমাকেও তো ওদের দোরে যেতে হয় ফ্যান চাইতে। এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর তোমার কি দরকার। এসবের সমাধান কি অন্ধলোকের কাজ?" ভেঙ্কান্না মনে মনে বলত, "ভেড়ার দল। মানুষের রক্ত এত ঠাণ্ডা হয় না।"

পুল্লাইয়া বাড়ি ফিরে এল। সে বেলা উনুনে আঁচ পড়েনি। তা জানতে পেরে ছেলের পাশে বসে রাজু আর গ্রামের বড়লোকদের যা নয় তাই বলে খিস্তি করতে লাগল। শুনে বুড়ি বলল, "মুখ খারাপ করে কি হবে বাবা? বাচ্চা ছেলেটার সামনে ওসব কথা বলে ওর মনটাকে ছোট করে কি লাভ? তোমার যত জ্ঞান আছে ঐসব বড়লোকদের কি আছে? ওদের বাড়িতে ভায়ে ভায়ে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি। আমাদের ঘরে তো তা নেই। ওদের চেয়ে আমরা অনেক শান্তিতে আছি।"

পুল্লাইয়া ফোঁস করে উঠল, "এককোণে বসে আছো বসে থাকো। তুমি এসবের কি বোঝ।" বুড়িও ছাড়ার পাত্রী নয়। সে বলল, "দেখ বাবা, বেশী বিরক্ত হয়ো না। মনটাকে একটু ঠাণ্ডা রাখো। মেজাজ গরম হয়ে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। অমানুষ হয়ে যায়। যা চলছে চলুক। যা হচ্ছে হোক। তুমি কি তা বদলাতে পারবে। মানুষ হয়ে জন্মেছ চারজনে তোমাকে ভালো বলবে এটাই তো তুমি চাও। কথায় কথায় রেগে গেলে কি লোকে তোমাকে ভালো বলবে?"

এসবের একটি কথাও পুল্লাইয়ার কানে যায়নি। তবে যে দু'চারটি শব্দ তার কানে গেছে তাতেই তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। সে বলে উঠল, "তোমার আর কি? আমরা খেতে পাই না পাই তোমার পেটে তো দুবেলা ফ্যান হোক ভাত হোক পড়ছে। পেটে কিছু থাকলে ভালো ভালো কথা সকলেরই বেরোবে।···কোত্থেকে এসে যে আমার গলায় কাঁটা হয়ে রইল···" বলতে বলতে পুল্লাইয়া বেরিয়ে গেল।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে নীলি সেখানে এসে দাঁড়াল। বুঝল, কিছু একটা ঘটে গেছে। বুড়ির দিকে তাকাল নীলি। সে ফোকলা দাঁতে মাথা নাড়তে নাড়তে হাসল। বুড়ি হাসল বটে, কিন্তু নীলি জানে ঐ কথাগুলো ছুঁচের মত তার বুকে বিঁধেছে। আসলে মাস দুয়েক ধরে বুড়ির পেটে দু'বেলা ঠিকমত কিছু পড়ছে না। দু'দিন অন্তর জ্বর হচ্ছে। জ্বরের সময় একফোঁটা জলও দেওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় স্বামীর কথা যে কত মিথ্যা তা নীলি জানে। স্বামী যা বলেছে তার জন্য বুড়ির কাছে নীলি ক্ষমা চাইতে চায়। তাই সে বুড়ির পাশে বসল। ক্ষীণকণ্ঠে থেমে থেমে ভয়ে ভয়ে দিদিমাকে

বলল, "রাগের মাথায় বলে ফেলেছে···এসব কথা তুমি মনে রেখো না দিদিমা।"

বুড়ি মাথা তুলে নীলির দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল তার নাতনীর চোখে জল। নাতনীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বুড়ি যেন তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সার সংকলন নাতনীর হাতে তুলে দিল, "জানিস দিদু, আমিও আগে অন্যদের দোষ নিয়ে মাথা ঘামাতাম। চারজনের কাছে অন্যদের বিরুদ্ধে বলে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগত। কিন্তু বলতাম না। তা সে তোর দাদুর বিরুদ্ধেই হোক আর অন্য খারাপ লোকদের বিরুদ্ধেই হোক। বরং আমি খারাপদের ভালো বলে চারজনকে বলতাম। তার ফলে কজন খারাপ লোক ভালো হয়েছে জানি না। তবে আমি খারাপ হইনি। আমার ভাগ্যও খারাপ হয়নি। তা না হলে আজ আমি থুথ্‌ড়ে বুড়ি হয়েছি। কিন্তু কোন কষ্ট তো পাচ্ছি না। বরং সুখেই আছি। সবাই বলবে আমি যত কষ্ট করেছি তত কষ্ট কেউ করেনি। আমি যত কষ্ট পেয়েছি তত কষ্ট কেউ পায়নি। তবে আমি জানি আমার চেয়ে সুখী মেয়ে জগতে আর একটিও নেই। মাটির হাঁড়ি থেকে খাবারটাকে তুলে এই চামড়ার হাঁড়িতে ফেলা, এই তো। নেহাৎ এটা চামড়ার হাঁড়ি, তাই এখনো আছে। আর কতকাল থাকবে কে জানে।" বুড়ির প্রত্যেকটি কথা নীলির মনে গাঁথল। আর কথা না বাড়িয়ে নীলি বুড়ির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে পুল্লাইয়া চোল্লু আটা নিয়ে এল। নীলি রান্নার জোগাড় করল। পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে বুড়ি হেসে বলল, "বাবা, তুমি যে কত ভালো ছেলে তা বিয়ের সময় আমি বুঝেছি। তোমার মন অত ভালো না হলে বিয়ের সব খরচ দিয়ে তুমি আমার নাতনীকে বিয়ে করলে। আমাকে এনে যত্ন করে রেখেছ। আমি মরে গিয়ে আবার তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব। তখন তোমার এ ঋণ শোধ না করে কি ছাড়ব।" পুল্লাইয়া এত লজ্জা পেল যে আর সেখানে বসে থাকতে পারল না।

অন্ধকার হলে পুল্লাইয়া কাঠ বিক্রি করে বাড়ি ফিরল। এসে দেখে পিসা পরিবারের সুখদুঃখের কথা বলে যাচ্ছে। সব কথাই সে বলল। কিন্তু মনের কথাটি বলতে পারল না। নীলিকে তার বলার ইচ্ছা ছিল, "একটু ফ্যান দেতো মা। খেয়ে পেটের জ্বালাটা মেটাই।" বলবে কি করে। সে তো জানে নীলির ঘরের অবস্থা। যাওয়ার আগে পুল্লাইয়াকে বলল, "ভাবছি কি জানো, হঠাৎ এক রাত্রে যদি আমার বাড়িতে আগুন ধরে যেত, সবাই যদি পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম, মাটিটা উর্বর হত। রাতারাতি ভূমিকম্প হলেও মন্দ হত না। কোনরকমে মাটির ভেতর চলে গেলেই তো পালা শেষ।"

নীলির কানে কথাগুলো গেল। সে তাকে ডেকে বলল, "এই চার আনা দিয়ে চোল্লুর আটা কিনে রাত্রের মত কোনরকমে চালিয়ে দিন।" তার পয়সা দেওয়া এবং বলার সময় পুল্লাইয়া নীলির দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তের আনন্দে

পিসার মুখটা কুলোর মত বড় হয়ে গেল। পিসার ছুটে চলে যাওয়ার পর নীলি বলল, "আমি ওঁকে বলেছি জানো, ওঁর দুটো ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিতে। দুটো ছেলে দু'বাড়িতে কাজ করুক। কিছু তো পাবে। অন্তত তাদের নিজেদের পেট তো চলবে। অভাবের দিনে কষ্ট করে কোনরকমে তো চালাতে হবে। অতগুলো যখন ছেলে আছে, ছেলেদের দৌলতে ভবিষ্যতে ভালোই থাকবে। সুখে থাকতে পারবে।"

বউয়ের কথা পুল্লাইয়ার ভালো লাগল না। হাতে যা টাকা পয়সা ছিল তা নিয়ে নীলি পেরাইয়ার দোকানে গেল। পরের দিন সকালে বুড়ি "হরে রাম" গানটা গাইতে লাগল। কাছে বসে ছিল মল্লু। তিনদিন পরে বুড়ি নুয়ে নুয়ে তিন চার বাড়িতে ঘুরে একথা সেকথার পর বিদায় নিল। ওদের বলল, "আবার নাতনীর পেটে আসছি। তবে আসতে হলেও তো যেতে হবে। যাওয়ার জন্যই আসা। রাজুর বাড়িতে গেল বুড়ি। রাজু আর তার বউ বুড়িকে সসম্মানে বসাল। রাজু বলল, দেখ তো দিদিমা, তোমার পুল্লি কথায় কথায় আমার বিরুদ্ধে বদনাম রটায়। ঐ অন্ধ ভেঙ্কান্না নাকি আমার বাবা। আমার নাকি মানসম্মান নেই। তুমিই বল আমি ওর কি অপকার করেছি ? ওকে তো ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কি ওকে ছাড়িয়ে আনিনি। পেট জ্বলছে বললে আমি কি ওকে চাল মেপে দিইনি। যা সামর্থে কুলোয় দি। আমার আর কতটুকু আছে। আমার চারটে ছেলে। চার ছেলেকে সম্পত্তি ভাগ করে দিলে আমার আর কি থাকবে। এক একজনের ভাগেই বা কতটুকু পড়বে। ঐ জমিটাকে নিজের নামেই লিখে রেখেছি। কারণ ছোট ছেলেটা তো মাইনর। তেমনভাবে আমাকে বুঝিয়ে বললে আমি কি আর ব্যবস্থা করতাম না। তবে বলার মত বলতে হবে তো।"

বুড়ি বলল, "দেখ বাবা, যার ভালোমন্দের ফল তার সঙ্গেই থাকে। একজনের পেটে আমরা লাথি মারলে অন্যেরা আমাদের পেটে লাথি মারবে। এই সংসারে খাঁচায় আমরা যেন এক একটি ইঁদুর। নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছি। প্রদীপে যতটুকু তেল দরকার ততটুকুই তেল দিতে হবে। ঐ তেলটা টাকা পয়সা নয়, ভালোবাসা। আমি তো বাবা আজ আছি কাল নেই। আমার চোখে তুমি আর পুল্লাইয়া সমান। তুমিও ভালো আর পুল্লিও ভালো।"

যাওয়ার আগে বুড়ি রাজুর হাত ধরে বলল, "বাবা, আমি আর বেশীদিন নেই। আমি মরে গেলে তুমি একটু কাঁধ দিও।" রাজু তৎক্ষণাৎ বুড়ির কাঁধে হাত রেখে বলল, "তোমার কোন ভাবনা নেই দিদিমা। তোমার সব খরচ আমি বহন করব মা।" বুড়ি হাসতে হাসতে রাজুর মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সকালে বুড়ি নীলাম্মার মন্দিরের সামনে মাথা ঠুকে প্রণাম করল। চোখ বড় বড় করে নদীর জলের দিকে তাকাল। সাঁকোর দিকে তাকাল। গাঁয়ের যা কিছু দেখতে পেল সব দেখল। উঠোনে বসে যারা যাতায়াত করছিল তাদের ডেকে ডেকে

কথা বলল। ভালো ভালো কথা বলল। কাউকে আদর করল, কাউকে আশীর্বাদ দিল। এইভাবে এক সপ্তাহ কাটল। আরও ভোরে উঠতে লাগল। উঠে কীর্তন গাইতে লাগল। ঠাকুরের নাম করতে লাগল। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, "তুমি এনেছ ঠাকুর, তুমিই বড় করেছ, তুমি যা বলেছ করেছি। তুমি যেদিনই নিয়ে যাবে সেদিনই আমি খুশী মনে চলে যাব।" সকালে সূর্যদেবকে প্রণাম করল।

সেদিন সারা আকাশ ছিল মেঘলা। সারাদিন টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি। বিদ্যুতের মাঝে মাঝে ঝলকানি। বুড়ির গায়ে জ্বর। এককোণে শুয়েছিল সারাদিন। মাঝরাত্রে উঠে বুড়ি এদিক ওদিক তাকাল। কোন সাড়াশব্দ নেই। সবাই ঘুমোচ্ছে। দরজা খুলে বারান্দায় এলো। আকাশের দিকে তাকাল। কয়েকটি তারা মিট্‌মিট্ করছিল। মেঘগুলো এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। এখনও সে আকাশে তারা দেখতে পায়। বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঝিমুনি পেল।···স্বপ্ন দেখল সে পূর্বপুরুষদের···আত্মীয় স্বজনরা আসছে চলে যাচ্ছে ···তার স্বামী···মারা যাওয়া ছেলেমেয়েগুলো···ওরা বুড়িকে ডাকল···পুষ্পরথ এসে দাঁড়াল···ঘোড়া···পক্ষীরাজ ঘোড়া আকাশে উড়ছে···এসব কিছুই তাকে কে যেন দেখাচ্ছিল।

বুড়ির ঝিমুনি কেটে গেল···ঘুম ভেঙ্গে গেল তার···ভাঙ্গার পর দেখতে পেল তার সামনে আলো আছে···চারটি প্রাণী তাকে ঘিরে বসে আছে···নাতনী কাঁদছে···মল্লু ডুকরে ডুকরে কাঁদছে···মল্লুর বোন বুড়ির গায়ে হাত দিচ্ছে আর তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বুড়ি অনেক কষ্টে একটু হেসে নীলিকে বলল, "মা, 'মাগো, নীলাম্মা,"··· তারপর তার সেই হাত নীলির সারা গায়ে ঘুরতে লাগল। শেষ দু'ফোঁটা অশ্রু বুড়ির চোখ থেকে গড়াল। বুড়ি থেমে থেমে বলল, "আমার দিদু, ভাতের হাঁড়ি তুলতে গেলে হাত পুড়ে যায়। তাই বলে হাঁড়িকে ফেলে দেয়না। ধৈর্য ধর মা···পুল্লাইয়া লক্ষ্য রেখো তার হাত থেকে যেন হাঁড়ি পড়ে না যায়। আর কি বলব দিদু···আমার কিচ্ছু নেই···কি দেবো।" তারপর বুড়ি এক এক করে সকলের দিকে তাকাল। নীলি, মল্লু, পুল্লাইয়া আর মল্লুর বোন। কোত্থেকে রাজুও এসে সেখানে বসল। বুড়ি হাসি-মুখে ঐভাবে সকলের দিকে তাকাতে তাকাতেই হঠাৎ ঘাড় কাৎ করে ফেলল।

চব্বিশ

মাঝে মাঝে মেঘের ঘনঘটা। দু'একবার বৃষ্টিও হচ্ছে। শীতকাল ঠিক শুরু হয়নি। তবে শেষরাত্রে শীত করে।

একদিন রাত্রে অন্ধকার যেন ছেয়ে গেল। আকাশে সমস্ত মেঘের রং যেন কালো হয়ে গেল। সঞ্জীবের খিড়কির দরজায় একটা আর্তনাদ শোনা গেল। চোরের চুল ধরে ঐ অন্ধকারেই সঞ্জীব দমাদম মারল। চোর মাথা নীচু করে রইল। বউ লম্ফ ধরাল কিন্তু হাওয়ায় নিভে গেল। অনেক লোক জমে গেল পুল্লাইয়া আর মল্লুও সেখানে ছুটে গেল।

যারা জড়ো হল সেখানে তাদের মুখে নানান কথা। প্রত্যেকেই একবার করে চোরটাকে মারার চেষ্টা করল।

"আমার মাসকলাই এই ব্যাটাই হয়ত চুরি করেছে।"

"আমাদের মোরগ-মুরগী নিশ্চয় এই চুরি করেছে।"

"শালা চোট্টা, খেতে না পাস ভিক্ষে করবি। তাই বলে লোকের বাড়িতে চুরি করবি।"

প্রায় এই ধরণের কথাও মেয়েদের মুখে শোনা গেল। চোরটা নাকি তিনদিন কিছু খায়নি। শুধু সে নয়, তার ছেলেমেয়েদের পেটেও নাকি তিনদিনের মধ্যে কিছু পড়েনি। বাচ্চাদের কান্না সহ্য করতে না পেরে মাঝরাত্রে সে চুরি করতে বেরিয়েছে। সঞ্জীবদের খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকা সহজ ছিল। ওদের রান্নাঘরে যে ফ্যানটা ছিল সেটা খেয়ে পান্তাভাতের হাঁড়িটা নিয়ে পালাতে যাবে এমন সময় সে ধরা পড়ল। ঐ হাঁড়িতে যে ভাতটা ছিল তাতে দু'বেলা বাচ্চাদের খাওয়ানো যেতো। কিন্তু পারল না। চোর ধরা পড়ল।

এত লোকের এত কথা তার কানে যায়নি। এত যে মার খেলো সেটাও তার গায়ে লাগেনি। সবটাই যেন তার কাছে দুঃস্বপ্ন। খিদের জ্বালায় এমনিতেই তার পেট জ্বলছিল। মার খেতে খেতে সে শুধু "খিদে খিদে" বলে চেঁচাচ্ছিল। সে যত "খিদে খিদে" বলে চেঁচাতে লাগল লোকে তত "দাঁড়া খিদে মেটাচ্ছি" বলে মারতে লাগল। সঞ্জীব রেগে গিয়ে বলল, "খিদে, শালা ঢং-এর কথা বলছ। ভেবেছ খিদে বললেই ছেড়ে দেব।" বলে তলপেটে কষে এক লাথি মারল। চোর "মাগো" বলে মাটিতে পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজুর বাড়ি থেকে হ্যারিকেন এল। হ্যারিকেনের আলোতে চোর দেখতে গিয়ে সবাই দেখল পিসাকে। কারও মুখে কোন কথা নেই। সকলের হাত যেন অবশ হয়ে গেছে। সেই আলোতে পিসাকে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সৈনিকের মত দেখাচ্ছিল। একমাত্র খিদে পারল পিসাকে এইধরণের পরিস্থিতিতে ঠেলে দাঁড় করাতে। এত লোক যে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সেদিকে পিসার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তখনও লজ্জার মাথা খেয়ে বলছে, "খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।"

সঞ্জীবের বউ একটা বাটিতে ভাত ঢেলে ফ্যান দিয়ে ভরে পিসার সামনে আনল। তাতে সে নুন দিতে ভুলে গিয়েছিল। পিসা চোখের পলকে সব সাবাড় করে দিল। শেষ ভাতের দানাটি খেয়ে "মা মাগো" বলে মাথা তুলে সকলের দিকে একবার

তাকাল। সামনেই দেখতে পেল, মল্লু, পুল্লাইয়া, সঞ্জীব, রাজু···সারা গাঁয়ের লোককে। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল সে। মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল তার। ইতিমধ্যে কাকের বাসার মত মাথা নিয়ে ছেঁড়া শাড়ি গুছিয়ে পরে পিসার বউ সেখানে পৌঁছে গেল।

বউয়ের দিকে তাকাতেই ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ল তার। দাঁড়াতে গেল। মারের ব্যথার চেয়ে মনের ব্যথা যেন এখন আরও বেশী। সত্তমৃত বুড়ির চেয়ে তার শরীরের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। ভাবল, আমি তো চোর, এরা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিচ্ছে। আমি চুরি করেছি আমার বিচার হওয়া উচিত। বিচার যদি না হয় ধর্ম গঙ্গায় ভেসে যাবে।

সে বলল, "বাবা সঞ্জীব···"

সঞ্জীব পিসার দিকে তাকাল। তার চোখে জল। চোখের জল মুছতে মুছতে পিসা বলল, "আমার বিচার হওয়া উচিত। পঞ্চায়েত ডাকো। চোরের বিচার হওয়া উচিত।"

"যাও, যাও, তোমার আবার বিচার।" সঞ্জীব বলল।

"না বাবা, এখন বিচার না হলে যম গরম লোহা আর শলাকা গায়ে ফুঁড়ে দেবে।"

সেখানে যারা ছিল বিচার করতে কেউ রাজী হয়নি। তখন গরুটা যে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল সেই দড়ি গরুর গলা থেকে খুলে এনে সঞ্জীবের হাতে দিয়ে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে পিসা বলল, "মারো, যত পারো মারো।"

সঞ্জীব দড়িটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল। পিসা তখন চিৎকার করে বলল, "মারছ না কেন?" রেহাই পাওয়ার জন্য সঞ্জীব পিসার পিঠে দুটো লাগাল। তৎক্ষণাৎ মল্লু ছুটে গিয়ে সঞ্জীবের জানুতে কামড়ে দিল। পিসা তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নিয়ে নিজেকে নিজে সমানে মারতে লাগল। পেটে পিঠে কালশিরা পড়ে গেল। তারপর সে আবার ঐ গরুটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

সকাল হল। সারাদিন পুল্লাইয়ার মনমেজাজ ভালো ছিল না। কাঠের কাজে গিয়েও কোন আশা নেই। বাগানের লোক কাঠ দিতে চায় না। গাছের গোড়া কেটে নিতে বলে। কবে কে নাকি ঐ মালিককে ঠকিয়েছে। তাই সে ধারে আর ব্যবসা করবে না। অগত্যা একটা নিমগাছের নীচে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। পাশে ছিল মল্লু। বাড়িতে গেলেও ভালো লাগে না। পথেও শান্তি নেই। ছেলে সঙ্গে থাকে। ছেলের দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়। বার বার মনে পড়ে গতকাল রাত্রের কথা। পিসার চুরি আর মার খাওয়ার কথা।

সেদিন রাত্রে নীলি বলল, মুখ ভার করে আছো, কি হয়েছে, কি ভাবছো বল তো?"

"কিচ্ছু না।"

নীলি আর কোন প্রশ্ন করল না। পুল্লাইয়া দু'একবার বলেছিল, "বুড়ি নেই, ঘরটা

ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।" মল্লুর গায়ে বাপের হাত না পড়লে তার ঘুম হয় না। হাত তুললেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। শুয়ে শুয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়ার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন রাত্রে বুড়োর মত দেখতে ছিল না যে বুড়োটা সে কি যেন বলেছিল, "আমার ছেলে হবে ঠিক আমার মত···আমারই মত সে খেলা দেখাবে। চারজনের মধ্যে নাম কিনবে। অনেকে তার নাম করবে। কোন কিছুকেই সে ভয় করবে না। আমার ছেলে হবে ঠিক ঐ ধরণের।" ভাবতে ভাবতে পুল্লাইয়া ছেলের মুখের দিকে তাকাল। ভাবল, "ভেবেছিলাম, ছেলেকে লাঠিখেলায় ওস্তাদ করে তুলব। ছেলে হবে চোর ধরার ওস্তাদ, দু'হাতে দানধর্ম করবে, মাটির উপর তার বিশ্বাস থাকবে। ছেলের জন্য চারজনের মধ্যে আমাদের নাম হবে। কত গর্ব ছিল! কিন্তু ছেলের জন্য কি রাখলাম? গায়ে একটি জামা দিতে পারলাম না। পেট ভরে ফ্যানও খাওয়াতে পারি না। বেচারা "ভাত ভাত" বলে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল···আমার ছেলে··· হায়রে আমার মল্লু!"

আরও কত কথা মনে পড়ে। ভাবতে ভাবতে তার বুক ভার হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই চোখের জল আসে। ততক্ষণে নীলি মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে তার কাছে এল।

"তোমার কি হয়েছে বল তো?"

কোন জবাব নেই।

নীলি কিছুক্ষণ পর বলল, "আমার মত তুমি থাকবে কেন। খিদের জ্বালা যে কি জিনিস তা তুমি বুঝবে কি করে। কষ্ট যে কাকে বলে তা কি তুমি বোঝ? বোঝনা বলেই হাঁকপাঁক করছ। কিছুদিন এইভাবে কষ্ট করলে তুমিও ধৈর্য ধরবে। এখন আমাদের চেয়ে কে সুখে আছে বল দেখি।"

এই কথা শুনে সে স্ত্রীর দিকে তাকাল। নীলি তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "যার কষ্ট তার। আমাদের ক্ষেত নেই, খামার নেই, একবেলা খেতে পাচ্ছি এই যথেষ্ট। আদেম্মার অভাব কিসের। ওর তো পেটের অসুখ। এক ঢোঁক ফ্যানও পেটে থাকে না। এই তো সামনেই ধান কাটার দিন আসছে। দুবেলা খেতে পেলে শরীর আবার ঠিক হয়ে যাবে। শরীর শক্ত থাকলে আমাদের অভাব কিসের।"

পুল্লাইয়ার তখনও মুখে কথা নেই। নীলি অবস্থা বুঝে আরও তার কাছ ঘেঁষে বসে বলল, "দিদিমা বলেছিল, হাত পুড়লেও ভাতের হাঁড়ি ছাড়তে নেই। আমি ভাবি, আমার সোয়ামীর কি ধৈর্য কম! তোমার ধৈর্য আসবে কোত্থেকে। তুমি তো কারোর মধ্যেই ভালো কিছু দেখতে পাও না। প্রত্যেকের মধ্যেই ভালোমন্দ থাকে। এত বছর তুমি লোকের শুধু ভালোটা নিয়েছিলে আর এখন লোকের খারাপটাই তোমার নজরে পড়ছে। আগেকার দিনে তুমি খেলা দেখাতে দেখাতে একবেলা খেতেই না। তখন তো তোমাকে দেখে মনে হত না যে খাওনি। আর আজকাল একবেলা খেতে না পেলেই তোমার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। কেন বলতো? আমি তো কোন

দিন ভাবিনি যে সব দিন একরকম চলবে। তুমি ভেবেছিলে ?"

পুল্লাইয়া কি যেন ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে বলল, "পিসার মত লোক চোর হয়ে গেল !"

নীলি হেসে বলল, "হোল। দোষ কার ? পিসার। আমার গর্মেণ্ট, আমার গর্মেণ্ট করে তো কথায় কথায় বলে। এক ছেলেকে পড়াতে পড়াতে বন্ধ করে দিল। কোন ছেলেকেই কোন ছোটখাটো কাজে ঢোকালো না। ফলে ছেলেগুলো কুঁড়ে হয়ে গেল। ওদের দিনমজুরীতে পাঠালে দু'পয়সা ঘরে আনত। কোন মহাজনের কাছে কাজ করলেও মাসে দশ বেলা খাওয়া জুটত।"

"কি যে বল না, পিসাদের কত ভালো অবস্থা ছিল জানো ?"

"যখন ছিল, তখন ছিল। এখন কি হল ? আমাদের কথাই ধর না, আগামী মরশুমে মল্লু যদি চারবাড়ির চারটে গরু চরায় দুবেলা পেটভরে খেতে পাবে। তুমি মোড়লদের বাড়ি কাজ করলে। মরশুম শেষে কুড়ি পুট্‌লু (৪০ সের) ধান ঘরে আসবে। যখন যেমন তখন তেমন না করলে কি করে চলবে।"

পুল্লাইয়ার পৌরুষ চাগা দিল। সে বলল, "আমি কাজ করতে যাব জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের কাছে ! তার চেয়ে আমি ভিক্ষে করে খাবো।"

"তা বললে কি চলে ?"

শুয়ে থাকা লোকটা ঝট্‌ করে উঠে বলল, "তুমি জানো আমি কোন্ বাড়ির ছেলে। কত জাঁকজমকের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি। আমার বাবাকে কেন আমাকেও চারজনে মানত। এই তোমার জন্যই আমি দিনমজুরী খাটতে যাই। আমি যদি দিনমজুরী করি আমার ছেলে কি করবে ? সেও দিনমজুরী করবে। তুমি চাও, আমার ছেলে লোকের বাড়ি গরু চরাক। আর আমি চাই আমার ছেলে চোরকে শাস্তি দেবে, সাধুকে ভিক্ষে দেবে, আমার ছেলের জন্য আমার নাম হবে।"

"আমিও তাই চাই। তা আগে তো তোমার ছেলেকে বাঁচাতে হবে। চারাগাছটাকে বড় করতে হলে ভালো সার দিতে হবে না ? কথায় কথায় তোমার পূর্বপুরুষের কথা মনে পড়ে, পৌরুষ চাগা দেয়।" পুল্লাইয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। একে পেট জ্বলছিল, তারপর এই ধরণের কথা কানে যেতেই তার মেজাজ আরও গরম হয়ে গেল। দুবার পায়চারি করে বলল, "আমার বংশের প্রত্যেকেই জেদী। আমাদের রক্তে পৌরুষ আছে। জন্মেছি পৌরুষের মধ্যে, মরবো পৌরুষের মধ্যে। শোন নীলি, আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব, তবু চুরি করব না, ভিক্ষে করতে যাব না।"

পুল্লাইয়ার চেঁচামেচিতে মল্লুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগেই সে বলল, "ভাত।" উঠে বসল। চট্‌ করে পুল্লাইয়া ছেলের কাছে বসে তার গায়ে পিঠে হাত চাপড়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু চোখ বুজে "মা ভাত দাও" বলে সে কাঁদতে লাগল।

নীলির বুক টনটন করে উঠল। ইচ্ছে করল তার মুখে বুকের দুধটা পুরে দিতে।

কিন্তু এখন তার বয়স পাঁচ। দুবছর বয়স পর্যন্ত সে তাকে দুধ খাইয়েছে। পুল্লাইয়া ওপাশে শুলো। মা আর বাপের দুজনের হাত মল্লুর পিঠ চাপড়াল। ওর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে নীলি আর পুল্লাইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। শেষে সে বলল, "এখন এই ঘরে আছে থালাটা।···কাল সকালে আমাকে দিয়ে দেবে।" নীলি কোন জবাব দিল না।

পঁচিশ

আরও চারদিন কেটে গেল। আদেম্মাপ্পার বাড়ির সামনে অনেক লোক জড়ো হল। আদেম্মাপ্পা কাতর হয়ে কাঁদছে আর বলছে, "আমার মরণ হয় না কেন?" দারুণ পেটের যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছিল। এক একজন এক একটা উপদেশ দিলে জামাই বিরক্ত হচ্ছিল। পিসাও মাঝখানে ঢুকে পড়ল। কাটা মুরগীর মত আদেম্মাপ্পাকে ছটফট করতে দেখে ভীড় ঠেলে পিসা তাকে বলল, "কিগো, খুব তো সাধ করে ঘরজামাই রাখলে, হাত-পা ছুঁড়ে কাতরালে হবে? টাকা পয়সাই বড় হল। পেরাণটা কি কিছু নয়। মুখ ফুটে জামাইকে ডাক্তার দেখাতে বল। মুখ বুজে পড়ে থাকলে কেউ পুছবে।"

"অরণ্যে রোদন বাবা, কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে। সবই আমার কপাল, কপাল।" বলতে বলতে সে আবার যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

"ওসব কপাল-টপাল ছাড়ো। শ'চারেক টাকা খরচ কর। তিনদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। শহরে অনেক ভালো ডাক্তার বন্থি আছে। ঐ আমাদের পুল্লাইয়া নিয়ে গেলে হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে দেবে। আর দেরী করেছ কি জানে মারা যাবে। এখনও বলছি ভালোয় ভালোয় হাসপাতালে যাও। প্রয়োজন হলে ওরা একটু কাটাছেঁড়া করে ঠিক করে দেবে। পেট কেটে বিষ বের করে দেবে।"

"মাগো, পেট কাটবে!"

"কাটবে তো কি হয়েছে। ওরা কাটবে কি ছিঁড়বে সেটা কি তুমি টের পাবে? এই হাসপাতালের নাম দিল্লী পর্যন্ত গেছে। হ্যাঁ আগে টাকা দিলে তবে দরজা খুলবে। দরজা খুললেই দেখতে পাবে ডাক্তার আর ডাক্তার। হাড় ভেঙ্গে গেলে জোড়া লাগিয়ে দেয়। গলা কেটে গেলে ছাগলের গলা কেটে জুড়ে ঠিক মানুষের মত করে দেয়। ইশাপ্‌টনম্—ইশাপ্‌টনম্ মানে বুঝেছ? নামটাতো তোমরা শুনেছ? আকাশ ছোঁয়া বাড়ি। ঐ হাসপাতালে মরেও শান্তি। আজ না হোক কালকেই চলে যাও। দুদিনেই সেরে যাবে। ফেরার সময় শহরটা দেখে এসো।"

আদেম্মাপ্পা জামাইয়ের দিকে তাকাল। জামাই মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

পিসা আরও জোরে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলল, "ঐ তো গারনাইডু চারদিকে যত ডাক্তার বৈদ্য ছিল দেখিয়েছিল। কিন্তু কেউ তার রোগ ধরতে পারেনি। শেষে গেল ইশাপটনম্। যাওয়ার দশদিনের মধ্যে রোগ সারিয়ে ফিরে এল। একফোঁটা জলও ওর পেটে সহ্য হত না। এখন ওকে বুড়ো ভেড়ার মাংস দাও খেয়ে হজম করে দেবে। একেকবেলা দুসের মাংস খেয়ে হজম করতে পারবে। সবসময় মিউ মিউ করলে কি চলে। জিদ্ ধরতে হয়। এইভাবে ফেলে রেখে রেখে তোমার জামাই কি করবে জানো ঐ গন্নেম্মা যেভাবে কর্তাকে মেরেছিল সেভাবে মারবে।"

শেষের কথাটা সকলের সামনে বলাতে জামাইয়ের খুব রাগ হল। সেও জোরে জোরে বলল, "ওরে পিসা, মুখে যা আসবে তা বলবে না। চারশ কেন, পাঁচশ নিয়ে যেতে বল। এখন পর্যন্ত কয়েকশো টাকা খরচ হয়ে গেছে। যেখানে যেতে চায় যাক। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।"

"এই যে আদেম্মা, জামাই রাজী হয়েছে। আজ না পারো কালকেই রওনা হয়ে যাও। আমাদের পুল্লাইয়াকে নিয়ে যাবে। তুমি বললে ও না করবে না। রাহাখরচ খাওয়াখরচ তোমার। তোমার হাত দিয়ে তো বিয়ে হয়েছে। ওটুকু সেবা আর সে করবে না? তুমি হাসপাতালে থাকবে আর ও ধর্মশালায় থাকবে। ফেরার সময় সিংমাদিরি আপ্পান্নাকে একটা দর্শন করে আসবে।"

পিসা আরও কিছুক্ষণ দু'একটি কথা বলে পুল্লাইয়ার বাড়িতে ছুটে গেল। সব কথা তাকে বলল। মল্লু কি করে থাকবে সেইটাই হল প্রশ্ন। এই মাগগি গণ্ডার দিনে মল্লুর খরচ দিতে আদেম্মাপ্পার জামাই রাজী হবে না। "শোন পুল্লাইয়া, যাচ্ছোই যখন ইশাপটনম্ শহরটা একটু ভালো করে দেখে এসো। সিণ্ডিয়া কুম্পনি আরও অনেক-গুলো কুম্পনি আছে। তোমাকে তো কদিন ওখানে থাকতে হবে। একমাসের মাইনে একসঙ্গে পাওয়ার মত কাজের জোগাড় করো। তুমি যদি কোনরকমে একটা কাজ জোগাড় করতে পার আমিও তোমার সঙ্গে কাজ করে থাকতে পারবো।"

"ভালো কথা বলেছ।" পুল্লাইয়া হেসে বলল।

নীলি রান্নাঘর থেকে এলে পিসা তাকেও সবকিছু জানাল। কিছুক্ষণ পরে পিসা আবার বলল, "বুঝলে মা, তোমার কথা তো শুনিনি, শুনলে কি আর ঐ খিদের ভূতটা আমার মাথায় ওভাবে চাপতো। সেকালে ধর্মরাজ বিপদে পড়ে যেমন মিথ্যা কথা বলেছিল আজ আমাকেও সেভাবে চুরি করতে হয়েছে। এখন ছেলেদুটোকে গরু ছাগল চরাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় ছেলেটাকে শহরের উকিলকে খোসামোদ করে ওর বাড়িতেই কাজকর্ম করতে রেখে দিয়েছি। সেখানে থাকলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়তে পারবে। পড়লে বড় হয়ে গর্মেণ্টের চাকরি পাবে। মাসে একবার মাইনে পাওয়ার চাকরি কি আর পাবে না?"

নীলি পিসার কথা শুনে খুশি হয়ে বলল, "খুব ভালো হল! ছেলেরা এখন থেকে

খাটবে খাবে। তবেই তো মানুষ হবে। খেটে পয়সা রোজগার করতে লজ্জা কোথায়। পৌরুষ আর জিদ্ নিয়ে বসে থাকলে পেট ভরবে। জিদ্ ধরে আমি যদি জল থেকে মাখন তুলতে যাই, মাখন বেরোবে? গর্মেণ্ট কি বাড়িতে এসে চাকরি দেবে? খেয়ে বেঁচে বড় হয়ে চাকরি চাইলে তবেই তো গর্মেণ্ট চাকরি দেবে। না খেলে বাঁচবো কি করে?"

পুল্লাইয়া পিট্‌পিট্ করে নীলির দিকে তাকাল। পিসা একটু হেসে নীলিকে বলল, "জানো মা, ঐ বুড়িটা খুব জিদ্ ধরেছিল। ধরবে নাই বা না কেন, যতই হোক ঘোড়ার পেটে তো আর গাধা জন্মায় না। তবে ঐ পেটের জ্বালা বড় জ্বালা মা। ঐ জ্বালার আগুনে ওর সব জিদ্ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মুখের সামনে বলছি বলে কিছু মনে করো না। তোমার কথা বললে চারগাঁয়ের লোক পঞ্চ মুখে প্রশংসা করবে।" বলে সে উঠে পড়ল।

পুল্লাইয়ার যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু মল্লুও তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তাকে নিয়ে যাওয়ার তার কাছে টাকা ছিল না। শেষপর্যন্ত আদেম্মার জামাইও বলল, "না, না, ওটুকু বাচ্চা কোথায় যাবে? তাছাড়া ওর খরচ কে দেবে?"

নীলি মোড়লদের বাড়িতে কাজ করে। যেটুকু সময় পায় চরকা চালায়। একবেলা খেলে অন্যবেলার কিছু থাকে না। মল্লুকে ওর বাবা বুঝিয়ে সুজিয়ে রেখে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, "শোন বাবা মল্লু, তোমার জন্য এত পুতুল আনব। জামা আনব, ধুতি আনব, আরও অনেক কিছু আনব। বাড়িতেই থাক। আমি আগে দেখে আসি শহরটা কেমন। তারপর তোমাকে, তোমার মাকে, বোনকে, সবাইকে নিয়ে শহরে যাবো। আমরা তো দুদিন পরে সেখানে থাকবো। সেখানে রোজগার করবো, ঘুরবো, থাকবো।"

পুল্লাইয়ার চলে যাওয়ার পর থেকে সারা দিনে মল্লু কতবার যে "বাবা, বাবা," বলে তার হিসেব নেই। ঠায় এককোণে অনেকক্ষণ বসে থাকত। খেতে ডাকলে উঠত না। খুব যখন খিদে পেত তখন সে একাই রান্না ঘরে গিয়ে এ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে ফ্যান ঢেলে চোঁ মেরে খেয়ে নিত।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। তখনও বাবা এলো না। প্রতিটা মুহূর্ত সে পথের দিকে তাকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে "বাবা, বাবা" বলে কেঁদেও ফেলত। সাতদিনের জায়গায় পনেরদিন কেটে গেল। ঘুমের ঘোরেও সে "বাবা, বাবা," বলে কাঁদত। রাস্তার উপরে বসে সে তাকিয়ে থাকত। সারাদিন ধরে বসে থাকত। রাত হয়ে গেলেও নড়তে চাইত না। শেষে অনেক বুঝিয়ে নীলি তাকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরত। কোলে উঠেও সে "বাবা" বলে চিৎকার করত। পনের দিনের মধ্যে মল্লু ঝাঁটার কাঠির মত রোগা হয়ে গেল।

পনের দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় পুল্লাইয়া আদেম্মাকে নিয়ে ফিরল। তার

পেট কাটা ছেঁড়া কিছু করতে হয়নি। ডাক্তাররা ওষুধপত্র দিয়ে সারিয়ে ফেলেছে। পিসা খুব দুঃখ করল, "পেট কেটে বিষটা বের করে দিলেই ভালো করত। আবার কবে বিষের ব্যথা চাগা দিয়ে উঠবে, বিষ তো! পুল্লি, তোমার টাকা কি খরচ হয়ে যেত, তুমি পেটটা কাটিয়ে দিলে না কেন? একমুঠো টাকা ডাক্তারের হাতে পুরে দিলেই সে পেট কেটে দিত। আজকালকার দিনে চাঁদির জুতো না মারলে কোন কাজ হয়?" পুল্লাইয়া বাড়িতে এল। মল্লু বাপকে দেখেই অভিমানে রান্নাঘরে ছুটে চলে গেল। ছেলের মুখের দিকে তাকাতে বাপের লজ্জা করল। ছেলের জন্য যা যা আনবো বলেছিল তার কিছুই আনা হল না। তবু ছুটে গিয়ে ঝট্ করে তাকে কোলে তুলে নিতেই মল্লু হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। কাঁদছে তো কাঁদছেই। অনেকক্ষণ সে একটি কথাও বলতে পারল না। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই মল্লু বলল, "হুঁ, হুঁ, তুমি এতদিন আসোনি কেন?"

"ওরে পাগলা, কাঁদছিস কেন? এরপর তো আমরা সবাই সেখানেই থাকবো।"

"ইস্।"

"হ্যাঁরে, আমরা সবাই সেখানে থাকবো। ওখানে রেলগাড়ি চলে। হুস্ হুস্ শব্দ হয়। শহর যে বিরাট শহর!"

মল্লু কান্না ভুলে গেল। বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মল্লু। "অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর। প্রত্যেকটা ঘরের নীচে চাকা। আমরা সবাই একটা ঘরে বসব। হুস্ হুস্ করে ঐ গাড়িটা আমাদের শহরে নিয়ে যাবে। রেলগাড়ি থেকে নেবে আমরা বাসে উঠব।"

"বাস। ওটা হুস্ হুস্ করে?"

"না, ওটা পোঁয়াক্ পোঁয়াক্ করে। ওটার নিচেও চাকা আছে। দেখনা, নাবো, আমার পেছন দিকের কাপড়টা ধর। এই দেখ, এইভাবে রেলগাড়ি চলে। হুস্ হুস্ হুস্ হুস্। ব্যাস্ তারপরেই শহর।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই মল্লু একাই রেলগাড়ি চালাতে লাগল। চালাতে চালাতে সে খাটিয়ায় শোয়া তার বোনের কাছে এসে গেল।

রাত্রে পিসা এলো। পিসাকে সে বলল, "শহরে অনেক লোক। অনেক কুম্পানী আছে। অনেক কুম্পানীতে মাসে একবার মাইনে দেয়। এখানে থেকে আর কি হবে। আর কদিন বাদে না খেতে পেয়ে মরতে হবে। তাই ভাবছি শহরে চলে যাবো! ওখানে থাকলে পয়সার মুখ দেখবো। ছেলেও মানুষ হবে।"

পিসা বলল, "তাই যাও, আগে দেখ কি হয়। তবে তোমার শরীরটা একটু ভেঙ্গে গেছে। একটু সাবধানে থেকো। তোমার পেছনে আমিও তো যাবো একদিন।"

সকাল হতে না হতেই সারা গ্রামের লোক জেনে গেল যে পুল্লাইয়া শহরে যাচ্ছে। কথাটা শুনে এক একজন এক একরকম মন্তব্য করল। কেউ বলল, "নিশ্চয়ই কিছু

হয়েছে। তা না হলে গাঁয়ের ছেলে পুল্লাইয়া কখনও শহরে যায়!"

আবার কেউ বলল, "শরীরে তাগত থাকলে যেখানে যাবে খেতে পাবে।"

মেয়েরা নীলির কাছে ছুটে এল। কি ব্যাপার জানতে চাইল। নীলি শান্ত স্বরে বলল, "কর্তা শহরে যেতে চাইলে, যাবো।" কিন্তু আর কোন কথা সে বলল না।

দুপুরে ছেলেকে কোলে করে পুল্লাইয়া বাড়ি ফিরল। নীলি শান্তস্বরে বলল, "গোটা গাঁয়ের লোক জানল, শুধু জানলাম না আমি।"

কোন জবাব নেই তার। নীলি আবার বলল, "কোথায় গিয়ে উঠব, তার কি কোন ঠিকঠিকানা আছে?"

পুল্লাইয়ার কাছ থেকে কোন জবাব এলো না। "এই গ্রামেই জন্ম। এখানে সবাই চেনা জানা। বিপদে আপদে কেউ না কেউ ছুটে আসে। শহরে কে কার ডাকে সাড়া দেয় বল। আমাদের হাতে তো সোনাদানা নেই যে বিপদে পড়লে খরচ করব। হুট্ করে এভাবে গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়া কি ঠিক? আমার কথা শোন…"

বিরক্ত হয়ে পুল্লাইয়া বলল, "এইজন্যই তো তোমাকে বলিনা।" বলে উঠে চলে গেল সে।

পাড়ায় পিসার বাড়ির সামনে অনেকে জড়ো হল। ওরা পুল্লাইয়াকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল। ওদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে পুল্লাইয়া বিরক্তির সঙ্গে বলল, "আমার ইচ্ছে, আমি শহরে যাবো।" কেউ এত কড়া জবাব তার কাছ থেকে আশা করেনি। পিসা সকলের মনের অবস্থা কিছুটা বুঝে ওদের উদ্দেশ্যে বলল, "তোমরা কোন কিছু ভেবো না। পুল্লাইয়া যে শহরে যাচ্ছে, তোমরা জানো, দিল্লীতেও সেই শহরের নাম আছে। এহেন শহরে আমার গাঁয়ের একটা যুবক যাচ্ছে এতো আমাদের গর্বের কথা। তোমরা তো ভয়েই মরে যাচ্ছো, শহরে কত কিছু হয় তা জানো। আমরা এখানে সবাই কুয়োর ব্যাঙের মত আছি। এই তো সেদিন শুনলাম, আমেরিকা নাকি মস্ত বড় হাওয়াই জাহাজে করে ঐ তারাগুলোর মধ্যে যে চাঁদটা আছে ঐ চাঁদে চলে যাবে। এখন ভাবো দেখি, এখানে পড়ে থাকলে আমরা কোনদিন চাঁদে যেতে পারবো? শহরে থাকলে পুল্লাইয়া যেতে পারবে।" তারপর পুল্লাইয়ার দিকে ঘুরে "ওরে বাবা পুল্লি, ওখানে যারা যাবে তারা যেন যে যার তালে না থাকে। এখন না হয় তুমি রোগা হয়ে গেছ একদিন তো তোমার হাতের গুলোগুলো দেখেছি। শহরে তো যাচ্ছো, তারপরে তো যাবে চাঁদে। চাঁদে তো ঘরবাড়ি করবে। সেখানে কিন্তু তোমার কষ্ট, তোমার কষ্ট বললে হবে না। চাঁদে তোমার কষ্ট মানে সকলের কষ্ট। তোমার সুখ মানে সকলের সুখ। সেখানে তোমার ছেলে, আমার ছেলে, বলে বিচার করলে হবে না। সব ছেলেমেয়েকেই তোমার ছেলের মত দেখতে হবে। আর টাকা পয়সা, ধনসম্পত্তি তোমার একার বলে কিছু থাকবে না। সেখানে মানুষ সবাই সমান। সেখানে খাওয়া দাওয়া করে তোমার শরীরে তো শক্তি বাড়বে। তুমি বাবা ওখানে

এমন গর্মেণ্ট করো, যাতে এইসব ব্যাপার স্যাপার ঠিক ঠিক ভাবে দেখে।"

কেউ কিছু বুঝুক না বুঝুক মল্লু কিন্তু মাথা নেড়ে বলল, "দাদু, ঠিক বলেছ।"

সেদিন সন্ধ্যায় পুল্লাইয়া নীলাম্মার মন্দিরের কাছে একা বসল। ছেলে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলছিল। "রামু থাকলে আজ কি বলত কে জানে। মা, নীলাম্মা, হয়ত তার মাধ্যমে আশীর্বাদ করত। সারা গাঁয়ে একটি মাত্র দেবী। সেও অসহায়। যে যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে। কেউ বড়লোক হচ্ছে, কেউ গরীব হচ্ছে। ধর্ম ন্যায় এসব নদীর জলে ভাসছে। পয়সা যার, জোর তার। যার পয়সা আছে তাকে সবাই মানছে। এই যখন গাঁয়ের অবস্থা তখন আর এই গাঁয়ে থেকে লাভ কি? না আর থাকব না। এগাঁয়ে এখন কেউ আমাকে ত্বেলা পায়েস পিঠে খাওয়ালেও থাকব না। যেখানে ন্যায় আছে, ধর্ম আছে সেখানে জল খেয়েও থাকা যায়।" পুল্লাইয়া দেবীকে বলছে না নিজেকে বলছে বোঝা গেল না। সেই আবছা অন্ধকারে বসে পুল্লাইয়া আবার বলল, "শহরে চলে যাচ্ছি, আবার আগেকার পুল্লাইয়া হয়ে যাবো। আবার সেই আগের মত ন্যায় নীতিতে অটল থাকব। আমার চালচলন দেখে চারজনে বুঝবে আমি মল্লনাইডুর ছেলে। মল্লুর বাবা। সেখানে ফ্যান খেয়ে থাকলেও সুখ আছে।" তারপর মনে মনে শহরে সে কি চাকরি করবে, কিভাবে থাকবে সব ভেবে খুব খুশী হল। আর একবার সে নীলাম্মা দেবীকে স্মরণ করল। সঙ্গে সঙ্গে রামুকেও তার মনে পড়ল। ভাবল, "তুমি এখানে আর কেন পড়ে আছো মা? এই অন্ধকারে তুমি আরও কালো হয়ে গেছো মা। শহরে কত আলো।" তারপর নীলাম্মা দেবীকে প্রণাম করার জন্য দরজার ফাঁক দিয়ে দেবীর মূর্তির দিকে তাকাল। মনে হল, সরু সলতের একটি প্রদীপ জ্বলছে। এককোণে রামু বসে আছে। ভাবল, মরেও রামু নীলাম্মা দেবীকে ছাড়েনি। তার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ঝাঁকুনি খেলো। রামুর উদ্দেশ্যে সে বলল, "যাচ্ছি, ভেবেছিলাম তোমার সাথে দেখাই হবে না। দেখাই যখন হয়ে গেল তখন জানিয়েই দিচ্ছি, শহরে যাচ্ছি।" সঙ্গে পুল্লাইয়া যেন শুনতে পেল ভেতর থেকে রামু যেন বলছে, "বাবা।" হঠাৎ চমকে উঠল পুল্লাইয়া। মনে মনে বলল, "একি! আমি এখানে কতক্ষণ বসে আছি।" নীলাম্মাকে প্রণাম করল সে। পরিষ্কার যেন শুনতে পেল দেবী তাকে বলছে, "যা না রে যা চলে যা। তুই কি ভাবছিস আমি শুধু এই মন্দিরেই পড়ে আছি? তোর মধ্যে কি আমি নেই। এখন যারা গালাগাল দিচ্ছে তাদের মধ্যেও আমি আছি। কোথায় নেই আমি। মন যেতে চাইছে যখন, যা। যেখানে খেতে পাবি সেখানেই থাকবি। সেটাই তোর গ্রাম, সেটাই তোর দেশ।" এমন সময় "বাবা" বলে চিৎকার শোনা গেল। মল্লু ডাকছে। তখন যেন পুল্লাইয়া সজাগ হল। ভালো করে দেখল। মন্দিরে প্রদীপ নেই। বিগ্রহ আছে কিনা তাও দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্নে বিভোর ছিল। মল্লু খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরের কাছে বাপকে পেল। খুব খুশী হয়ে সে বাপের কোলে উঠে পড়ল। ওকে কাঁধে বসিয়ে পুল্লাইয়া বাড়ির দিকে এগোল।

ছাব্বিশ

শহরে চাকরি, ঘরদোর, কিচ্ছু না দেখে, পাকাপোক্ত কোন ব্যবস্থা না করে যাওয়া নীলির ইচ্ছা নয়। পুল্লাইয়া আগে গিয়ে চাকরি বাকরির সন্ধান করার পর নীলি যেতে চায়। এভাবে হঠাৎ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে শহরে চলে যাওয়া তার পছন্দ নয়। মল্লু একা থাকবে না। পুল্লাইয়া শহরে গিয়ে কাজ পেলে খাবে কোথায়? কে রাঁধবে? এদিকটাও নীলিকে ভাবতে হয়। দিদিমার শেষ কথাগুলো নীলির কানে বাজে।

অনেকক্ষণ আগেই অন্ধকার হয়ে গেছে। নীলি বারান্দায় বসেছিল। অনেক কথাই সে ভাবছিল। গুড্ডি ভেঙ্কান্না ও গন্নেম্মা নিজেদের মধ্যে ওদের যাওয়ার ব্যাপারে নানা কথা বলছিল। ওদের কথা নীলির কানে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। এমন সময় ছেলেকে নিয়ে পুল্লাইয়া এলো। আসার পথে তার বাবা যে কাণ্ড করে এসেছে তা মল্লু সবিস্তারে বলল। এমন ভাবে বলল যেন তার বাবা বীরত্বপূর্ণ একটা কাজ করে এসেছে।

নীলি চমকে উঠে স্বামীকে বলল, "হাসছো? ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কেন?"

"ঝগড়া কিগো? পেলে আমি রক্ত খাবো।"

"ছি ছি একি কথা! অমন বাঘের মত লাফাচ্ছো কেন? রাজু আমাদের কি অন্যায় করেছে?"

"অন্যায় করেনি? অর্ধেক টাকা দিয়ে গোটা ক্ষেতটাকে হাতিয়ে নেয়নি? ওর পেটের নাড়িভুড়িগুলো টেনে আমি আমার ক্ষেত আদায় করবো না!"

"সাবাস বাবা।" গুড্ডি ভেঙ্কান্না বলল।

নীলি আস্তে আস্তে ভেঙ্কান্নাকে বলল, "তুমিও সাবাস বললে বাবা। ওর বউ না চাইতেই টাকা দিয়েছিল। আর দিয়েছিল বলেই এঁকে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছি। আমার দিদিমা মরে গেলে কাজের সব খরচ রাজু দিয়েছে। ওরা তো আমাদের আত্মীয় নয়। ওরা আমাদের যতটুকু ভালো করেছে তা কি আমাদের ভোলা উচিত। এসব যদি ভুলে যাই তবে আমাকে লোকে মানুষ বলবে কেন?"

"এই তোমার মুখে মা আজ পর্যন্ত কারও নিন্দে শুনলাম না। জগতের সবাই তোমার মত হলে কত ভালো হত।"

নীলি বারান্দায় এতক্ষণ বসেছিল। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "তোমাদের মা-বাবাকে প্রণাম করি। তাঁদের পায়ে পড়ি। আমি বলি কি, এত কথার দরকার কি? একবার আমার উপরে ছেড়ে দাও না। একবার রাজুর সামনে দাঁড়িয়ে জমির কথাটা পেড়েই দেখি না ও কি বলে।"

"মুখের উপরে কষে এক চড় মারবে।" পুল্লাইয়া বলল।

"গোটা শরীরটা থাকতে মুখে মারবে ? না, তা মারবে না। যতই হোক আমি মেয়েমানুষ। আমার উপরে ওর হাত উঠবে না।" বলে নীলি রান্নাঘরে চলে গেল। সবাই চুপচাপ বসে রইল। ভেঙ্কান্না গন্নেম্মা অনেকক্ষণ বসে রইল। অনেক রাত পর্যন্ত বাটিতে যে ভাত আর ফ্যান ছিল তাতে ভেঙ্কান্না হাত দিল না। অনেকক্ষণ বসার পর গন্নেম্মা উঠে ভেঙ্কান্নাকে নিয়ে ভজনমন্দিরে গেল। কাছেই রাজুর বাড়ি। ভেঙ্কান্নার চোখে ঘুম এলো না। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে বসে ভাবছিল।

অন্ধকার। সারা গ্রাম সেই অন্ধকারে ডুবে ছিল। গন্নেম্মা সেই অন্ধকারে বাটির ভাত এক মুঠো তুলে মুখে পুরে নিল। পাছে চিবোতে গেলে শব্দ হয় তাই সে চিবোয়নি। সোজা জিভ দিয়ে নেড়ে গিলে ফেলল। একটু শব্দ হল। অন্যসময় অল্প একটু শব্দ হলেই ভেঙ্কান্না সজাগ হয়ে যেত। কিন্তু তখন সে টের পেল না। মনটা তার পুল্লাইয়া ও রাজুর ব্যাপারে কি যেন ভাবছে।

মধ্যরাত্রি। অত রাত পর্যন্ত ভেঙ্কান্না জেগেই ছিল। অনেকের কথাই সে ভাবল। অনেক কথাই তার মনে পড়ল। নীলাম্মা দেবীকে সে স্মরণ করল। রামুর কথা তার মনে পড়ল। মাকে ডেকে বলল, "শুধু একটি মাস আমাকে দেখার ক্ষমতা দাও মা··· ঠিক আছে এক মাস না হোক, এক সপ্তাহ আমাকে দেখতে দাও···সপ্তাহ না হোক, মাত্র একটি দিন আমাকে দেখতে দাও···ঘুমন্ত গ্রামটাকে আমি জাগিয়ে দিতে চাই মা! ঐ একদিনেই আমি এই ভেড়াগুলোকে বাঘ বানিয়ে দেবো মা! একটা দিনও যদি না পারো মা মাত্র একটি ঘণ্টার জন্য আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও···একটি ঘণ্টাও যদি সময় পাই এই অন্যায়গুলোকে আমি ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দেবো মা। একটি মুহূর্তের জন্য আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও মা। দাও।"

না দৃষ্টি ফিরে এলো না। আবেগে, অভিমানে, ক্ষোভে ভেঙ্কান্নার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। গায়ে যে একচিলতে কাপড়টা ছিল তাই দিয়ে চোখ মুছল ভেঙ্কান্না।

অন্ধকার—ঘন কালো অন্ধকার। গভীর ঘন কালো অন্ধকারে প্রকৃতি ঘুমোচ্ছিল। আস্তে আস্তে হাতড়ে লাঠিটা তুলে নিল ভেঙ্কান্না। আন্দাজে হাতড়াতে হাতড়াতে রাজুর বাড়ির দিকে গেল। কিসের যেন শব্দ ভেসে এল। তার ইচ্ছে করল "কে" বলে জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু পা টিপে টিপে এসে ভজন মন্দিরের বারান্দায় বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বসল সে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ ছিল না। গন্নেম্মাকে হাত দিয়ে ঠেলে তুলল সে। গভীর ঘুম থেকে ওঠার মত সে উঠল। তাকে ফিসফিস করে ভেঙ্কান্না বলল, "তুমি আমার একটা উপকার করবে ?"

"আমি তোমার কি উপকার করব ?" অবাক হয়ে গন্নেম্মা প্রশ্ন করল।

"রাজু ধানের গোলার কাছে, পাহারা দিতে ঘুমোয়। আস্তে আস্তে গিয়ে দেখে এসো তো ব্যাটা ঘুমোচ্ছে কিনা। লক্ষ্মীটি যাও, দেখে এসো।"

"মাগো, আমাকে যদি ওরা চোর বলে ধরে ঠেঙায়?" গন্নেম্মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

"হারামজাদী, আমার বাটিতে যে ফ্যানে ভাতে আছে তা খেয়ে নাও। এখন আমি যা বলছি তা করলে সারাজীবন আমি যে খাবার পাবো তার অর্ধেক তোমাকে দেবো। প্রত্যেকদিন আমার কাছ থেকে অর্ধেক খাবার পাবে, বুঝলে?"

গন্নেম্মা জানে ভেঙ্কান্না এক কথার মানুষ। সে যা বলে তা করে। তার কথামত গন্নেম্মা বাটিতে যেটুকু ভাত আর ফ্যান ছিল খেয়ে নিল।

কোমরে হাত দিয়ে নুয়ে টুক্ টুক্ করে হাঁটতে হাঁটতে রাজুর ধানের গোলার কাছে গেল। নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেল। মনে হল রাজু একাই ঘুমোচ্ছে। গোশালের গরুগুলোও ঘুমোচ্ছে মনে হল।

ইতিমধ্যে ভেঙ্কান্না অনেক কিছুই ভেবে নিল। একবার ভাবল, "রাজুর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে!" কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, "না ওর রক্ত পান করতে হবে। ওকে জানে খতম করতে হবে।"

তখন তার মনে প্রশ্ন জাগল, "ও কে? রাজু কে? তোমার ছেলে না? নিজের ছেলেকে মেরে ফেলবে? ছেলের রক্ত তুমি পান করবে? সুরাম্মাকে সেদিন রাত্রে তুমি কথা দিয়েছিলে না? তুমি এই অপকর্ম করলে সে তোমাকে ক্ষমা করবে?"

দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ পায়চারি করতে করতে সে ভাবল, "যে খারাপ, সে খারাপই থাকে। অমন ঠাণ্ডা মেয়ে, অত ভালো মেয়ে, নীলাম্মার ঘরে এই ব্যাটা অশান্তির আগুন ধরিয়েছে। ওদের ভাগচাষের জমি কিনে নিয়েছে। ওদের জমি বন্ধক রেখে অধর্ম করেছে। সামান্য কটা টাকা ধার দিয়ে বাড়িটাও নিয়ে নেবার তাল করেছে। ওদের ঘরছাড়া করে একেবারে গাছতলায় বসানোর ব্যবস্থা করছে! রাজুটা কি মানুষ···এ আমার ছেলে? না, কিছুতেই ও আমার ছেলে নয়!"

গন্নেম্মা এল। ভেঙ্কান্না ওর কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে রাজু যেখানে শুয়েছিল সেখানে গেল। গন্নেম্মা তাকে সেখানে ছেড়েই তাড়াতাড়ি ভজন মন্দিরের কাছে এসে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল।

রাজুর নাক ডাকার আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। রাজু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। ভেঙ্কান্না হাতের মুঠোটাকে বারবার সঙ্কুচিত প্রসারিত করল। হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিল সে। সমস্ত অভিমান মুছে ঝেড়ে ফেলল সে। গোটা শরীরটাকে কর্তব্য পালনের জন্য সে তৈরি করে নিল। চারদিকে বেশ অন্ধকার। নিজেকে তার মনে হল সিংহ আর রাজুকে একটি ছাগল। হঠাৎ কি যে হল, জোরে জোরে সে বলে ফেলল, "ওঠ, ওঠ ব্যাটা!"

রাজু উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দাঁড়াতে গেলে ভেঙ্কান্না তার চুলের মুঠি ধরে নীচের দিকে চেপে রইল। রাজু "বাঁচাও" বলে আর্তনাদ করল। ভুম্ করে ভেঙ্কান্না তার নাকের উপর ঘুষি মারল। ঝরঝর করে রাজুর নাক দিয়ে রক্ত ঝরল। ঐ রক্তের তিলক পরে ভেঙ্কান্না বলল, "তুই আমার ছেলে, নেহাৎ তোর মায়ের মুখ আমার সামনে ভেসে উঠেছে। তা না হলে এক্ষুণি তোকে যমালয়ে পাঠাতাম।"

ততক্ষণে আওয়াজ পেয়ে আলো নিয়ে লোকজন এসে গেল। ভেঙ্কান্নাকে চারজনে ধরে ফেলল। খাঁচায় পোরা সিংহের মত ভেঙ্কান্না গর্জন করতে লাগল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, "পুল্লাইয়ার মত আর কত লোকের সংসার তুই ধ্বংস করবি? তোরা ছাড়, ছাড় আমাকে। শুধু আর একটা ঘুষি মারতে দে···আমার ব্যাটার বুদ্ধি খুলে যাবে।"

"আমি তোর ব্যাটা?" বলে রাজু লাফাতে লাফাতে খিস্তি করতে লাগল। নাকটাকে ন্যাকড়া দিয়ে চেপে রেখে ভেঙ্কান্নার পেটে কষে এক লাথি মারল রাজু। সঙ্গে সঙ্গে গোঁক করে কুঁকড়ে ভেঙ্কান্না বসে পড়ল। দেখতে দেখতে সারা পাড়ার লোক ভেঙ্গে পড়েছিল। তাকে লাথি মারার পর কেউ কোন কথা বলল না। পুল্লাইয়া বলল, "একটা অন্ধের উপর জোর ফলানো হচ্ছে!" পুল্লাইয়ার এই কথা কানে যেতেই গোটা ব্যাপারটাকে এক একজন এক একভাবে নিল। রাজু চিৎকার করে বলল, "ওরে পুল্লি, আমি জানি, আমি সব জানি। শুধু আমি কেন, সবাই জানে। আমাকে প্রাণে মারার জন্য যে কে পাঠিয়েছে তা সবাই জানে। তবে তুই মনে রাখিস, এই গাঁয়ে মানুষ আছে। এটা জঙ্গল নয়। এখানকার প্রত্যেকটি মানুষ আমার পক্ষে সায় দেবে। কাল সকালেই পুলিশ আসবে। তখন টের পাবি কি হয়। জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকিস পুল্লি!"

সকাল হল। কেউ কেউ বলল, "পেছনে কেউ না থাকলে ঐ অন্ধ ভেঙ্কান্নার এত সাহস হবে? আসলে ঐ জমিটার গোলমাল থেকেই রাজু আর পুল্লাইয়ার মধ্যে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ওর কপালে লেখা আছে জেল। ও আর শহরে যাবে কি করে।"

এইভাবে কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে নানাজনের মুখে নানা কথা শোনা গেল। সব জানল সব শুনল নীলি। কিন্তু নিজে আগ বেড়ে কোন কথা বলল না। ভজন মন্দিরের বারান্দায় পড়েছিল ভেঙ্কান্না। রাত্রে যে লাথিটা খেয়েছিল তার ব্যথায় তখনও সে গোঙাচ্ছিল। নীলি বাটিতে ফ্যান আর ভাত ঢেলে নিয়ে গেল ভেঙ্কান্নার কাছে।

"বাবা?" নীলি বলল।

নীলির ডাক শুনে গুড়ি ভেঙ্কান্না লজ্জা পেল। কুঁকড়ে শুয়েছিল, উঠে বসল। নীলি তার পেটে হাত দিয়ে বলল, "বেচারি। ফুলে গেছে যে।" আস্তে আস্তে তার উপর হাতটা বুলিয়ে দিল। ভেঙ্কান্নার চোখে জল। তার সামনে বাটিটা রেখে নীলি তার

ডান হাতটাকে বাটিতে রাখল। ভেঙ্কান্না খুব ক্ষুধার্ত ছিল। চোঁ মেরে ভাত আর ফ্যান খেয়ে নিল। পেটে দানা পানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাটা যেন আরও ছেপে এল। তার কান্না দেখে ঐ আধমরা সিংহকে নীলি বলল, "কাঁদছ কেন বাবা? কালকে যা ছিলে আজকে কি তুমি তা থাকবে? থাকতো চাইলেই কি থাকা যায়। তোমার অবস্থা যেমন আমাদের অবস্থাও তেমন। আজকে একজনকে মেরে ফেলে কালকে বদনাম মাথায় করে ঘুরে বেড়াবো? লোকের কাছে তো খারাপ হয়ে যাবো। জিভটা যদি ভালো থাকে জগতের কিছু লোক তো ভালো হতে পারে।"

ভেঙ্কান্নার দুঃখ তখনও লাঘব হয়নি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে কোন কথা বলতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পরে গন্নেম্মা এল। নীলি তাকে বলল, "বুড়িমা তুমি তো এখানেই ছিলে। তুমি বারণ করতে পারলে না? নিজে না পারলে আমাকে তো ডাকতে পারতে। দেখ তো পেটের অবস্থা কি হয়েছে। দাঁড়াও দু ফোঁটা তেল নিয়ে আসি। তেল মেখে দিলে ফোলাটা একটু কমে যাবে।"

নীলির কথায় চমকে উঠলেও গন্নেম্মা বিড়বিড় করে বলল, "যারা ভালো হতে চায় তারা নিজেরাই ভালো হয়। আর যারা খারাপ হতে চায় তাদের কানে কি কারও কথা যায়। আমি কি করব মা। কপালের লিখন কে খণ্ডাবে মা?" আবার কোন্ কথা উঠে এই ভয়ে বুড়ি কোমরে হাত দিয়ে সেখান থেকে সরে গেল।

সঞ্জীব পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নীলিকে দেখে বলল, "নীলাম্মা, তুমি আর লোক পেলে না, ঐ কানাটাকে দরদ দেখাচ্ছো? দেখোগে যাও, মোড়লদের বাড়ির কাছে রাজু কি যেন করছে। পুলিশ নাকি আসবে। পুল্লির কপালে দুর্ভোগ আছে।"

ভেঙ্কান্না ঝট্ করে বলল, "আসুক, আসুক, এখানে কেউ চুরিচামারি করেনি। বিচারে সত্যের জয় হবে।"

"তুই তো ওকে মেরে ফেলতিস। সত্য আবার কিসের?" বলতে বলতে সঞ্জীব এগিয়ে এল।

ভেঙ্কান্না যেন রাগে জ্বলে উঠল। সে বলল, "আসুক না পুলিশ, আমিও দেখবো, কিভাবে পুল্লিকে জেলে পোরে!"

"তুই আর দেখবি কি? তোকে তো গাঁ থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হবে।" সঞ্জীব বলল।

"তার আগে চারজনের গলা কেটে ফেলব।"

নীলি সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, "কি দরকার বাবা, এই সামান্য ব্যাপারে গলা কাটাকাটি। কাঠের কপালে যদি লেখা থাকে উনুনে ঢোকা, ঢুকবে।"

ঝট্ করে ভেঙ্কান্না বলল, "ঐ কাঠটাকে তো আমাদেরই উনুনে ঢোকাতে হবে। নিজের থেকে কি কাঠ উনুনে ঢোকে?"

"সময় হলে ঐ কাঠটাই উনুনের কাছে আসবে। যোগ্য লোককে দিয়ে ঐ ভগবানই

কাঠটাকে উনুনে ঢুকিয়ে দেবে।”

“আমিই তো সেই যোগ্য লোক মা!”

“বাবা, ছোটাছুটি করে পায়েস খাওয়ার চেয়ে বসে জিরিয়ে জল খাওয়া অনেক ভালো। এত হাঁকপাঁক করলে কোন লাভ হবে না। সবদিন একরকম থাকে না। শুধু নিজের কথা নয়, কিছু করার আগে অন্য দিকটাও ভাবতে হয়। আমি তেল নিয়ে আসি বাবা, ঐ জায়গাটাতে একটু তেল মেখে দিলে ফোলাটা কমবে।” বলে তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নীলি চলে গেল।

সঞ্জীব যেতে যেতে বলল, “চোখ থাকলে না জানি কি করতো।”

রাজু ভেঙ্কান্নাকে লাথি মেরে যা বলার সেখানে বলে ঘরে ঢুকে পায়চারি করতে লাগল। “এবার আমি একটা ইস্‌পার উস্‌পার করে ফেলব। ঐ পুল্লিটাকে জেলের খাঁচায় পুরে ছাড়বো।” বউ বলল, “তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?”

“আমার? আমার হতে যাবে কেন?”

বউ বিরক্ত হয়ে বলল, “আমার আর কি, গোঁফ যখন আছে, তুমি তো ষাঁড়ের সঙ্গেও লড়তে চাইবে। ভেঙ্কান্নাকে গাঁ ছাড়া করব বলছ। পুল্লাইয়াকে জেলে পুরে রাখব বলছ…”

“রাখবোই তো। সারা গাঁয়ের লোক আমার পক্ষে। বিচার হলে আমার জয় হবে।”

“কথায় বলে ‘কোর্টে ওঠে যে গাধায় চড়ে সে’। দেখ, পুল্লাইয়া তো একদিন জেল থেকে বেরোবে, তখন কি তোমাকে সে আস্ত রাখবে? আর ঐ ভেঙ্কান্নাকে তুমি যা ভাবছ সে তা নয়। তোমার এককথায় ও গাঁ ছেড়ে যাবে না। যাওয়ার আগে ও অনেক কাণ্ড করে যাবে। তার চেয়ে আমি যা বলছি শোন।”

“আমি আর কবে তোমার কথা শুনিনি, বল। তোমার কথাতেই তো আমি ওর চোখ উপড়ে ফেলেছিলাম।”

ফিস্‌ফিস্ করে তার কানে বউ কি যেন বলল। রাজু মাথা নেড়ে রাজী হল। ইতিমধ্যে মোড়ল, গোমস্তা এবং পাঁচজন মাতব্বরকে ভজন মন্দিরে জড়ো করে ফেলেছে। পুল্লাইয়াকে ডেকে পাঠানো হল। ওদের প্রশ্নের জবাবে পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। ওরা বলল, “তুমি নাকি ওকে দিয়ে রাজুকে খুন করাতে চেয়েছ?” তাতেও পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। ভেঙ্কান্না চিৎকার করে উঠল, “আমাকে কেউ কিচ্ছু করতে বলেনি, আমি নিজেই করেছি।”

সঞ্জীব রাজুকে বলল, “এই রাজু, ও তো শহরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছে। ওকে ছেড়ে দাও। ওকে আর জেলে পাঠিয়ে কি হবে? ওর বউ ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে ছেড়ে দাও।”

“আমার ডাক শুনে কাল রাত্রে সবাই না এলে এতক্ষণে আমি ছাই হয়ে যেতাম।

আর তুমি বলছ ওকে ছেড়ে দিতে ?" রাজু বলল।

"যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন তা নিয়ে না ভেবে পাঁচজনে যখন এসেছেন তখন বিরোধ যা আছে মিটিয়ে নাও।" সঞ্জীব বলল।

"ঠিক আছে, আমি ওর জমি চাই না। ওর ঘরবাড়িও চাই না। আমার কাছে সব কাগজপত্র আছে, ও আমার কাছে যা নিয়েছে তাই দিয়ে দিক। বেশ একপয়সা সুদও নেবো না।" রাজু বলল।

"এখন ওকে নদীতে ঠেলে দিলে কি হবে ? তখন হাঁকপাঁক করে যা করার করে ফেলেছে। মাইনরের সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার পুল্লাইয়ার এখন কোথায় ?"

গোমস্তা বলল, "ওসব ঝামেলায় গিয়ে কি হবে রাজু। ঐ বাড়িটা পুল্লাইয়া তোমার নামে লিখে দিক। গর্মেণ্ট তো পুল্লাইয়ার মত চাষীদের ঘরবাড়ি করার জমি ফোকটেই দেবে। এই পুরোনো বাড়িটা আর ওর কি দরকার। তাছাড়া ও তো আজ বাদে কাল শহরে চলেই যাচ্ছে। তুমি এক কাজ কর গাড়িভাড়া আর দশদিনের খোরাকি বাবদ ওর হাতে কিছুটা টাকা ধরে দাও।"

"আমি একপয়সাও দেবো না। আমি যে টাকা দিয়েছি সেই টাকা ফেরত চাই। অনেক ক্ষতি স্বীকার করেছি, আর নয়।"

রাজু দৃঢ়তার সঙ্গে বললে মোড়ল সমাধান করার মতন তাকে বলল, "দেখ রাজু, মরা সাপকে লাঠিপেটা করলে কি হবে ? সারা গাঁয়ের লোক জেনে গেছে ঐ তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এই অবস্থায় বেচারি এমনিতেই লজ্জায় মরে যাচ্ছে। আর চেয়ে দেখ বউয়ের মুখের দিকে। অপরাধীর মত বেচারি মাথা নিচু করে আছে। দাও, দাও, আরও টাকা পঞ্চাশেক বেচারিদের হাতে দিয়ে ঐ বাড়িটা আর জমিটা নিজের নামে লিখিয়ে ফেল। ঝামেলা চুকে যাবে। কথায় বলে যে ক্ষতি করে তার উপকার কর। আখেরে ফল ভালো হবে। আমাদের যা বলার বললাম। আমাদের আর কিচ্ছু বলার নেই। কি পুল্লাইয়া, এখন খুশী তো ? তুমি রাজী কিনা পরিষ্কার বল ?"

পুল্লাইয়া মাথা নেড়ে জানাল যে সে রাজী আছে।

"আপনারা পাঁচজনে গুণীজন বসেছেন। গাঁয়ের মাথা আপনারা। আপনারা যা বলবেন আমি কি তা ফেলতে পারি ? এতে আমার ক্ষতিই হল। যাই হোক, আমি মেনে নিচ্ছি।" রাজু এই ছোট্ট ভাষণটি নিবেদন করল। তারপর সভা ভেঙ্গে গেল।

পুল্লাইয়া ভজন মন্দিরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল। ভেঙ্কাম্মা তাকে বলল, "বাবা, এই কি বিচার হল ? তোমার প্রতি শেষে ওরা এই বিচার করল ?" বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল।

"কেঁদো না।" পুল্লাইয়া বলল।

"কাঁদব না ? সব দোষ তুমি ঘাড়ে নিলে। লোকে এখন তোমার দোষ দিচ্ছে। উফ্, আমি যে কি ভুল করলাম বাবা।"

"তোমার কোন দোষ নেই। আমাকে তুমি ভালোবাসো, তাই যা ভালো বুঝেছ করেছ। তোমাকে গাঁ ছাড়া করলে বাঁচবে কি করে? দোষটা তোমার ঘাড়ে চাপলে তোমাকে এই গাঁয়ে কেউ ভিক্ষে দিত? তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে, আমিই তোমাকে পাঠিয়েছিলাম রাজুকে মেরে ফেলতে। ওরা আর আমার কিছু করতে পারবে না। আর আমি এই গাঁয়ের মুখ দেখতে আসবো না।"

"সে কি বাবা! আর আসবে না! মরার আগে আমি নাতিকে একবার আদর করতে পারবো না! মরার সময় নীলাম্মা আমার কাছে থাকবে না! সাধে কি আমি ভগবানকে গালাগাল দি···মানুষের উপর ভগবানের কোন দয়ামায়া নেই। দেখ ঐ রাজুটা একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। তবু আমি কিছুটা দেখতে পাই, ও একেবারে দেখতে পায় না। অন্ধের মত পরের সম্পত্তি গিলে ফেলছে।" তখনও ভেঙ্কাম্মার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনে নীরবে বসেছিল।

সাতাশ

পুল্লাইয়ার সপরিবারে যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। যারা কয়েকবছর আগে পুল্লাইয়াকে বাঘের নাচ নাচতে দেখেছে তারা একবার নাচ দেখাতে বলল। তাদের অনুরোধ পুল্লাইয়া ফেলতে পারল না। গোটা শরীরটাকে বাঘের গায়ের রং-এর মত রং লাগিয়ে নিল সে। মুখে বাঘের মুখোশ পরল। ঐ অবস্থায় বাপকে দেখে মল্লু কিন্তু ভয় পেল না। উল্টে "আমিও বাঘ হব" বলে চেঁচালে মল্লুর গায়েও রং লাগানো হল। একটা সবুজ কাপড়ের উপরে বাঘের মাথা চোখ নাক মুখ এঁকে ন্যাকড়াটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ওর মুখে বেঁধে দেওয়া হল। তার পেছনেও একটা লেজ লাগানো হল। মল্লুকে একটা বাঘের বাচ্চার মত দেখাচ্ছিল। তাকেই আগে বাড়ির চালে তুলে দেওয়া হল। সে ঐ চালে দাঁড়িয়ে বাঘের নাচ নাচতে লাগল। লোকে বলাবলি করল, "বাপের চেয়ে ছেলের নাচটাই জমেছে ভালো।" সেকালে 'যারা পুল্লাইয়ার নাচ দেখেছিল তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "এই কি সেই পুল্লাইয়া! এত রোগা হয়ে গেছে। কী স্বাস্থ্য ছিল, এখন তো একেবারে খাঁচা রয়ে গেছে। খালি হাড়!"

নাচ শেষ করে গায়ের রং ছাড়িয়ে নদীতে স্নান করে ফিরতে ফিরতে পুল্লাইয়ার রাত হয়ে গেল। ভীষণ খিদে পায় ঐ নাচ নাচলে। কিন্তু ঘরে ছিল অল্প একটু ফ্যান। ছেলে চোঁ মেরে ফ্যানটা খেল। পুল্লাইয়া নীলিকে বলল, "আর নয়, আর বেশীদিন নয়। শহরে গিয়ে কুলিগিরি করব। ওরা একবস্তা বইলে আমি দু'বস্তা বইতে পারব। আমাদের পেটের জ্বালা বেশীদিন আর থাকবে না।"

"গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল।" নীলি বলল।

"দেখবে, আর আমাদের ভাগ্যে খারাপ দিন আসবে না। সারাদিন খাটবো। ন্যায় নীতির পক্ষে থাকবো। আমার ছেলেমেয়েদের কোনদিন কষ্ট হবে না।"

গাঁ ছাড়া পর্যন্ত পুল্লাইয়া সারাদিন বক্‌বক্‌ করতে থাকে। সবাইকে বলা হয়ে গেছে। নীলি ভেঙ্কান্না, গন্নেম্মা ও কুষ্ঠরুগীকে "কাল চলে যাবো" বলে সেদিন রাত্রে খেয়ে যেতে বলল। সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছে ওরা। মল্লুর খেলার জন্য পুল্লাইয়া একটা মাটির পুতুল বানিয়ে দিয়েছিল। সেটা হাতে পড়তেই অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল পুল্লাইয়া। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সে পারল না। "একদিন না একদিন ছেলে তো গাঁয়ের মাটি দেখতে চাইবে। তখন এটাকেই দেখাবো। থাক সঙ্গে থাক।"

সকাল হল। একটু একটু শীত করছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল না। সূর্যের আবছা আলো দেখা যাচ্ছিল। নদী বইছে। একটা বস্তায় সমস্ত জিনিস পুরে সেটা কাঁধে ফেলে নিল পুল্লাইয়া। নীলির কোলে বাচ্চা মেয়ে। সঙ্গে আছে পিসা, আদেম্মাপ্পা, ভেঙ্কান্না সবাই। বাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে পথ হাঁটতে লাগল। আর পেছন ফিরে নিজের বাড়ির দিকে তাকালো না। যাওয়ার সময় মেয়েরা মাঝে মাঝে এগিয়ে এসে নীলির সঙ্গে দু'একটি কথা বলল। নীলি মাথা না তুলে ক্ষীণকণ্ঠে দু'একটি কথা বলছিল। আদেম্মাপ্পা পুল্লাইয়াকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলল, "দেখ বাবা, ভালোভাবে থাকলে, খাটলে দুবেলা পেট ভরে খেতে পারবে। হাঁক পাঁক করবে না। কোন ব্যাপারে জিদ্‌ ধরবে না। ওর কথামত চললে তোমার ভালোই হবে। দু'পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে আসার চেষ্টা করো। তুমি গাঁয়ে ফিরে এলে কে তোমাকে বাধা দেবে।" এবার শুরু করল পিসা। "দেখ পুল্লি, অতবড় শহরের এক-কোণে তোমরা ঠিক থাকতে পারবে না। আমার গর্মেণ্ট যতবড় হবে তোমাদের তত সুখ সুবিধা বাড়বে। লক্ষণ দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি। তবে বাবা শহরে গিয়ে আমাদের যেন ভুলে যেও না।"

ওরা নীলাম্মার মন্দিরের কাছে এল। সেখানে থেমে নীলি ও পুল্লাইয়া দেবীকে প্রণাম করল। বাপ-মায়ের দেখাদেখি মল্লুও জোড়হাত করে নমস্কার করল। তারপর রাস্তায় উঠল। পুল্লাইয়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। সমস্ত ক্ষেত ধানগাছে ভরে রয়েছে। কোন কোনটা একটু আধটু এখনও সবুজ আছে। বেশীরভাগ ক্ষেতের ধানে সোনালী রং ধরেছে। একরের পর একর জমিতে ধানগাছগুলো দুলছে। দেখে মনে হয় যেন একটা বিরাট মাঠ, অন্যদিকে গ্রাম। দুএকটি জায়গা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নীলাম্মা মন্দিরের দেয়ালগুলো কালো হয়ে গেছে। এসবের দিকে তাকিয়ে তার ভেতরটা কেমন খাঁ খাঁ করে উঠল। যারা এগিয়ে দিতে এসেছিল তারা থেমে গেল। ওদের কারও কারও চোখে জল। ভেঙ্কান্না আর কুষ্ঠরোগী হাত তুলে চোখ মুছল না। ওদের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। মুখে ন্যাকড়ার পোঁটলা পুরে

ওরা ওদের কান্না চেপে রাখছিল।

পুল্লাইয়ার পা যেন অসাড় হয়ে গেল। সাত মাইল দূরে স্টেশন। এতটা পথ হাঁটতে হবে। পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। গ্রামকে যে এতটা ভালোবাসে তা সে এর আগে কোনদিন বুঝতে পারেনি। "যত খারাপ হোক তবু তো আমার গ্রাম। এই সোনার গ্রামকে ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। আর কোনদিন ফিরব না এই গ্রামে! আর কোনদিন দেখব না আমার গ্রামের এই ক্ষেত, এই মন্দির, এই নদী। না, যাবো না, গ্রাম ছেড়ে যাবো না। এখানেই না খেয়ে মরে ছাই হয়ে যাই তবু ভালো।" এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে সে একপা একপা করে এগিয়ে যেতে লাগল। চোখের জল সে থামাতে পারছিল না। বুকটা তার ফেটে যাচ্ছিল। পায়ে যেন তার গোদ হয়েছে। মাঝে মাঝে সে পিছন ফিরে গ্রামের দিকে তাকাচ্ছিল। নীলি মাথা নীচু করে তার পেছন পেছন হাঁটছিল। একটি কথাও সে বলল না। ওর দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়ার প্রথমে একটু লজ্জা করল। তারপর তার প্রতি করুণা জাগল। মেয়েটার কত সাধ ছিল নিজের গ্রামে সংসার পাতার···পারল না।

নিজেকে কি যেন সে বলতে চাইল কিন্তু বলতে পারল না। নীলিকে এভাবে নীরবে হাঁটতে দেখে পুল্লাইয়ার ভালো লাগল না। একবার সে মাথা তুলে তাকাল তার দিকে। কিন্তু কোন কথা বলল না। মল্লু এমনভাবে হাঁটছে যেন সে একটা পুঁচকে সিপাই। সকলের সামনেই সে হাঁটছে। সামনে দিয়ে ভেড়ার পাল আসছিল। রাখাল মল্লুকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছো?" মল্লু খুব খুশী হয়ে জোরে জোরে বলল, "শহরে যাচ্ছি।"

গাঁয়ের দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে ভেড়াগুলো চলে গেল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভারী পায়ে পুল্লাইয়া এগিয়ে গেল।

আঠাশ

সবাই স্টেশনে পৌছাল। পৌছে ঘামটা মুছে নিল। এককোণে বসল। কিছুক্ষণ পরে পুল্লাইয়া দাঁড়াল। মল্লুও পাশে দাঁড়াল। এক টাকা ভাঙ্গিয়ে পাকা কলা, ঝুরি ভাজা কিনল। কিছুই বাঁচল না টাকার মধ্যে। ওসব খেয়ে ওরা জল খেল। একটা মালগাড়ি এল। মালগাড়ি দেখে মল্লু খুব উৎসাহিত হল। সে একটার পর একটা প্রশ্ন করে গেল বাপকে। মাঝে মাঝে বাপ বিরক্ত হল। তার মুখটা যেন রাগে অভিমানে ক্ষোভে ঝলসে গেছে। বিকেল তিনটে দশে রেলগাড়ি এল। ভীষণ ভিড়। তিল ধারণের জায়গা নেই সেখানে। পুল্লাইয়া একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ওদের নিয়ে ছোটাছুটি করল। এক জায়গায় উঠতে গেল, ভেতর থেকে ঠেলা খেয়ে বেরিয়ে এল। এক জায়গায় খুব খালি ছিল। একই রকম পোশাক পরা লোকগুলো ছিল তাতে। ওরা বলল, "এখানে উঠলে জেলে যেতে হবে। শেষে কোন রকমে এক জায়গায় উঠতে না উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। ওরা যেখানে উঠল সেখানেই টিকিট-

বিহীন যাত্রী দুজন গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠল। কামরা ভর্তি যাত্রী গিজগিজ করছে। নিচেও বসার জায়গা নেই। পোঁটলার উপরে মল্লু বসল। পুল্লাইয়া আর নীলি দাঁড়িয়ে রইল। নীলির কোলে বাচ্চাটা। রেলগাড়ি এগিয়ে চলেছে।

মল্লু খুব খুশী। দু হাতে তালি বাজাতে বাজাতে সে আপন মনে কি সব বলে গেল। চার পাঁচটা স্টেশনের পরে কামরায় ভিড় একটু কমল। রেলের বাঁশী বেজে উঠল। মল্লুও দুটো আঙুল মুখে পুরে বাঁশী বাজাল। তার মা-বাবা ততক্ষণে নিচে একটু জায়গা করে নিয়ে বসে পড়েছে। অতীতের অনেক কিছুই পুল্লাইয়ার মনে পড়ছিল। নিজের ঘর বাড়ি, ক্ষেত, মন্দির, পথঘাট আরও কত কি। গাঁয়ের বাচ্চারা কি তাকে কম ভালবাসতো। ভেঙ্কান্না, রাজু, আদেম্মাপ্পা সকলের মুখের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। হঠাৎ বুড়ির কথাও মনে পড়ল—নীলির দিদিমা আজ বেঁচে থাকলে কি বলত কে জানে। রামু থাকলে নীলাম্মা দেবীর ইচ্ছাটা জানা যেত। একদিন না একদিন আবার নিজের গ্রামে ফিরে এসে মরতে ইচ্ছে করল তার। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মল্লু লাফাতে লাফাতে উৎসাহের সঙ্গে বলল, "বাবা, ঐ দেখ, দেখ গাছ পাহাড় সব আমাদের দেশের দিকে ছুটে যাচ্ছে।"

মল্লুর কথা শুনে পুল্লাইয়ার খেয়াল হল যে সে রেলগাড়িতে বসে আছে। ওর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে পুল্লাইয়া শহরের কথা ভাবতে লাগল। তার খুব ইচ্ছে করল শহরে গিয়ে ভালভাবে থাকার।

ট্রেনে ওয়ালটেয়ার পৌঁছাল রাত আটটায়। প্রত্যেকটা কামরায় লাঠিধারী পুলিশ নিয়ে টিকিট কালেক্টর টিকিট আছে কিনা দেখছিল। কোট পরা লোকটা গেটের কাছে ছিল। টিকিট কালেক্টর ওদের থামিয়ে বস্তায় চাল আছে কিনা জিজ্ঞেস করল। পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। নীলি বলল, "দু বেলা খাওয়ার চাল আছে বাবা।" "এখানে দাঁড়াও, পুলিশ আসবে।" নীলির ভয় করল। ওদের কামরায় একটা লোক বাবু সেজে বসেছিল। ওর ট্রাঙ্ক ভর্তি চাল ছিল। ট্রাঙ্কটা কুলির মাথায় চাপিয়ে সে দিব্যি চলে গেল। শহরে এসে নীলির এটাই প্রথম অভিজ্ঞতা হল। শেষে টিকিট কালেক্টর চারটাকা হাতে নিয়ে ওদের ছেড়ে দিলে পুল্লাইয়া কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে নীলি তাকে বলল, "চুপ কর তো, আমাদের তো জেলে যেতে হত। জেলের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, আর ও কটা টাকা নেবে না?"

মল্লু রাস্তার আলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার পাশ দিয়ে গাড়ি চলে যেতে আশ্চর্য হল। অত রিক্সা আর বাস দেখে সে থতমত খেয়ে গেল। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বিরাট বিরাট বাড়ির দিকে তাকাতে লাগল। এক জায়গায় লাউডস্পীকারে সিনেমার গান শোনা যাচ্ছিল। মল্লু কিছুতেই সেখান থেকে সরবে না। পুল্লাইয়া জোর করে ওকে টানতে টানতে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করল। মল্লু বলল,

"বাবা, অত জোরে গান গাইছে, লোকটা কত বড় গো ?"

"ওটা মানুষ নয়। গ্রামোফোন গাইছে।" পুল্লাইয়া বলল।

"গ্রামোফোন! সেটা কি বাবা ?"

"সেটা একটা বাক্স।"

"বাক্স গান গায় ? আমার জন্য একটা বাক্স কিনে দাও না।"

"টাকাপয়সা হোক, ও রকম অনেক বাক্স কিনে দেব।" দুপা এগোতেই ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যাওয়া চলন্ত মিষ্টির দোকান নজরে পড়ল। "বাবা, বাবা, ঐ দেখ" বলে থেমে গেল সে। ছেলেরা হাতে পুরিয়া নিয়ে গজা মিষ্টি খেতে খেতে যাচ্ছিল। ঐসব ছেলেদের পরণে প্যান্ট, পা জামা, গায়ে জামা। মেয়েদের গায়েও জামা। কিছুক্ষণ পরে মল্লু বলল, "বাবা, আমাকে ঐরকমটা কিনে দাও। ঐ যে ঐ ছেলেটা পরেছে। আর দেখ, বোনের জন্য এরকমটা কিনে দাও।" বলে বিভিন্ন ছেলে মেয়ের দিকে তাকাল।

"সব কি আজকে কেনা যায় বাবা ? কালকে কিনবখন।"

টার্ণার ধর্মশালায় পা রাখতেই একটা কুকুর ঘেউ করে উঠল। মল্লু কু কু করে কুকুরটাকে ডাকল ; তাকে একটা পকোড়া খেতে দিল। ব্যাস কুকুরটা লেজ নাড়তে লাগল। তারপর আর ওদের ছাড়েনি। একটার পর একটা মল্লু দিয়ে গেল, সেও খেয়ে গেল। কুকুরের সঙ্গে খেলতে খেলতে মল্লু আর কোন প্রশ্ন বাপকে করেনি। নামেই ধর্মশালা। এতে আবার নানা রকমের ব্যবস্থা আছে। ধনীদের থাকার এক ব্যবস্থা আছে। ওরা মোটামুটি দক্ষিণা ভালই দেয়। মধ্যবিত্তদের থাকার আর এক ব্যবস্থা। তারাও ফিরে যাওয়ার সময় কিছু দেয়। কিন্তু যারা কিছুই দিতে পারে না তাদের থাকতে হয় তালপাতা দিয়ে তৈরি একটা বিরাট ঘরে। সেখানে সবাই এক সঙ্গে থাকে। ঐ ঘরের একটা কোণে পুল্লাইয়া বস্তা নামাল। সিমৃহাচলম দর্শন করে তীর্থযাত্রীরা ঐ ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছে। দু একদিন পরে চলে যাবে। ঘরটা ভরে রয়েছে। এক কোণে ইঁট বসিয়ে অনেকে রান্না করছে। কয়েকটি বাচ্চার কান্না শোনা গেল। কয়েকটি ব্যাটাছেলে এক জায়গায় বসে একথা সেকথার পরে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করল। একটা বুড়ো লাঠি হাতে নিয়ে কুকুরকে তাড়াচ্ছিল। যেখানে সেখানে কফ্ আর থুথুর দাগ। ভাত ডালও যত্র তত্র ছড়ানো আছে।

পুল্লাইয়া কাঠ তেল ইত্যাদি কিনে আনল। নীলি রান্নার জোগাড় করল। মল্লুর সময় ভালই কাটছিল। আবার মেঝেতে শোয়ানো বোনকে আদরও করছিল সে।

ওদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু তখনও অনেকের রান্না শেষ হয়নি। হঠাৎ দুটি বউ কোমরে কষে আঁচল বেঁধে চুলোচুলি করে ঝগড়া শুরু করে দিল। আর একটা লোক তার ছোট বউকে ধরে অনুরোধ করতে লাগল, "এত লোকের মধ্যে

আমার ইজ্জত নিও না।" একটা বুড়ো তার বউমাকে আরও বেশী করে ভাত রাঁধতে বলছিল। বউমা রাজী না হওয়াতে বুড়োটা নিজের মৃত মেয়ের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগল। আর একটি বউ বেশ করে মাছ ভেজে চারদিকে মাছের গন্ধ ছুটিয়ে দিয়েছিল। অন্য কোণে গাঁ থেকে এসেছিল একটা রুগী। হাসপাতাল থেকে জায়গা না পেয়ে সেখানেই মরণকান্না কাঁদছিল। এদের কাছাকাছি বসে একটা যুবক রাজ্যের সিনেমার গান গাইছিল। আর একটি যুবক অজানা এক যুবতীর সঙ্গে রসিকতা করছিল। আর একটা লোক ওদের উপরে নজর রাখছিল। লোকটা ঐ যুবতীরই গ্রামের লোক। সে ওদের দৌড় দেখছিল। একটা চোর কলতলার কাছাকাছি বসে কোন্ মহিলার গলায় কি ধরণের অলঙ্কার আছে লক্ষ্য করছিল। একটা কুকুর আর একটা কুকুরের উপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। এই ছোট্ট জটিল জগতের অবস্থা দেখে নীলি ও পুল্লাইয়া হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওরা আর জেগে থাকতে না পেরে শুয়ে পড়ল। মাঝখানে শোয়ালো মল্লু আর মেয়েকে। পুল্লাইয়া মাথার কাছে বস্তাটাকে রাখল। যে কুকুরটাকে মল্লু খেতে দিয়েছিল সে মল্লু ও তার বোনের পায়ের দিকে গুটিয়ে শুয়ে রইল। গভীর রাত্রে শীত করছিল। পুল্লাইয়া গায়ে ঢাকা দেওয়ার জন্য বস্তা থেকে ধুতি বের করল। লক্ষ্য করল বউ ছেলেমেয়ে পেটে পা ঢুকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

মনে হচ্ছিল সবাই ঘুমোচ্ছে। রাস্তায় জ্বলছিল মার্কারির বালবের আলো। হঠাৎ মনে হল তাকে কে যেন বাবা বলে ডাকছে। একবার নয় দুবার। একটা বুড়ো ডাকছিল। পুল্লাইয়ার মনে হল যেন রামু ডাকছে। সে ভাবল হতে পারে। হয়ত রামু কি ভাবে শহরে চলতে হবে তা শেখানোর জন্য এসেছে। রামুর কথা মনে পড়তেই তার সমস্ত শরীরে কি যেন বয়ে গেল। না রামু নয়, অন্য কেউ তাকে ডাকছে। বুড়ো। কি রকম সবিনয় ডাকার ভঙ্গি। বুড়োর কাছে যেতে হল। গেলে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে কানে কানে কি যেন বলল। পুল্লাইয়া তাকে ফিসফিস করে বলল, "ঠিক আছে দাদু, আপনি ঘুমান আমি দেখছি।" বস্তা থেকে ধুতি বের করে ছেলে মেয়ের গা ঢেকে দিল। নিজে ঘুমিয়ে পড়ার মত শুয়ে রইল। সমস্ত শরীরে হাজারটা চোখ নিয়ে সে যেন সজাগ রইল।

অন্ধকার রাত্রি। চারদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। বুড়োটা নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল। কেউ জেগে আছে বলে মনে হয় না। একমাত্র পুল্লাইয়ার চোখেই ঘুম নেই। কলতলার আড়াল থেকে দুটি লোক বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছিল। পুল্লাইয়ার হাত নিসপিস করছে। মনে দারুণ উৎসাহ।

ওরা নুয়ে আস্তে আস্তে এক মহিলার মাথার দিকে বসে তার গলার দিকে হাত

বাড়াতেই পুল্লাইয়া ঝট্ করে উঠে সিংহের মত ওদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল মুষ্টিযুদ্ধ। সবাই জেগে গেল। চারদিকে চোর চোর শব্দ। মার শালাকে, ধর শালাকে বলে চেঁচামেচি। হাতের কাঁচি দিয়ে পুল্লাইয়ার মাথায় একটা চোর মারল। অন্য চোরটা তার গেঞ্জিটা ধরে "এই তো চোর, ধরুন, মারুন" বলে চিৎকার করতে লাগল। অন্য চোর জোরে জোরে বলতে লাগল, "এই চোরটাই ঐ মহিলার গলা থেকে হার কেটে নিচ্ছিল। এই যে, "এই কাঁচিটা দিয়ে কাটতে যাচ্ছিল।" বলে পুল্লাইয়ার হাতে কাঁচি দিয়ে লোকের ভিড়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ওরা কাটার তালে ছিল। একটা চোর একটু সরে গিয়ে বলল, "আরে মশাই আমরা না উঠে পড়লে এতক্ষণে ব্যাটা হার নিয়ে পালাত। দেখুন দেখি, তীর্থযাত্রী সেজে কি সর্বনাশটা করতে যাচ্ছিল।"

পুল্লাইয়া মাথায় কেটে যাওয়া জায়গাটায় হাত দিয়ে কিছু বলার আগেই তার পিঠে দমাদম পড়তে লাগল। ছুটে এসে নীলি আড়াল করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "আরে শুনুন, শুনুন!"

"ঐ তো দলের লোক।"

"পুলিশে দিয়ে দিন।"

ইতিমধ্যে ঐ বুড়োটা সেখানে পৌঁছে পুল্লাইয়াকে দেখল। বুড়োকে দেখে পুল্লাইয়া সাহস পেয়ে চিৎকার করে বলল, "ঐ দেখুন চোর চলে যাচ্ছে। ধরুন, ধরুন।" ততক্ষণে চোর দুটো অনেক দূর চলে গিয়েছিল। বুড়ো পুল্লাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, ওদের ধরেছিলে? তোমাকে ওরা মেরেছে। ইস্…কোথায়, ওরা কোথায়?"

পুল্লাইয়া বলল, "আপনার কথামত সজাগ ছিলাম। দুটো চোরকেই ধরেছিলাম। কোথায় ছিলেন আপনি এতক্ষণ?"

"আর বাবা, বুড়ো হয়েছি। ঝিমুনি এসেছিল।"

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই আসল ঘটনা জানতে পারল।

নীলি স্বামীর মাথায় কাপড় বেঁধে তাকে মেঝেতে শোয়াল। চারজনে চাররকম মন্তব্য করল, দুঃখ করল, সহানুভূতি দেখাল। বুড়ো বলল, "তুমি একা ছুটে গেলে বাবা, আর একজনকে তুলে নিয়ে যেতে পারলে না?"

মল্লুর কান্না পায়নি। সে কুকুরের বাচ্চাকে বলছিল, "দেখ আমার বাবা একা দু দুটো চোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুমদাম মেরেছে। চোরগুলো ভোঁ ভোঁ করে পালিয়েছে।"

পুল্লাইয়া তার কথা শুনে হাসল। মাথা ফেটে এতক্ষণ রক্ত গড়াচ্ছিল। এখন রক্ত আর গড়াচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে নীলি বলল, "বেলা থাকতে আজকে একটা ঘর খোঁজ। আজকে রাতটা আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।"

"না এখানেই থাকতে হবে। ও শালারা আজ রাত্রে আবার আসবে। এবার ওদের

ধরে যা দেব না!" পুল্লাইয়া বলল।

"দেখ, তীর্থযাত্রীরা অনেকেই চলে যাবে। চোরগুলো যদি দল বেঁধে দশ-বারজন আসে তাহলে কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? কাল রাত্রে ওদের ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়েছ। আজ রাত্রে ওরা কি তোমাকে আস্ত রাখবে? নেহাৎ চোর দুটো ভালো ছিল তাই। তা না হলে ওরা যদি তোমার পেটে কাঁচিটা ঢুকিয়ে দিত তাহলে তোমার কি অবস্থা হত বলত। নতুন জায়গায় এসে এসব করা কি উচিত? যেখানে সেখানে সাহস দেখালে চলবে? পুল্লাইয়া কোন জবাব দিল না। পান্তাভাত খেয়ে সকাল সকাল ঘর খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। মল্লু কুকুরের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সঙ্গে গেল। যে তল্লাটে তালপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর ছিল সেখানে পুল্লাইয়া গেল। ছাউনিগুলো একেবারে নিচে পর্যন্ত এসে গেছে। ঘরে আলো হাওয়া ঢুকছে না দেখে তার পছন্দ হল না। তার বিরক্তি জাগল। অনেকে বলল, "শহরে এ রকম ঘর খালি পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা তল্লাটে দুর্গন্ধ। যেখানে সেখানে দাঁড়াতে পারল না। মাছি তো ঘুরছেই দিনের বেলা মশাও ভোঁ ভোঁ করছে। মানুষগুলো এরকম একটা জায়গায় কি ভাবে আছে তা ভেবে পুল্লাইয়া অবাক হল। একটার সঙ্গে একটা ঘর একেবারে সেঁটে রয়েছে। একটা ঘরে আগুন লাগলে গোটা তল্লাট পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার নিজের গ্রামেও ঘরে আগুন লাগত। আগুন লাগলে দু একটি ঘর পুড়ত। আর আগুন নেভানোও সহজ ছিল। এখানে তো নড়াচড়ার জায়গা নেই। অথচ যেভাবেই হোক একটা ঘর খুঁজতে হবে। এক একটা ঘরের ভাড়া পাঁচ থেকে দশ। তার উপর এক-মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে। ভাড়া উঠতে না উঠতেই অগ্রিম টাকা দিলে তাদের কাছে আর থাকবেই বা কি!

ঘুরতে ঘুরতে দুপুরের দিকে ওরা সমুদ্রের তীরে গেল। সমুদ্র দেখে মল্লু ভয় পায়নি। আনন্দে বালির উপর লাফাতে লাফাতে মল্লু বলল, "বাবা, বাবা, দেখ দেখ কত বড় পুকুর।" প্রথম সমুদ্র দেখছে সে। পুল্লাইয়া হেসে বলল, "পুকুর নয় রে, সমুদ্দ্‌র—সমুদ্দুর!"

"সমুদ্দ্‌র মানে কি বাবা?"

"জল নোনতা। ঐ জলে নুন হয়।"

"এমনি এমনি হয়, না লাঙ্গল চালাতে হয়?"

"ঐ জল আটকে রাখে। জল শুকিয়ে নুন হয়।"

"তাহলে ফ্যানে এই জল দিয়ে খাব। নুন লাগবে না!"

"এই জল ফ্যানে দেয় না।" বলে পুল্লাইয়া তার হাত ধরে জলের কাছে নিয়ে গেল।

তক্ষুনি বন্দর ছেড়ে একটি স্টিমার চলে যাচ্ছিল। ওটা দেখিয়ে মল্লু চিৎকার করে উঠল, "বাবা, বাবা, দেখ, দেখ, কত্ত বড় একটা…"

"ওটার নাম জাহাজ। ওটাতে চড়ে রেঙ্গুন যাওয়া যায়।"

"বাবা, আমরা যাব ?"

"এখন না। আগে ঘর খুঁজি। কাজ পেয়ে গেলে টাকা পাব, তারপর…"

বাপ আর ছেলে ফিরে এল ধর্মশালায়। হাঁটতে হাঁটতে মল্লুর পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। পুল্লাইয়া খেয়ে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ল। ছেলে নিজের পায়ে হাত দিয়ে কুকুর ছানাকে বলল, "দেখ, এই পায়ে খুব ব্যথা।" কুকুরটা মল্লুর পা একবার চেটে দিল।

পুল্লাইয়া ঘুম থেকে উঠে দেখে অনেক তীর্থযাত্রী চলে গেছে। রাত্রে ওরা একা পড়ে যাবে কিনা ভাবছিল। নীলিকে জানিয়ে দিল ভাল ঘর পাওয়া কষ্টকর। যেখানে যেখানে ওরা গিয়েছিল, যা যা দেখল, সে সব নীলিকে বলল। নীলি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "তুমি এখানে বস। আমি ঘর ঠিক করে আসছি।"

"পাগল হয়েছ! এই শহরে তুমি ঘর খুঁজবে ? আর একবার পথ হারালে রক্ষে আছে!"

"বোবা নাকি আমি ? মুখ থাকলে ঠিকানা খুঁজে পাবো না ? তুমি গেলে ঘর পাবে না। কোন ঘরই তোমার পছন্দ হবে না। আমাদের যা অবস্থা সেই বুঝে তো ঘর নিতে হবে। কোঠা-বাড়িতে থাকতে চাইলে হবে কেন! যতবড় মুখ নয় তত বড় টিপ। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তুমি এখানেই বসে থাক আমি ঘুরে আসছি।" বলে নীলি বেরিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যে নাগাদ নীলি ফিরে এল। পুল্লাইয়া তার দিকে এত বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, "এখনি ভাবছিলাম, তোমাকে খুঁজতে বেরুব।"

"পথে ঘাটে জনমানুষ আছে। ওদের জিজ্ঞেস করে চলে এসেছি।"

"ঘর পেয়েছ ?"

"মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পেয়েছি। এখানে তাড়াতাড়ি দুমুঠো খেয়ে চল চলে যাই।"

"পথ চিনে যেতে পারবে ?"

"এই তো কাছেই। হারবারে যাওয়ার পথে। রাস্তার পাশেই খাল আছে। বিরাট বড় একটা বটগাছ আছে।"

তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নতুন ঘরের দিকে ওরা বেরিয়ে পড়ল। মল্লু পরিচিত জায়গার মত কুকুরছানাকে কোলে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। তার কাঁধে হাত দিয়ে মাথায় বস্তা নিয়ে পুল্লাইয়া এগিয়ে চলল।

"ঐ সেই বটগাছ…"

মল্লু নাকটা কুঁচকে বলল, "বাবা, গন্ধ।" সারা রাস্তাটাই দুর্গন্ধ ছিল। যে ঘর ঠিক করা ছিল সেই ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের বউয়ের কান্না শুনল। সে কাঁদছে।

স্বামী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

"এসেই কান্না শুনলাম।" বলতে বলতে মাথা থেকে বস্তা নামিয়ে পুল্লাইয়া চারদিকে তাকাল। পাশেই খাল। ঐ খালে সারা শহরের আবর্জনা এনে ফেলে আরও দুটো ছোট খাল। সামনেই মিউনিসিপ্যালিটির অনেকগুলো ভাঙ্গাচোরা গাড়ি। রাস্তাও একটা আছে। রাস্তার পাশেই খাল। রাস্তার গা ঘেঁষে পঁচিশটা ঘরের একটা ছাউনি। পাশাপাশি ঘর। একটা ঘর বলে যেটাকে মনে হয় তার ভেতরে আছে চারটে ঘর। দেয়াল বলতে দরমা। একটা ঘরের ফিসফাস শব্দ অন্য ঘর থেকে শোনা যায়। ওঘরে কি হচ্ছে তা দরমার ফুটো দিয়ে এঘর থেকে দেখা যায়। ঘরের সামনে হাত তিনেক জায়গা আছে। জায়গাটা রাস্তার না বাড়িওয়ালার বলা মুস্কিল। ঘরের পেছনের দিকে যে জায়গাটুকু আছে সেখানেই রান্না হয়। খালের জল ভরে গেলে সেখানে রান্না করা যায় না। ঘরেও মাঝে মাঝে জল ঢুকে যায়। ওদের উপরে মেঘের রাগ হলে ঘরে যে জল ঢোকে তা টানা অনেক দিন থাকে।

সব দেখে শুনে বিরক্ত হয়ে পুল্লাইয়া বলল, "ভাড়া কত?"

"দু-টাকা···" বলে নীলি পাশের ঘরে যে বউটা কাঁদছিল তাকে সান্ত্বনা দিতে গেল। ওকে যত চুপ করানোর চেষ্টা করে, সান্ত্বনা দেয় ততই বউটা কাঁদতে থাকে। এদিকে মল্লু কি যে হচ্ছে জানার জন্য একটার পর একটা প্রশ্ন বাপকে করে যাচ্ছে। পুল্লাইয়ার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না। সেখানকার দুর্গন্ধ সে সহ্য করতে পারছিল না। সে অবাক হয়ে ভাবল এতগুলো লোক এখানে আছে কি করে? পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, নানা ধরনের মোটরগাড়ি। সেই গাড়ির ভেতরে ভাল ভাল পোশাক পরা লোকগুলোও চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ গাড়িতে বসেই নাকে রুমাল দিয়ে যাচ্ছে। ওরাও এই শহরেরই নাগরিক···এরাও এই শহরের নাগরিক। কেউ থাকে কোঠাবাড়িতে, আর কেউ আছে তালপাতার ঘরে। ছাউনিগুলো একেবারে জমির সঙ্গে যেন মিশে গেছে। সেই রাত্রে সেখানে দাঁড়িয়ে পুল্লাইয়ার বার বার মনে পড়ছিল বাড়ির কথা। সেই অশ্বত্থ গাছের পাখির কলরব, গোশালের বলদ, কত ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ছিল তার ঘর। নদীর কুলুকুল ধ্বনি। প্রকৃতির সেই কি শোভা। এই নরকের দুর্গন্ধে দাঁড়িয়ে তার আরও বেশী করে মনে পড়ছিল নিজের গ্রামের কথা। এটা ওটা সে যখন ভাবছিল তখন মল্লু তার সামনে দাঁড়িয়ে কানে হাত চেপে বাবা বলে চিৎকার করে উঠল। বউটার কান্না শুনে ছেলেটা আর সহ্য করতে পারল না।

এতক্ষণে পুল্লাইয়ার খেয়াল হল। সেও বউটার কান্না ভাল করে শুনল। মরণ কান্না। কান্না শুনে মনে হয় কেউ মরে গছে। বউটা যে বাচ্চাটাকে পুষেছিল সেই বাচ্চাটা মরে গেছে। তাই অত কান্না। স্বামী যে সব কথা বলে বউকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তাও পুল্লাইয়ার কানে এল। নীলির দু'একটি কথাও ভেসে আসছিল। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগল বউ কাঁদছে, স্বামী সান্ত্বনা দিচ্ছে। গোটা তল্লাটে কি আর মানুষ নেই!

শেষে নীলিকেই যেতে হল ! অন্য ঘর থেকে একটা লোক পুল্লাইয়াকে জিজ্ঞেস করল, "কোন গাঁয়ের লোক আপনারা ? কোন দিকে বাড়ি ?"

"পূবদিকে। আমাদের গাঁয়ের নাম নবিরি।"

"কতদিন হল এসেছ ?"

"কালকেই..."

"কোথাও কাজ মিলেছে ?"

"কাজের জন্যই তো আসা।"

"দেখতেই শহর। শুধু নাম। এর চেয়ে গাঁ অনেক ভাল। এই শহরে আছেটা কি ? চারদিকে দুর্গন্ধ। সব পুতুল। পু-তু-ল !"

"পুতুল ?"

"আবার কি ? সিনেমা দেখা হয়েছে ? সিনেমা দেখে আমাদের যেমন আনন্দ হয় শহর দেখেও তাই।" কিছুক্ষণ লোকটা কোন কথা বলল না। তারপর আবার শুরু করল, প্রত্যেক দিন চারদিকের জংলী লোকগুলো এই শহরে ছুটে আসছে। এত লোক এলে আমরা কাজ পাব কোত্থেকে ?"

পুল্লাইয়ার গায়ে যেন সরাসরি খোঁচা লাগল। সে বলল, "আগে ঠিক ভাবে কথা বলতে শেখো ভাই !"

"ঠিক ভাবেই বলছি। আজ সকালেই মড়াটা এই ঘর থেকে নড়েছে। আর সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘরে ঢুকতে এসে গেছ। বেঠিক আর কি বলেছি।" ওর কথা শুনে নীলির উপরে পুল্লাইয়ার রাগ হল। ঘরের অবস্থা বুঝে তার ভাড়া নেওয়া উচিত ছিল। ছ্যা ছ্যা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে মড়ার ঘরে !"

নীলি এসে লক্ষ ধরিয়ে ডান পা প্রথমে রেখে ঘরে ঢুকল। ঐ বস্তায় জড়ানো পোঁটলাটা নীলি বয়ে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর। কিন্তু পুল্লাইয়া যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে রইল। বাপের পাশেই ছেলে বসে রইল। বারান্দায় শোয়ার জন্য মল্লুকে টানলে সে গন্ধ গন্ধ করে সেখানে যেতে চাইল না। এ পাশের ঘরের দম্পতি ওর কথা শুনে হো হো করে হাসল। এতে যে হাসির কি আছে তা নীলি ভেবে পেল না। ঘরে বসে নীলি নীলাম্মাদেবী ও নিজের দিদিমাকে স্মরণ করে কাত হল। পাশেই মেয়েকে শোয়াল। তার নাকেও দুর্গন্ধ যাচ্ছিল। তবু তার মনে আনন্দও হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে পুল্লাইয়া বারান্দায় শুয়ে পড়লে নিরুপায় হয়ে মল্লু গিয়ে তার বুকের উপর শুয়ে পড়ল। পুল্লাইয়া ছেলের পিঠে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে ঘুম পাড়িয়ে আস্তে আস্তে পাশে শুইয়ে দিল। মাঝে মাঝে পাশের ঘরের বউটার গোঙানি শোনা যাচ্ছিল। অন্য পাশের ঘর থেকে আস্তে আস্তে কথাগুলো ভেসে আসছিল।

পুরুষের গলা : "আরও কাছে এসো না···সিনেমায় দেখ কত কাছে আসে··"

নারী কণ্ঠ : "আমার কি সিনেমার নায়িকার মত চেহারা ?"

পুরুষ : "তবে আর বলছিটা কি।"

নারী : "তাহলে তুমি নায়ক, হিরো ? তাহলে তুমি সিগারেট খাও ! সিনেমায় তো খায়। সিগারেট ধরালে না তোমাকে একেবারে নাগেশ্বর রাও-এর মত দেখায়।"

কিছুক্ষণ ওদের এই ধরণের প্রেমালাপ চলল। তারপর সশব্দে হাসি। হাসির পর চুপচাপ—কোন সাড়া শব্দ নেই।

পুল্লাইয়ার ঘুম এলো না। মনে পড়ে গেল অতীতের সেই রাত্রি। আকাশের বিরাট চাঁদ···তরুণীদের নাচ···ওদের মধ্যে নীলি···সেই জ্যোৎস্না ··সেই নাচ···তার সেই ভাল চেহারা···কি ভাবে টান দিয়েছিল নীলিকে ধরে···নীলির সেই হাসি···তার সেই লজ্জা পাওয়া···ভাবতে ভাবতে পুল্লাইয়ার মন আনন্দে ভরে যায়। মনে হয়ে এই সেদিনের ঘটনা। মনে মনে হাসতে থাকে।

কিন্তু তার হাসি বেশিক্ষণ আর থাকে না। নীলির দিকে তাকাতে তার ইচ্ছা করে। আপন মনে বলে ওঠে, "আমার সেদিনের সেই নীলি এই আবর্জনা আর দুর্গন্ধের মধ্যে কি সুখে যে ঘুমিয়ে পড়েছে···আমার যে কেন ঘুম পায় না···ওর মত আমি যে কেন মানিয়ে নিতে পারি না!"—মনে পড়ে গেল তার নীলির এক একটা কথা। আনন্দ যখন চাই দুঃখও কেন না চাই।

সেই ঘর থেকে আবার ফিসফিসানি শোনা গেল। ঐ বিড়ালছানার জন্য যে বউটা কাঁদছিল তার সম্পর্কে ওরা বলাবলি করছিল।

নারী কণ্ঠ : "লোকটা মরে গেছে তো সেইজন্যেই। লোকের চোখে বউটা ধুলো দিতে চায়।"

পুরুষ কণ্ঠ : "ও মরেছে আর একটা তো এসেছে।"

নারী : "পিরিত কি আর না হবে ? এ ব্যাটাও মরে গেলে বউটা আবার কোনটাকে মেরে ফেলে কাঁদবে।"

বলেই সে হেসে ফেলল। দুজনে হাসল। পুল্লাইয়ার গা গুলোতে লাগল ওদের কথা শুনে। আবার তার ঘর বদল করতে ইচ্ছে করল। অন্য ঘর কোথায় খুঁজবে কোথায় পাবে এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

উনত্রিশ

মাথায় যে চোটটা পেয়েছিল পুল্লাইয়া সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সেখানে খুব ব্যথা অনুভব করল। অদূরের উঁচু উঁচু বাড়িগুলির দিকে তার নজর পড়ল। পাশ দিয়ে যে

গাড়িগুলো যাচ্ছিল তার ভেতরেও সে অনেক সজ্জিত মানুষগুলোকে দেখতে পেল। জাহাজের ভোঁ শুনে তার মনে হল তাকেই ওরা কাজ দিতে ডাকছে। সেই আশায় আর দেরি না করে সে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু কপালের ঐ চোটের জন্য তার শীত করছিল। হয়ত তার জ্বর হয়েছে। বউ আর ছেলে তাকে সেদিন বেরোতে দিল না।

গোটা দিন সে সেখানেই বসে কাটিয়ে দিল। এটা ওটা লাগিয়ে কপালের ব্যথা কমল। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুল্লাইয়ার মনের ব্যথা বাড়ল। সেদিন রাত্রে ঘরে লম্ফ জ্বলছিল। মল্লু কুকুরছানাকে খুঁজে না পেয়ে কাঁদতে লাগল। পুল্লাইয়া ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে নীলিকে বলল, "আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ।"

"ও কথা বললে কি আর ভাগ্য ভাল হয়ে যাবে?"

পুল্লাইয়া নীলির হাতটা ধরে বলল, "দেখ, দেশের জমিটা আমরা হারিয়েছি। শহরে পা দিয়েই চোর ধরতে গিয়ে চোর হলাম। আর এখন এই ঘরটা···" বলতে বলতে থেমে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। নীলি হেসে বলল, "কষ্টের দিন এসেছে বলে পেছিয়ে যাব? কথায় বলে আনন্দ যখন চাই, দুঃখ কেন না চাই। আসুক না কষ্ট। সব সময় সুখ চাইব কেন?" তারপর কেউ কোন কথা বলল না। তন্দ্রা এল। হঠাৎ মেঘের গর্জনে ওদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে যেখানে সেখানে জল চুঁয়ে পড়ছিল। বাচ্চা মেয়েটার ঘুম ভেঙ্গে গেল। নীলি ছেলেকে এক কোণে শোয়াল। আর একটা কোণ একটু উঁচু ছিল। সেখানে পুল্লাইয়াকে শুতে বলল। পুল্লাইয়া বিরক্ত হয়ে ভাবল "এই জঘন্য দিনটাকে ভাল বলব?" তার খালি মনে পড়ছিল সুদিনের কথা। যত সুদিনের কথা তার মনে পড়ে তত তার দুঃখ বাড়ে। ঘরে জল জমে গেছে। তার পায়ে জল ঠেকছে। নীলি বাটিতে করে ঘরের জল বাইরে ফেলছে। পুল্লাইয়া জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বিরক্ত হয়ে বলল, "একটা নারকেল দড়ির খাটিয়াও নেই।"

সকাল হল। সারারাত কেউ ভাল ভাবে ঘুমোতে পারল না। রাস্তাঘাটে, ঘরে সব জায়গায় কাদা। পা ফেললেই পায়ে কাদা লেগে যাচ্ছে। বৃষ্টির জলে সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে মুছে যাওয়ায় পুল্লাইয়া খুব খুশী হল। সকালে রোদ উঠল সারারাত চোখে ঘুম না থাকলেও, ঘায়ের ব্যথাটা কম থাকায় শরীরটা একটু ভালই ছিল। তাই সে কাজের সন্ধানে বেরুল। যথারীতি ছেলেও যেতে চাইল। "রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য কেন যে অত বিরক্ত হলাম!" পুল্লাইয়া মনে মনে বলল, "এইটুকু ধৈর্য নেই কেন আমার!" ভাবল, "মনটাকে আরও দৃঢ় করতে হবে। ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে।"

অনেক ঘণ্টা ঘুরল। বন্দরের কাছে গেল। অনেক লোক নানাধরণের কাজ করছে। ওদের মধ্যে সেও যদি কাজ করত তাহলে কত ভাল হত। কুলিরা জাহাজ থেকে বস্তা নামাচ্ছে।

"বাবা মল্লু দেখ, লোকটা কত ছোট বস্তা মাথায় নিয়ে যাচ্ছে।" পুল্লাইয়া বলল।

ছেলে হাসতে হাসতে বলল, "তুমি হলে দুটো বস্তা…"

ওদের ভেতর থেকে একটা লোককে পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করতেই লোকটা "এখানে কোন লোক নেবে না" বলল।

ফিরে এসে মল্লু মাকে বলল, "মা, মা দেখ, বাবা দুটো বস্তা বইব বলল। ওরা বলল, "তোমাকে চাই না।"

খেতে বসে পুল্লাইয়ার বুক ধড়াস করে উঠল। আজকে সে যা হোক খেতে পাচ্ছে। কালকে কিছু রোজগার না হলে খেতে পাবে না। ভাবল, "আমি না হয় বড়, না খেয়ে দুদিন কাটতে পারব। কিন্তু মল্লু আর কোলের বাচ্চা মেয়েটা…"

তাড়াতাড়ি নাকে মুখে দুটো ভাত গুঁজে চলে গেল সিণ্ডিয়া কোম্পানীর (জাহাজ কোম্পানী) দিকে। ছেলে সঙ্গে গেল। ছুটে বাপের পিছু ধরল। সেখানে হাঁকপাঁক করে পুল্লাইয়া যাকে সামনে পেল তাকেই প্রশ্ন করল। শ'য়ে শ'য়ে লোক কাজ সেরে গেটের বাইরে আসছিল। পুল্লাইয়া ভাবল, এদের যে কোন একজনের সঙ্গে আলাপ করলে কালকেই কাজ পাওয়া যেতে পারে। ঝট্ করে একজনকে কাজের কথা বলতেই সে হেসে ফেলল।

"কেন হাসছেন কেন ?"

"এই কোম্পানীতে চাকরি পাওয়া এত সহজ! এখানে মাসে আশি টাকার কম কেউ মাইনে পায় না জান ?"

"অত টাকা!" পুল্লাইয়া এমন ভাবে বলল যেন কেউ টাকাগুলো তার পকেটে তখনি ঢেলে দিয়েছে। নিজেকে সামলে সে আবার বলল, "দেখুন, আজ্ঞে আমি পুবের ছেলে, ভাল মন্দ জ্ঞান এখনও হয়নি। আমার ছেলেমেয়ে আছে কালকে আমাকে একটা কাজ দিলে এজ্ঞে আপনার পুণ্য হবে।"

"তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি তুমি কোথাকার লোক। মনে হচ্ছে জঙ্গল থেকে উঠে এসেছ।"

"আজ্ঞে তা যা বলেছেন…তবে চোর নই। চারজনে যা করে আমি তার দ্বিগুণ কাজ করতে পারব। এজ্ঞে আপনি যদি দয়া করেন‥"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "ওরে বাবা, আমি তোমাকে কোত্থেকে কাজ দেব। এই সেদিন পাঁচশ লোককে কোম্পানী ছাঁটাই করে দিয়েছে। এখন যাদের নেবে তাদের নাকি ভাল করে বাজিয়ে নেবে। লেখাপড়া জানা লোককে মোট বইতে নেবে। তুমি এক কাজ কর অন্য কোথাও মোট বয়ে রোজগার করার চেষ্টা কর। এখানে ঘুরে কোন লাভ হবে না।" বলে সে চলে গেল।

ঘরে ফিরতে সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গেল। সারাদিন রোদ ওঠায় ঘরটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে। বাপ আর ছেলে বারান্দায় বসল। ছেলেটা বার দশেক কুকুরছানাকে নিয়ে

খেলল। তখনও পুল্লাইয়ার মাথায় সিণ্ডিয়া কোম্পানী ঘুরছিল। সে ভেবেছিল অত লোকে যখন কাজ করছে তারও একটা হয়ে যাবে। লোকটা তো দিব্যি মোট বইতে বলে গেল। সে ভাবল, "আমি কি মোট বওয়ার জন্য আমার নিজের গ্রাম ছেড়ে এসেছি···মাস মাইনের চাকরি জোগাড় করতে এখানে এসেছি। ছেলেকে তো পড়াতে হবে···আমার ছেলেকে মানুষ করতে হবে তো।" আরও কত কিছু ভাবল সে।

বারান্দায় শুয়ে পড়ল সে। মল্লু ক্লান্ত ছিল। বাপের হাত ধরে সেও ঘুমিয়ে পড়ল। রাত দশটা হয়ে গেল। আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্র দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার ওপারে বৈদ্যুতিক আলোর থাম। ঐ আলোর নিচে রাত্রে বাচ্চারা খেলে। সেখান থেকে দূরের কোঠাবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওদের রেডিওর গান শোনা যাচ্ছিল না।

নীলি কিছুক্ষণ পুল্লাইয়ার পা টিপে দিল। ঘরের ভেতরে বাচ্চাটা কেঁদে উঠতেই সে চলে গেল। পুল্লাইয়া এপাশ ওপাশ করতে লাগল। কিছুতেই চোখে ঘুম আসছে না। কুকুরের ডাক যতবার কানে যায় ততবার সে রাস্তার দিকে তাকায়। গাছের নিচে কুকুরছানাটা ছিল। মনে হল ওটা মল্লুর কুকুর। একটা লোক ওটার কাছে এসে আদর করতে লাগল। পুল্লাইয়া ভাবল একি লোকটা সেখানে বসে পড়েছে। কে সে? এত রাত্রে কুকুরছানাকে নিয়ে আদর করছে। ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য কুকুরটা চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে বারবার ধরে তাকে আদর করছিল। তার গায়ে সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

পুল্লাইয়া উঠে বসল। দেখল লোকটা কুকুরটাকে কি যেন খেতে দিচ্ছে। আর বসে থাকতে পারল না পুল্লাইয়া। সেদিকে এগিয়ে গেল। লোকটা একমনে কুকুরটাকে খাওয়াচ্ছে আর তার দিকে এক ভাবে তাকিয়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে লোকটা বলতে লাগল, "তোরা তো খুব বিশ্বাসী জাত। এঁ্যা! বিশ্বাস নিয়ে জন্মাস বিশ্বাস নিয়েই মরে যাস। যে কোন অবস্থায় তোরা তো বিশ্বাস হারাস না। আর মানুষের কি অবস্থা দেখ কোন কিছুর প্রতি বিশ্বাস নেই। সবাই যেন নাটক করছে। এ মানুষ জাতটা টাকার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। আহা, আমি যদি তোদের মত বিশ্বাসী হতে পারতাম···" বলে কুকুর ছানাটিকে ধরে মুখের কাছে এনে চুমো খেলো। তারপর আবার তার মাথাটা হাত দিয়ে নেড়ে বলল, "কিরে শুনছিস, দুদিন ধরে আমার সঙ্গে আছিস আমার কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছিস যা পাই তাতে আমার পেট ভরে না কিন্তু তুই তো আমাকে ছাড়িস না। দু'দিন ধরে তোকে তো তেমন কিছু খেতে দিতে পারিনি। তবুও তো তুই আমাকে ছেড়ে যাসনি। তবে এমন দিন আমার থাকবে না, আমার অনেক আছে। মাটির নিচে সোনা জমিয়ে রেখেছি। নারকোল গাছের নিচে। জায়গাটি শুধু তোকে দেখাব। শুধু তোকে।" বলতে বলতে কুকুরটিকে কোলে তুলে নিল। কিছুক্ষণ তাকে আদর করে আবার বলল, "আমার দুঃখটা কোথায় জানিস? আমার

অগ্নিসাক্ষী করা বউ আমারই বন্ধুর সঙ্গে কেটে পড়ল! এই হল বউ! এই হল বন্ধু। এদের বিশ্বাস আছে বল?"

তারপর সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। পুল্লাইয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করল। ওর কাছে গিয়ে কান্না থামাবে না বারান্দায় এসে ঘুমোবে ঠিক করতে পারল না।

সকালে ঐ গাছের নিচে কুকুরছানাকে দেখতে পেল না। লোকটাও ছিল না।

যথারীতি মল্লু বাপের সঙ্গে যেতে চাইল। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে রইল। বাপ যেখানে গেল সেও সেখানে গেল। যেখানে যাকে সে চাকরির কথা বলল সেই তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হেসে ফেলল। কেউ কেউ তাকে বলল, "তোমার মত লোক চাকরি পাবে না।" পুল্লাইয়া ভাবল, এরা তো আমার চেহারা দেখেনি। বলে কি না আমি কাজ করতে পারব না। হুঁ, আমার আগের চেহারা দেখলে একথা বলতে পারত না। যেতে যেতে এক জায়গায় দেখল কয়েকটা মেয়েছেলে ঝুড়ি বানাচ্ছে আর ঝগড়া করছে। একবার ভাবল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ ঝুড়ি বানানো দেখবে। আবার ভাবল, "দূর এসব কাজ আমি করতে যাব কোন দুঃখে। আমি হলাম মল্লনাইডুর ছেলে দশ গাঁয়ের লোক এক ডাকে যাকে চেনে তার ছেলে আমি। আর আজ আমাকেই পথে ঘাটে চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।"

পুল্লাইয়া ঠিক করল, একটা কিছু কাজ না জুটিয়ে ঘরে ফিরবে না। একটা বুড়ির কাছ থেকে কন্দ সেদ্ধ কিনে মল্লুকে দিল। বুড়ির মাথার চুল সাদা। একটাও দাঁত নেই। বুড়ি তাকে জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকের ছেলে বাবা তুমি?"

"পুব দিকের। আমাদের গ্রামের নাম নবিরি।"

"এখানে কিসের জন্য এসেছ বাবা?"

"কাজ খুঁজতে।"

"সব দিকেই অভাব আর অভাব। এত বড় শহর কিন্তু বাঁচার কোন রাস্তা নেই।"

"দিদিমা, তোমার কেউ নেই?"

"আছে বাবা আছে। দুটো ছেলে আছে। মেয়ে নেই। বড় ছেলে সিণ্ডিয়া কোম্পানীতে মাস মাইনের চাকরি করে।…বউমা আমাকে খেতে দেয় না। ছোট ছেলেটা বেকার। এক সময় ভালই ছিলাম বাবা, এখন অবস্থা পড়ে গেছে। কি বলব, আমি দু'পয়সা রোজগার করলে তবে দু'মুঠো খেতে পাই। ভাত কি আর জোটে, ফ্যানই খেতে হয়। ছোট ছেলেটার বউ ছেলে মেয়ে আছে। এক একদিন না খেতে পেয়ে বাচ্চাগুলো কি কান্নাই না কাঁদে। কি আর করব বাবা! ঐ ভগবান কবে যে মুখ তুলে তাকাবে…"

কথাগুলো শুনতে শুনতে পুল্লাইয়ার মনে হল তার নিজেরই ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে ছটফট করছে। সে বুঝল, জগতে শুধু সে একাই কষ্ট পাচ্ছে না। তার মত

আরও অনেকে কষ্ট পাচ্ছে। এত কষ্টের মধ্যেও এই পাকা চুলের বুড়িটা সহ্য করে আছে কি করে! কিসের আশায়? কোন বিশ্বাসে? কিসের ভরসায় সে এত কষ্ট করে নাতি নাতনীর পেট ভরাচ্ছে? এই বুড়ির যতটা ধৈর্য আছে আমার ততটা নেই কেন? বুড়ির মধ্যে যে বিশ্বাস আছে, যে ভরসা আছে, আমার মধ্যে তা নেই কেন?

একটা দোকানের সামনে বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে ছিল। পুল্লাইয়া উঁকি মেরে সেখানে দেখল। দুটো নতুন সাইকেল রিক্সা সেখানে ছিল।

একটা রিক্সা পেলে হত। রিক্সা চালিয়ে যা ভাড়া পাওয়া যেত তার অর্ধেক রিক্সার মালিককে দেওয়া যেত। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, "ছি-ছি কি ভাবছি আমি। আমি কোন বংশের ছেলে। এক সময় আমার বাড়িতে চারজন লোক কাজ করত। ঘোড়ার মত আমি মানুষগুলোকে টেনে বেড়াব! আমি রিক্সা টানছি এটা যদি গ্রামে জানাজানি হয়ে যায়···গ্রামের লোক এখানকার হাসপাতালে তো আসে। ওরা যদি দেখে ফেলে তাহলেই তো সর্বনাশ। দশগ্রাম চাউর হয়ে যাবে। আমাকে হয়ত একঘরে করে ফেলবে···দূর আমি কি আর ফিরছি নাকি গ্রামে।"

আবার কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে পুল্লাইয়া ঐ নতুন রিক্সার কাছেই চলে এল। রিক্সার মালিককে দু একটা প্রশ্ন করল।

"দিনে দু টাকা ভাড়া।" রিক্সার মালিক বলল।

"দু-টাকা!"

"অবাক হচ্ছ কেন? এক একদিন দশটাকা রোজগার হবে। আরও বেশিও হতে পারে। বেশি হলে তুমি কি আমাকে দু টাকার বেশি ভাড়া দেবে?"

"এজ্ঞে পুবের ছেলে বাবু। ওসব জানি না। অত টাকা দিনে পাওয়া যায়? একদিনেই?"

"জাহাজ থেকে সাহেবরা নামে। ওদের মধ্যে যারা মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে তাদের ধরতে হয়। ওদের ভাল গলিতে নিয়ে গেলে এক টাকার জায়গায় দু টাকা ভাড়া পাবে।"

"ভাল গলিটা কি বাবু? সেটা কি আলাদা গলি?"

"ভাল গলির মানে জানো না? এ্যাঁ? তাহলে তুমি আর রিক্সা চালাতে পারবে না। আরে, যে গলিতে মেয়েরা, ভাল ভাল মেয়েরা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে। যাদের দিকে একবার তাকালে চোখ ঝলসে যায়।"

পুল্লাইয়া মাথা চুলকোতে লাগল। কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। ভাবল, "খেটে পয়সা নেব। এক টাকার জায়গায় দু টাকা নেব, কাজ নেই আমার ঐ গলিতে যাওয়ার।" মনে মনে ঠিক করে ফেলল সে রিক্সা চালাবে। তবে ঐ গলিতে যাবে না। এক টাকার জায়গায় দু টাকা নেবে না।

"ঠিক আছে বাবু, গাড়িটা দিন। দিনে দু টাকা আমি দেব।"

সে এমন ভাবে বলল, যেন সব ঠিক হয়ে গেছে। রিক্সার মালিক হেসে বলল, "দিন বললেই তো আর দেওয়া যায় না। টাকার ডিপোজিট রাখতে হয়।"

"এজ্ঞে? ডিপো—"

"পুবের ছেলে তো, কিছুই জানো না। ডিপোজিট, ডিপোজিট। পুবের লোক তো খুব একটা ভাল হয় না। দেখতে জংলী, আসলে চোর। রিক্সা নিয়ে পালালে আমি কি করব? তাই জমা রাখতে বলছি। পঁচিশ টাকা জমা রাখলে তবে রিক্সা দেব।"

পুল্লাইয়ার মনে ওর খোঁচাটা লাগল। মনে দুঃখও হল। তবু বলল সে, "পঁচিশ টাকা জমা রাখতে হবে?"

"রেখেও তো কেউ পাচ্ছে না। চারদিকে ঘুরে দেখ না কোথাও পাবে না। এক একটা রিক্সা ভাড়া নিতে দশটা করে লোক এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। টাকা তো তোমার জমাই থাকবে। রিক্সা ফেরত দিলে টাকা ফেরত পাবে।"

"আজ্ঞে আমার কাছে তো টাকা নেই। আপনি দয়া করে দিন। আমি পালাব না।"

"না না ওসব আজেবাজে কথা বলে লাভ নেই। যত টাকা বলেছি তত টাকা দিতে পারলে এসো, না পারলে চলে যাও।"

"ঠিক আছে আমি চেষ্টা করছি। আপনি রিক্সাটা রাখুন। আমি আজ না পারি কাল সকালে…"

"এই ধরণের কথা আরও দশজন বলে গেছে। ঠিক আছে, কাল সকাল পর্যন্ত রিক্সাটা রাখব। তবে তুমি যদি কাল সকালে না আস তাহলে অন্য লোককে রিক্সাটা দিয়ে দেব।"

মাথা নেড়ে রাজী হয়ে পুল্লাইয়া বাড়িমুখো হল। সে ভাবতে লাগল, "পঁ-চি-শ টাকা! কোত্থেকে আনব? ঘরে তো একটা পয়সা নেই। রাতারাতি এত টাকা পাব কোথায়? এখানে কার কাছে ধার চাইতে যাবো? এখানে আমার কে আছে? চাল নেই চুলো নেই, কে দেবে আমাকে এত টাকা? যা ছিল সব তো রাজুকে দিয়ে এসেছি। আমাকে তো আর কেউ বন্ধক রাখবে না?"

পুল্লাইয়া হাঁটছিল বটে, কিন্তু পথের উপর তার চোখ ছিল না। ঘরে পৌঁছে নীলিকে সব বলল। দুপুরের ফ্যানটা রাখা ছিল। সেটা খেয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বারান্দায় বসে রইল। লোকে যাতায়াত করছে। মাঝে মধ্যে দু একটা লোকের পকেট খুব উঁচু দেখাচ্ছিল। সে ভাবল, "ঐ লোকটার কাছে চাইলে কি আমাকে পঁচিশ টাকা দেবে? ওরে বাবা, মেয়েছেলেটি কি মোটা! গলার সোনার হার কত চওড়া! ওর কাছে

চাইলে কি পঁচিশ টাকা দেবে না!" তাড়াতাড়ি উঠে কাছে যেতে চাইল। কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেল। "আচ্ছা, রাত্রে যে লোকটা সোনা পুঁতে রেখেছি বলেছিল সে কি আবার এই গাছতলায় আসবে? ও যদি সত্যি সোনা পুঁতে রেখে থাকে তাকে বললে কি আর দেবে না! লোকটা এলে চেয়ে দেখতাম। একেবারেই তো আর চাইছি না। ধার নেবো, পরে ফেরত দেব।"

যত সময় যায় তত তার মনে হয়, "এই তো আর কিছুক্ষণ পরেই সকাল হয়ে যাবে। রাস্তার ঐ আলোটা জ্বলল না কেন? হয়তো খারাপ হয়ে গেছে।"

হাঁটু মুড়ে বারান্দায় বসে সে অনেক কিছু ভাবতে লাগল। ঘরে বাচ্চা মেয়েটা কাঁদছে। এ পাশের ঘরের যুবতী বউটা সিনেমার গান গাইছে। ওর স্বামী ঘরে নেই। নীলি পুল্লাইয়াকে ফ্যান খেতে ঘরের ভেতর ডাকল।

অর্ধেক ফ্যান খেয়ে সে বউয়ের দিকে তাকাল। পেটে খিদে থাকলেও বাকি ফ্যানটা সে আর খেল না।

অন্ধকার রাত্রি। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। তবু বাপ আর ছেলে বারান্দায় ঘুমোচ্ছিল। নীলি বাচ্চাকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঘুমোল। রাত তখন এগারটা। মল্লু বাপের বুকের উপর ঘুমোচ্ছিল। পুল্লাইয়ার চোখে ঘুম নেই। রাজ্যের চিন্তা মাথায় গিজগিজ করছিল। সে আপনমনে বলে যেতে লাগল, "আজ রাত্রের মধ্যে যে কোন ভাবে পঁচিশ টাকা জোগাড় করতে হবে। এই টাকা জোগাড় করতে না পারলে কাল রিক্সা পাব না। এত টাকা ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না। আচ্ছা চুরি করলে কেমন হয়! ছি-ছি-ছি কি ভাবছি!" পরমুহূর্তেই পুল্লাইয়া নীলাম্মা দেবী ও রামুকে ভক্তিভরে স্মরণ করল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য মনে মনে প্রার্থনা করল ওদের কাছে। একটু নড়লেই মল্লুর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিছুক্ষণ পরে মনে হল কে যেন পা টিপে টিপে ঐ অন্ধকারে আসছে। রামু নাকি? না না, কাল রাত্রে যে লোকটা এসেছিল সেই নাকি? না, সেও নয়। পাশের ঘরের বাসিন্দা। লোকটা এসেই ঢুকে গেল ঐ যুবতী বউটার ঘরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিসফিস করে সে বলল, "এই দেখ।"

"কি?"

"তোমাকে কি সারা জীবন সাদা-মাটা রাখব! বড়লোকের বউ যা পরে তাই তোমাকে পরাব। তোমাকে সিল্কের শাড়ি পরাব।"

"মোটা রকম কিছু পেয়েছ মনে হচ্ছে?"

"এমন কি আর পাই। ওয়ালটেয়ার স্টেশনে আজ মোটা দাঁওয়ের পকেট মেরেছি।"

"ধরে ফেলেনি?"

"টিকিট ঘরের কাছে দারুণ ভিড় জমে ছিল।"

"ভিড় বেশি থাকলে সহজেই মারা যায়।"

শুনতে শুনতে পুল্লাইয়ার চোখের সামনে যেন আর একটা দরজা খুলে গেল। "জীবনের মোড় ঘোরানোর জন্য শুধু একটিবার এই ধরণের একটা কাজ করলে কেমন হয়।" শুধু একটি বার। কাজ হয়ে গেলেই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে নেব।" ভাবতে ভাবতে তার ইচ্ছে করল বউকে তুলে আলোচনা করতে। আস্তে আস্তে বুকের উপর থেকে পাশে শোয়াতেই মল্লু উঠে বসে পড়ল।

"একে নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা।" বলে পুল্লাইয়া আবার মল্লুকে বুকের উপর শুইয়ে চাপড়াতে লাগল।

ঐ তো স্টেশনের ঘণ্টা বাজছে। গাড়ি আসার আগে তো একবার ঘণ্টা বাজে। এখন টিকিট ঘরের কাছে নিশ্চয়ই খুব ভিড় জমে গেছে। ভিড় যদি জমে থাকে···ও তো বলল···ভিড়ের মধ্যে সহজেই পকেট মারা যায়। ভাবতে ভাবতে মল্লুকে আস্তে আস্তে পাশে শোয়াল। চট্ করে উঠে দু-চার পা গেল। ততক্ষণে ছেলে কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে পৌঁছে গেল। পুল্লাইয়ার ভীষণ বিরক্তি জাগল, রাগও হল। ফিরে এসে আবার মল্লুকে বুকে শুইয়ে তার পিঠ চাপড়াতে লাগল। বাবা রেগে গেছে দেখে মল্লু ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তাকে নিচে শুইয়ে পুল্লাইয়া উঠে পড়ল। অন্য সময়ে পাশে শোয়ালেও বাপের হাত ছেলের গায়ে রাখতে হত। পুল্লাইয়া উঠে পড়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়াল। মল্লুর কচি মনে কি জেগেছিল কে জানে। সে কিছুটা ভয়ে, এবং কিছুটা কৌতূহলবশত বুঝেছিল যে বাপ তাকে নিয়ে যেতে চায় না। পিছু ধরেছে জানতে পারলে বাবা মারবে তাকে। তাই মল্লু আড়ালে আবডালে হাঁটতে হাঁটতে বাপকে অনুসরণ করল। রাত তখন বারোটা। সারা শহরে অনেকখানি নীরবতা। মাঝে মধ্যে দু একটি রিক্সা নজরে পড়ছে। পুল্লাইয়া লম্বা লম্বা পা ফেলে স্টেশনে পৌঁছে গেল। মল্লুও তার চোখ এড়িয়ে স্টেশনে পৌঁছল।

স্টেশনে পৌঁছে পুল্লাইয়া দেখল তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ঘরের কাছে সত্যি খুব ভিড় জমে গেছে। মনে মনে সে খুশী হল। ভয়ও ছিল তার মনে। গোটা শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছিল। তবু সে মনে মনে বলল, "যে কোন ভাবে জীবনের মোড় ঘোরাতে হবে।" সামনেই একটা লোককে দেখতে পেয়ে তার মনে হল লোকটার কাছে বেশ টাকা পয়সা আছে। লোকটার সঙ্গে আলাপ করলে কেমন হয়! লোকটার নাম ধাম জেনে রাখা ভাল। ওর পকেট মেরে যদি টাকা পাই এখনকার মত কাজ চালিয়ে নেব। কিন্তু সুদিন এলে তার টাকার দ্বিগুণ টাকা ফেরত দিয়ে আসব। সেদিন সব কথা তাকে বলব। আজকে আমি কেন পকেট মারছি তা কি ভগবান বুঝতে পারছে না!

"কোথায় যাবেন বাবু?"

"পন্দুরু।"

"ওখানেই আপনার বাড়ি বাবু ?"

"হ্যা।"

"এজ্ঞে আপনার নাম ?"

"নাগভূষণম্।"

"এজ্ঞে, বাবুর কি ভাল নাম।"

পুল্লাইয়া লোকটার নাম ধাম বার বার মনে মনে উচ্চারণ করে স্মরণে রাখার চেষ্টা করছিল। মল্লু একটি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তার বাবা কার সঙ্গে কথা বলছে তা লক্ষ্য করছিল।

এই তো নাগভূষণম্ টিকিট কাটতে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। অন্য কারও পকেট মারবো না। এর পকেট মারতে সুবিধে হবে। এর গায়ে বাঙালীর মত সার্ট আছে। পাশ পকেটটাও বেশ ভারি দেখাচ্ছে। পুল্লাইয়া নিজেও টিকিট কাটার ভঙ্গি করে টিকিট ঘরের দিকে এগোল। দেখতে দেখতে সেও ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নাগভূষণমের কাছাকাছি যত এগোচ্ছে তত তার পা ঠকঠক করে কাঁপছে। তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। মাথা যেন ঘুরছিল। মনের ভেতরে যেন সমুদ্রের ঢেউ। পেটে খিদের জ্বালা···ঐ জ্বালা তার হাতটাকে নাগভূষণমের পাশ পকেটে ঢুকিয়ে দিল। পার্স পেল। এই যাঃ, লোকটা টের পেয়ে গেছে। পর মুহূর্তে চোর চোর চিৎকার। ছুটে পালাতে গিয়ে চোর ধরা পড়ল। স্টেশনের সমস্ত ভিড় চোরকে ঘিরে দাঁড়াল। এক এক জনের মুখে এক একটা কথা। একটা জোয়ান লোক পুল্লাইয়ার চুলের ঝুটি ধরে তিন চারবার পাক খাইয়ে মাটিতে ফেলে দিল। লজ্জায় কুঁকড়ে সে মাটিতে পড়ে রইল। কে যেন কষে একটা লাথি মারল। চারদিক থেকে নাগভূষণমকে যাত্রীরা উপদেশ দিতে লাগল, "পুলিশে দিন, পুলিশে দিন, ছাড়বেন না।"

এত কোলাহল আর ভিড় যে কেন তা জানার কৌতূহল মল্লুর মনে জাগল। সে আর আড়ালে থাকতে না পেরে বেরিয়ে এসে ভিড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঢুকে দেখতে পেল তার বাবাকে সবাই মারছে। যে লোকটা বেশি করে মারছিল, তার পায়ে মল্লু জোরে কামড়ে দিল। সে "বাবারে" বলে চিৎকার করে উঠল। ঝট্ করে মল্লুকে ধরে ঐ লোকটা এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। কি ভাবে জানি লেগে মল্লুর গা ছুলে গেল।

হঠাৎ ছেলেকে দেখে পুল্লাইয়ার দু চোখ ছেপে জল এল। অবস্থা দেখে নাগভূষণম্ চিৎকার করে বলল, "ওকে ছেড়ে দিন।"

"আপনি কি মশাই পাগল হয়েছেন ? ছাড়বেন কেন ? পুলিশে দিন। আজ আপনার পকেট মেরেছে কাল আমাদের মারবে।"

"দেখলেই তো বোঝা যায়···দাগী আসামী।"

"ছাড়বেন না পুলিশে দিন।"

"পুলিশের পেছনে ঘোরার অত সময় আমার নেই। আমার টাকা আমার কাছেই আছে। কেস করলে অনেকবার ঘোরাঘুরি করতে হয়। ছেড়ে দিন বলছি।" শেষে নাগভূষণম্ নিজেই পুল্লাইয়ার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে ভিড়ের বাইরে ঠেলে দিল। ছাড়া পেয়ে মাথা নিচু করে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে পুল্লাইয়া সোজা ঘরের দিকে পা বাড়াল।

পথে মল্লু অনেকক্ষণ ধরে বলছিল তার বীরত্বের কাহিনী। কিন্তু পুল্লাইয়া একটি কথাও বলল না। ঘরে যেতেই দেখে বাচ্চা মেয়েটা কাঁদছে। বউ বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে কোলে নিয়ে চুপ করাচ্ছে।

"কোথায় গিয়েছিলে?" নীলি প্রশ্ন করল।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লু শুরু করে দিল, "জানো মা, বিরাট কাণ্ড…অনেক লোক…সবাই মিলে বাবাকে দুম-দুম-দুম করে মারছিল। আমি কামড়ে দিয়েছি…একজনের পা কামড়ে দিয়েছি।"

"মল্লু!" পুল্লাইয়া ধমক দিল।

নীলি মাথা নিচু করে বলল, "তাহলে এই জন্যেই গিয়েছিলে?" বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

পুল্লাইয়ার খুব দুঃখ হল। রাগের চোটে সে মল্লুকে মারল। মল্লুর পিঠে পাঁচটি আঙুলের দাগ বসে গেল। মার খেয়ে সে বাপকেই জড়িয়ে ধরে বাবা বলে কাঁদতে লাগল। নীলি কোন কথা বলল না। বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। নীলির কথা যতই ভাবে ততই পুল্লাইয়ার মন দমে যায়, লজ্জা পায়।

পুল্লাইয়া বারান্দায় শুয়ে পড়লে মল্লু যথারীতি তার বুকে শুয়ে পড়ল। চারদিকে অন্ধকার। কোন সাড়াশব্দ নেই। শুয়ে শুয়ে পুল্লাইয়া আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ভাবল, ঐ তারাগুলো কি আমাকে দেখছে। মাঝে মাঝে মল্লু নড়ছিল। দু' একবার ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল সে।

পুল্লাইয়া তার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। আস্তে আস্তে তার গোটা শরীরে হাত বুলোতে লাগল। মল্লুর চোখের জল তার বুকে পড়ছিল। ছেলের চোখের জল বাপের বুকে যত পড়ছিল ততই সে ঠাণ্ডা বোধ করছিল। একবার তাকে জোরে জড়িয়ে ধরে পুল্লাইয়া বলে উঠল, "বাবা, বাবারে আমার মল্লু…" বলতে বলতে সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

তিরিশ

পুন্নাইয়া সকালে উঠে দেখে মল্লু কুকুরছানাকে নিয়ে খেলছে। তাকে এত খুশী খুশী দেখাচ্ছিল যে বলার কথা নয়। কুকুরছানাটিকে সে কোথায় কি ভাবে পেয়েছে তা বলল, "জানো বাবা, ঐ যে জুজুবুড়ো, ওর পেছনে পেছনে কুকুরছানাটি যাচ্ছিল···আমি না পা টিপে টিপে গিয়ে চট্ করে ধরেই ছুট।"

মল্লু কুকুরটার গলায় দড়ি বেঁধে ঘরের বেড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখল। তার সঙ্গেই যত কথা। কুকুরছানাটি মাঝে মাঝে কেঁউ কেঁউ করে ডাকছিল। মল্লু যখন তাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল পুন্নাইয়া সেই সুযোগে কাজ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। কোথায় গেলে কাজ পাবে? পথের আশপাশে যত কোম্পানী ছিল সবগুলোতেই তার ঢুঁ মারা হয়ে গেছে। এক জায়গায় রাস্তার পাশে একটা কোঠাবাড়ি উঠছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলো অনেকে যোগাড়ের কাজ করছিল। একটা রাজমিস্ত্রীকে পুন্নাইয়া জিজ্ঞেস করল, "কাজ দেবেন?" সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ নেই জানিয়ে দিল।

"পুবের ছেলে আমি। কাচ্চা-বাচ্চা আছে। এত লোক তো কাজ করছে। আমাকে নিন না?"

"এত লোক কাজ করছে তো কি হয়েছে?"

আর একটা লোক বলল, "বলছে যখন একদিনের জন্য নিয়ে নাও না।"

"লোকটাকে দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে এটা কি যোগাড়ের চেহারা?"

পুন্নাইয়া নিজের দিকে তাকাল। গায়ের গেঞ্জিটা ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে হাড়-পাঁজরা দেখা যাচ্ছে। হাঁটুর উপর ছোট মাপের কাপড়টা পরে আছে। সেটাও খুব ময়লা দেখাচ্ছে। গোঁফ আর দাড়ি একাকার হয়ে গেছে। ওর তো কোন অসুখ-বিসুখ করেনি। চিন্তা একটাই। না, এটুকু একটা পেটের জন্য এত ঝামেলা। অনেকবার চেষ্টা করেও আর একবার ধরাধরি করতে ইচ্ছে হল না। যোগাড়েদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাও কম ছিল না। জোয়ান জোয়ান মেয়েরাও কাজ করছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের কাজ কারবার দেখছিল। কালো গুঁফো একটা রাজমিস্ত্রী একটা যোগাড়ে যুবতীকে বলল, "এই যে, শালীর কি খবর? আমার ভায়রার কি ক্ষমতা পড়ে গেছে? তোমার পেটটা খালি রেখেছে কেন? একটু উঁচু হোক!"

ঐ যুবতীটি খিলখিল করে হেসে বলল, "তোমার ভায়রার ক্ষমতা পড়ে গেলেই বা তুমি কি করবে? ওর না হয় ক্ষমতা পড়ে গেছে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে? অত যদি পেরাণের ইচ্ছে জাগে তো দিদির পেট ভরাও না কেন?" মুখটা ঘুরিয়ে পুন্নাইয়া অন্য দিকে তাকাল। সেখানে একটা পুরুষ যোগাড়ে মেয়ে যোগাড়ের মাথায় কড়া রাখতে রাখতে কি যেন বলল। শুনে হি হি করে হাসতে হাসতে মেয়েটা চলে গেল। আর একদিকে দুজনে কথা বলছিল, "এত বড় বাড়ি যখন করছে কত টাকা আছে

কে জানে ?"

"যার হয় তার হয়। না চাইতেই টাকা পায়। যে চায় সে পায় না।"

"সবই ভাগ্য-রে ভাই। ভাগ্যে থাকলে টাকা হয়, বাড়ি হয়, না থাকলে হয় না।"

পাশের লোকটা পোড়া চুট্টা (চুরুট) নিচে রেখে বলল, "মা লক্ষ্মীর কোন বিচার নেই। যার আছে তার বাড়িতেই যায়। দু' দিন আগে এর বাওয়া (শালা অথবা ভগ্নিপতি) জুয়োতে পঞ্চাশ হাজার টাকা জিতেছে। ঐ খেলায় কত লোক মরে। আমার জামাই শেষ পর্যন্ত কি করল জান ? রেল লাইনে মাথা দিল। বিয়ে দিয়ে কি হল ! এখন বিধবা মেয়ে আর তার চারটি ছেলেমেয়ে আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। এই তো দিনকালের অবস্থা।"

ওর কথা শুনতে শুনতে পুল্লাইয়া দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে ঐ রাজমিস্ত্রী বলল, "ঠিক আছে, আজকের মত কাজ কর। ব্যাপার কি জান, এমনিতেই আমাদের লোক বেশি আছে। ওকে নেওয়ায় অন্যেরা আপত্তি করেনি।" পুল্লাইয়া চুণ মাখল। কিছুক্ষণ মশলা বয়ে নিয়ে গেল। দুপুরে বড় মিস্ত্রী বলল, "কাজের রকম কি ? মেয়েদের চেয়েও অধম। এর মত লোককে দিয়ে কাজ করালে আমার কি লাভ ?" তারপর সে পুল্লাইয়াকে বলল, "এই নাও, এই আটগণ্ডা পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। এসব কাজ তোমায় দিয়ে হবে না।"

মেয়েদের সামনে এভাবে বলাতে পুল্লাইয়ার খুব লজ্জা করল। ইচ্ছে করল ওর মুখের উপর পয়সাগুলো ছুঁড়ে মারতে। কিন্তু হাত উঠল না। মল্লু আর বাচ্চা মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল। ওদের পেটে কিছু পড়েনি। এই আট আনা পয়সা দিয়ে অন্তত একবেলা চলবে ভেবে সে বাড়িমুখো হল। আসতে আসতে তার চোখ পড়ল একটা বিরাট তিনতলা বাড়ির ওপর। সে ভাবল, "এই বাড়ির ছাদে উঠলে গোটা শহরটা দেখা যেত ! আমার কপালে কি আর সেদিন আসবে !"

ইতিমধ্যে "বাবা" ডাকটা শুনতে পেল। মল্লুকে দেখে পুল্লাইয়া অবাক হয়ে গেল। ছেলে যে কি করে এত গাড়ি ঘোড়ার মধ্যে পথ চলে এত দূর এল তা পুল্লাইয়া ভেবে অবাক হল। ছেলেকে কোলে নিয়ে খুব আনন্দ হল। শরীরে যেন শক্তি ফিরে এল। চার পা এগোতেই ছেলে বলল, "বাবা, বাবা দেখ, ঐ যে জুজুবুড়ো।"

এই সেই লোক, যাকে পুল্লাইয়া সেদিন মাঝরাত্রে গাছতলায় দেখেছিল। লোকটা কি যেন বিড়বিড় করে বলছে। পুল্লাইয়া তার কাছে গিয়ে কান খাড়া করে শুনল, লোকটা বলছিল, "দুনিয়া ভর্তি ধোঁকাবাজ। সবাই মিলে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। ঐ তো আমাকে ধোঁকা দিয়ে এই তিনতলা বাড়িটা তুলেছে। আমার কুকুরছানাটাকেও কে যেন তুলে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ওটাই তো ছিল আমার কাছে। সেই আমার সুখ-দুঃখের কথা শুনত। সেও রইল না। একা বাঁচব কি করে ? শেষে আমি হলাম কাপুরুষ। একদিন এইভাবে পথ চলতে চলতে মরে যেতে হবে। কেউ দেখবে না,

কেউ শুনবে না।"

ওর কথা পুল্লাইয়ার মনে গাঁথল। সেও তো কাপুরুষের মত প্রতিদিন মরছে আর বাঁচছে। ঐ ফোকলা দেঁতো পাকা চুলের বুড়িটা ছেলে, ছেলের বউ আর নাতি নাতনীদের রোজগার করে খাওয়াচ্ছে। ঐ রাজমিস্ত্রীটা শুধু নিজের পরিবার নয়, মেয়ে আর মেয়ের বাচ্চাদেরও বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে। নিশ্চয় আমার মধ্যে কোন দোষ আছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল নীলির কথা, 'এ জগতে সবাই রাজা হতে পারে না। সবাই ভিক্ষে করে না। যে রাজা হয় সে রাজার মত বাঁচে। আবার মহারাজ হওয়ার ইচ্ছাও তার জাগে। যে ভিক্ষে করে সে পেট ভরলেই খুশী। পেট না ভরলেই তার দুঃখ।' "আমি তো মাস মাইনের চাকরি চাই। চাকরি করতে করতে আরও বড় চাকরি জুটে যেতে পারে। এভাবে বড় হতে হতে আমিও একদিন রাজা হয়ে যেতে পারি। "কার ভাগ্যে কি আছে তা কি কেউ বলতে পারে!" পুল্লাইয়া এই ধরণের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে পৌঁছে গেল।

শহরে এসে এই প্রথম পুল্লাইয়া রোজগার করল। রোজগারের পয়সা বউয়ের হাতে দিতেই নীলির চোখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "এই তো এভাবে একটু আধটু রোজগার হলেই চলে যাবে।"

সন্ধ্যের সময় বিভিন্ন দোকানে ঘুরে পুল্লাইয়া চাকরি খুঁজে ঘরে ফিরতেই চেঁচামেচি কানে এল। মড়া বিড়ালছানার জন্য যে বউটা প্রথম দিন কাঁদছিল তার সেই দুঃখ কমে গেছে। সে নিজের রূপ ধরেছে। গোটা তল্লাটের লোক ওকে ভয় করে। ওকে নয়, ওর বাজখাঁই গলাকে। পুরুষরাও ওকে এড়িয়ে চলে। পুল্লাইয়া এই প্রথম তাকে ভাল করে দেখল। তার বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। ছেলে মেয়ে নেই, তাই দেখতে তিরিশের চেয়েও কম মনে হয়। তার শরীরের চার ভাগের এক ভাগ দেখে মনে হয় যে সে মেয়েছেলে। বাকি সমস্ত শরীরে পুরুষের ছাপ। স্বামীকে সে বগলদাবা করে রাখে। বাড়ির কর্তা মনে হয় যেন তার স্বামী নয়, সে নিজেই।

পুল্লাইয়া সামনে দাঁড়ালেও তার গলা দমল না। নীলি ক্ষীণকণ্ঠে যা বলল, তাতে সে থামল না। স্বামীকে দেখে নীলি ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করে জানা গেল যে ঘরটা স্বামী নাকি না জেনে দু টাকায় ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। এখন আর এক টাকা না বাড়ালে ঘর খালি করে দিতে হবে। "এই জন্যই এত চেঁচাচ্ছে?" পুল্লাইয়া বলল।

"কাচ্চা-বাচ্চারা নাকি ভীষণ হৈ-চৈ করে।"

"বাচ্চারা হৈ-চৈ করবে নাতো কি বুড়োরা করবে? দাঁড়াও আমি চারজনকে ডেকে পঞ্চায়েত বসাব। ও অত চেঁচাচ্ছিল আর তুমি চুপ করে ছিলে কেন?"

নীলি হেসে বলল, "ও আঁচল ফেলে চেঁচাচ্ছে বলে আমিও আঁচল ফেলে চেঁচাব?

আমি তো কোন দোষ করিনি, আমি অত বড় গলা করব কেন ? ওর রাগটা আগে পড়ুক, তারপর দেখা যাবে।"

"ওর রাগ ঘাটে যাওয়ার আগে পড়বে না।"

"শরীরে ঘা আর কতদিন থাকে। আমার দিদিমা বলত, ঘা নাকি একদিন শুকিয়ে যায়। ভালোর কাছে মন্দকে মাথা নোয়াতেই হয়। তা না হলে নাকি জগৎ সংসার চলত না।"

পুল্লাইয়া আর কোন কথা বলল না।

ঘুমোনোর আগে নীলি রাত্রের ঘটনা পাড়ল। পুল্লাইয়া মনমরা হয়ে গেল। কোন কথা বলল না। নীলি ধীরে ধীরে বলল, "দেখ, না হয় না খেতে পেয়ে মরে যাব। কিন্তু চুরি করতে যেও না।" পুল্লাইয়া বোঝানোর চেষ্টা করল যে ওটা চুরি নয়। সে বলল, "দেখ, জীবনের মোড় ঘোরাতে যেটুকু দরকার ছিল সেটুকুর জন্য আমি ওদিকে পা বাড়িয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি ভুল করেছি। আর ওপথে যাব না।"

"আমি যদি কারও বাড়িতে কাজ করি, আমাদের দুজনের রোজগারে কি চলে যাবে না ?" নীলি বলল।

পুল্লাইয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল ঐ রাজমিস্ত্রী আর যোগাড়েদের আচরণ। মেয়ে যোগাড়েদের সঙ্গে রাজমিস্ত্রীদের হাসি মস্করার দৃশ্য তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সে বলল, "লোকের বাড়িতে কাজ করার দরকার হবে না।"

পরের দিন পুল্লাইয়া পথে বেরিয়ে এর ওর কাছে কাজ চাইল। আবার সিণ্ডিয়া কোম্পানী, 'নেভাল বেস' ও বন্দরে গেল। যার তার পা ধরে অনুরোধ করল। কিন্তু কোন লাভ হল না। দুপুরে একজন দক্ষিণ দিকের লোকের মোট বইল। পুরো বিকেলটা তার মোট মাথায় করে বইতে হল। লোকটা ছিল নীলামের ব্যবসাদার। সন্ধ্যের সময় সে পুল্লাইয়ার হাতে বারো আনা পয়সা দিল। তাতে পুল্লাইয়া খুশী না হলেও নীলি খুব খুশী হল। শুনল দুপুরে বাচ্চারা নাকি খুব কাঁদছিল। পাশের ঘরের অল্পবয়সী বউটা বাচ্চাদের খাইয়েছে। ওরা যে কোন জাতের কে জানে। পেটে আগুন ধরলে জাতের কথা মনে থাকে না। রাত্রে পুল্লাইয়ার সহজে চোখে ঘুম এল না। সামনের গাছতলায় জুজুবুড়ো ঘুমোচ্ছিল। শীতে সে কুঁকড়ে পড়ে আছে। নুন জলের খালের পাশে রেলপথ। গাড়ি এলে জমিটা নড়ে। কোন কিছুর ভাবার সময় রেলগাড়ি এলে ভাবনাগুলো সব ছড়িয়ে যায়। হঠাৎ পুল্লাইয়ার মনে হল গাড়ীর নিচে পড়ে গেলে ভাল হত। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন বলল, "ছি, ছি, পুরুষমানুষ হয়ে জন্মেছ চার আনা পয়সা রোজগার করে আনতে পারো না ? ছেলে বউদের ফেলে রেখে মরতে চাইছ ?" সে যেন স্বপ্ন দেখছে তার শব দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ছেলে মেয়ে কাঁদছে। সে আবার বলতে লাগল, "কি করব বল! কাজ কর্ম না থাকলে বাঁচব কি করে ?

সারা শহর ঘুরেও কাজ পাওয়া যায় না। এ ক'দিনে বুঝেছি গরীবদের সুখ নেই। ভগবান যে কেন আমার কপালে এত দুঃখ দিল কে জানে।" ভাবতে ভাবতে পুল্লাইয়া ঘুমিয়ে পড়ল। সারারাত স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। সকালে উঠল। শরীরে ক্লান্তি ছিল। যথারীতি বেরিয়ে পড়ল। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদেরই চাকরির কথা বলল। স্টেশনে কুলিগিরি করতে গেল। কিন্তু যে কুলিদের লাইসেন্স ছিল তারা ওকে তাড়িয়ে দিল। একটা বুড়ি পোঁটলা নিয়ে অনেক কষ্টে হাঁটছিল। তার পোঁটলা বইতে চাইলে স্টেশনের কুলি ভেবে দিতে চায়নি। পরে দিয়ে দিল। পুল্লাইয়া তাকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার পর সে দু চারটি ভাল কথা বলে আশীর্বাদ করল। কিন্তু এক আনা পয়সাও ছোঁয়াল না।

পথে হাঁটতে হাঁটতে কাচ্চা-বাচ্চা বউয়ের কথা যত ভাবে তত তার চোখের সামনে কালো পর্দা নেমে আসে। পথে পথে একজনের দেখা পেল। তার নাকি গোটা শহর ঘোরা হয়ে গেছে। সে বলল, "জানো দাদা, গর্মেণ্ট আমাদের সাহায্যেই লালমুখোদের তাড়িয়েছে। অথচ দেখ আমাদের মত গরীবদের এখন কি অবস্থা। খালি অভাব আর অভাব! কত লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। অথচ আমাদের গর্মেণ্টের হুঁশ নেই…।"

"তা যা বলেছ দাদা। তবে আমাদের গর্মেণ্ট এখন তো শিশু, বড় হলে আমাদের দিকে তাকাবে।" পুল্লাইয়া বলল।

"তোমার কথাগুলো দাদা বোকাদের মত। গর্মেণ্ট কখনো শিশু হয় না, বড়ই থাকে। গর্মেণ্ট ঠিকমত কাজ করলে আমরা সবাই চাকরি পেতাম।"

"তাহলে করে না কেন?"

"করলে এই অভাবটা থাকবে কেন। গরীবের দুঃখ বুঝবে কে? গরীবদের কথা কেউ ভাবে না। গর্মেণ্ট যত রাজ্যের ঘুষখোরদের পুষছে। ওর কাছে ভালো লোকের ভাত নেই। এদের তো কোন ধর্ম নেই। হিন্দুধর্মে আছে ন্যায় পথে চল। এদের কি কোন ধর্ম আছে? হিন্দুধর্মে আছে পাশের লোককে দেখ। এরা কি দেখে?" বলে পুল্লাইয়া ও মল্লুকে ঐ লোকটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। মাছি আর মশা ভরে রয়েছে।

চা দিয়ে লোকটা বলল, "নাও দাদা, খেয়ে নাও।"

কোন কথা না বলে বাপ ব্যাটা চা খেয়ে নিল।

খিদের জ্বালায় এতক্ষণ কষ্ট পাচ্ছিল। তাই পুল্লাইয়া বা ছেলের কাছে গুড়ের চা ভালই লাগল। হঠাৎ বউ আর মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। পুল্লাইয়া ভাবল, "আমি না হয় চা খেলাম কিন্তু বউ আর বাচ্চা কিছুই তো খেতে পাচ্ছে না।"

ঐ নতুন বন্ধুটি বলল, "মিটিং-এ যাবে না?"

"মিটিং কি জিনিস?"

"জানো না? সামনে ভোট। ভোট কাকে দেব। কে আমার দুঃখ বুঝবে সেটা বুঝতে হবে না! দেখতে তো পাচ্ছ, বড়লোক আরও বড়লোক হচ্ছে। গরীব পথের ভিখিরী হয়ে যাচ্ছে। অধর্মে দেশ ছেয়ে গেছে। আমাদের কথা যে ভাববে তাকেই তো ভোট দিতে হবে। আমার কষ্টের কথা আর কি বলব! আমার বোনটা—"

পুল্লাইয়া হাঁক পাঁক করে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?"

লোকটার চোখ ছোট হয়ে গেল। আত্মসম্মানে যেন সে আঘাত পেল। সে বলল, "আমার বোন তার ইজ্জত বিক্রি করেছে। কেটে ফেলব ভেবেছিলাম, ভোজালিও জোগাড় করেছিলাম। সেদিন একটা কোপ বসিয়ে দিতাম। কিন্তু পারলাম না! দু'দিন ধরে আমাদের পেটে কিছু পড়েনি। মা-হারা আমার তিনটি বাচ্চা ঐ বোনের রোজগারে বেঁচে আছে। ও না খাওয়ালে কবে বাচ্চাগুলো টেঁসে যেত।" শুনতে শুনতে পুল্লাইয়ার মন ভীষণ দমে গেল।

"দাদা, ভেব না যে এসব মিথ্যে বলছি। বাঁচার সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নেই। 'আমার খিদে পেয়েছে' বলে সারা দেশের লোকের উপর দোষ চাপালেও কেউ কাউকে মেরে ফেলতে বলবে না। ওরা আমাদের জীবনের ভার বোঝে না। যার কাঁধে বাঁক সে বোঝে বোঝাটা কত ভারী। তিল দিয়ে ওরা তাল নেবার তালে থাকে। ওরা যখন তিল দেয় তখনই বুঝতে হবে তাল নেবে।" লোকটি বলল।

এসব কথাগুলো পুল্লাইয়ার মনে ধরল। তার মনে হল তাহলে আমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছি কেন। এত ভয়ের তো কিছু নেই। আমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় লোকে তো আছে। এত ভয় পাওয়া আমার উচিত নয়।

লোকটি মিটিং-এর জায়গায় পুল্লাইয়াকে নিয়ে গেল। তার মত লোক অনেকে ছিল সেখানে। অনেকেই শ্রমিক আর মধ্যবিত্ত। অতগুলো গরীব লোককে দেখে পুল্লাইয়ার আনন্দ হল। তার মনে হল, 'ওরা সবাই তার মত কষ্ট পাচ্ছে। তা না হলে এখানে আসবে কেন। আরে ঐ তো পাশের ঘরের পকেটমারটা। সেও এসেছে! এর জন্যই তো আমিও পকেট মারতে গিয়েছিলাম। লোকটা কি চিৎকার করছে!' পুল্লাইয়া আপন মনে বলল। এত লোকের কোলাহল, চিৎকার তার আগে সে কোনদিন শোনেনি। কিন্তু তার মধ্যে কোন উৎসাহ নেই। তাদের মধ্যে একটা রোগা লোক সভার মঞ্চে উঠল। উঠতেই অনেকে জয়ধ্বনি করল। পুল্লাইয়াও "জয়" বলল। বাপকে দেখে মল্লুও "জয়" বলল।

পাশের ঐ দাদাটি বলল পুল্লাইয়াকে, "জানো দাদা, সত্যের জয় একদিন হবেই। ঐ লালমুখো সাহেবরা, কি ভাবে শোষণ করতে হয় তা আমাদের দেশে অনেককেই শিখিয়ে গেছে। অনেকে ভালভাবে শিখে নিয়েছে। দেখছ না, জিনিস পত্রের দাম এক একদিন একরকম। চড়ছে তো চড়ছেই। সমানে বেড়েই যাচ্ছে। ওদের আশা যত

বাড়ছে, জিনিসের দাম তত বাড়ছে। ওরা ভাবছে যে চিরকাল এভাবে চালিয়ে যাবে। ওরে বাবা, অতবড় যে রাজা হরিশ্চন্দ্র সেও শ্মশানে পাহারা দিয়েছে। কেন? ধর্মের জন্য। তাই তো সে অমর হয়ে আছে। এদের মধ্যে ধর্মের নাম গন্ধ আছে? তাকিয়ে দেখ ঐ লোকটার দিকে। শোন কি বলছে।"

পুন্নাইয়া তার দিকে তাকাল। সে বলছিল, "কিন্তু ধর্মের জয় হবেই একদিন। আজ যারা লুটেপুটে খাচ্ছে কাল তারা কুকুরের মত পথে ঘাটে মরবে। আজকের যুবকরা জাগছে। ওরা ন্যায়ের পক্ষে, ধর্মের পক্ষে এগিয়ে যাবে। আর বেশিদিন ওদের খেলা চলবে না।"

যে লোকটা ভাষণ দিচ্ছে সে একেবারে ঝাঁটার কাঠির মত রোগা। কিন্তু নদীতে যেমন জল প্রবাহিত হয় তার মুখ দিয়ে তেমনি কথাগুলো বেরোচ্ছিল। লোকে অনেকবার তার ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে জয়ধ্বনি দিল, হাসল, ক্ষোভ দেখাল। বসে বসে যারা শুনছিল তারা আরও এগিয়ে গিয়ে বসল। বক্তা বলল, "আর দেরি নেই। জনগণ এবার শাসনের ভার নেবে।" শেষের দিকে বক্তা অনুরোধ করল কাকে ভোট দিতে হবে। ভাষণ শেষ হওয়ার পরে সভার লোকগুলো নানা ধরণের কথা বলাবলি করতে লাগল।

সভা শেষ হয়ে গেলে কে যেন কি বলতে লাগল মঞ্চে উঠে। মল্লু চিৎকার করে উঠল, "বাবা, ঐ দেখ জুজুবুড়ো।"

সে হাসতে হাসতে বলে গেল, "ওর কাছে তো টাকা খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। খালি জানে কি করে অন্য লোকের পকেট খালি করতে হয়। সব সময় অন্যের দোষ ধরে। আরে বাবা, সত্যি করে বল দেখি, তোমাদের মধ্যে ক'জনে তাস খেল না?"

আর একজন বলল, "সবের মূলে আশা। ঐ আশাই বাড়তে বাড়তে দুরাশা হয়। যারা তাস খেলে, জুয়ো খেলে, তারা আশার জন্যই খেলে। এসব হল আমাদের ঐতিহ্য।"

"তা তো বটেই।" আর এক শ্রোতার বক্তব্য। হাজার বছর ধরে আমাদের রক্তে যা ঢুকে আছে তা কি সহজে বেরোবে। যে বলদ ঘানি টানে সে কি আর রাতারাতি লাঙল চালাতে পারে।"

সভার শেষে আর কাজ না পেয়ে কিছু লোক ঐ জুজুবুড়োর পেছনে লাগল। বিরক্ত হয়ে সে ওদের বলল, "ওরে বাবা, আমি তো পাগল। তা না হলে লোককে আরও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দিতে বলতাম। যা আছে তা ভেঙ্গে যে কি করতে হবে তা তো জানি না। সব চেয়ে ভাল, আশাকে বাড়ানো। আশাকে বাড়ালেই সুখ লোপাট হয়ে যাবে। আশা অনেকটা দেয়ালের মত। ইঁটের পর ইঁট গেঁথে যাও। তার ফলেই তো এই অবস্থা। এক জনের দুঃখে আর একজন কাঁদে না। এই যে আমি এত বলি তা কেউ শোনে। কেন বলব না, আমার বলার অধিকার আছে। যারা শুনতে চাও না, শুনবে না। এই তো, দেশের কত পার্টি কত দল। কিন্তু কি

হচ্ছে ? একের পর আর একজন ওঠার চেষ্টা করছে। খালি ওঠার তালে আছে। উঠতে গিয়ে পাশের লোকটাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। খালি একা ওঠার তাল। পাশের লোককে নিয়ে ওঠার তাল নয়। সব নিজের নিজের তালে আছে। বললেই বলবে আমি পাগল···" বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ তাকে যারা খেপাচ্ছিল তারা সবাই কেটে পড়েছে।

পুল্লাইয়া উৎসাহের সঙ্গে ঘরে ফিরছিল। কিন্তু যত এগোতে লাগল তত তার মনে সেই অভাবের কথা জাগতে লাগল। সেই রাত্রে নীলি পাশের ঘর থেকে চোল্লুর আটা এনে একটু ফুটিয়ে রেখেছিল। ঘুমোনোর আগে পুল্লাইয়া ঠিক করল পরের দিন ঝুড়ি নিয়ে বাজারে যাবে।

একত্রিশ

এক একটা দিন যাচ্ছে আর পুল্লাইয়ার মনে হচ্ছে এক একটা যুগ যাচ্ছে। শরীরটা একেবারে কাঠি হয়ে গেছে। এক একদিন মোট পায়। এক একদিন পায় না। একদিন আবার গেল জাহাজে মাল নাবাতে। ভেবেছিল দু'বস্তা একসঙ্গে মাথায় করে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এক বস্তা মাথায় করে কিছু দূর যেতেই বড় কষ্ট হচ্ছিল তার। মোট বওয়ার কাজ। সারা দিনে মাত্র দু'একটা পায়। কোন কোনদিন একদম পায় না। শরীরের শক্তি যে তার কোথায় হারিয়ে গেল তা ভেবে পায় না।

একটা লোক কোথায় যেন কাগজে দরখাস্ত লিখে রেজিস্টারী করে পাঠাতে বলল। সে একদিন না খেয়ে ঐ পয়সায় রেজিস্ট্রী করে দরখাস্তটা পাঠিয়েছিল। তারপর থেকে প্রত্যেক দিন সে ভাবত, এই বুঝি তাকে ডাকবে, এই বুঝি তার চাকরি হয়ে যাবে। বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, "শহর না ছাই। ঘুম ভাঙলেই পয়সা চাই। পয়সা না হলে কিচ্ছু পাওয়া যায় না। আমার গ্রামটাই ভাল ছিল। ফিরে গেলে ভাল হত। কাঠ হোক, খুদকুটো যা হোক বিক্রি করে কাটিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু এখন যাই কি করে! সবাই হাসবে। যার আছে তার কাছেই সবাই আসে। যার নেই তাকে কি কেউ পোঁছে ? আর এখন শরীরের যা হাল হয়েছে দেখে তো চিনতেই পারবে না। চিনতে পারলে আবার হাসবে। কোন রকমে টাকা পয়সা করে দেশ গাঁয়ে গিয়ে যদি দু'একর জমি কিনতে পারি···পায়ে পা রেখে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব। এখানে এসে কি হল ? মাঝখান থেকে পেটটাই সমুদ্র হয়ে গেল। এ পেটের জন্য সকাল হলেই ছোটাছুটি কর।"

এ কথা সে কথা ভাবতে ভাবতে ভাবাটাই যেন তার অভ্যেস হয়ে গেছে। অনেক দিন পরে আবার সে একটা ঝুড়ি নিয়ে বাজারে গেল মোট বইতে। তার যাওয়ার আগেই ছেলে বুড়ো বুড়ি অনেকেই ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। মল্লুর চেয়ে দু'চার বছরের বড় ছেলেও ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়েছিল। ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে পুল্লাইয়ার বড় লজ্জা করছিল। ওর দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলে তাকে বলল, "লজ্জা করে না, ষাঁড়ের মত এসে আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছ?" লজ্জা করছিল পুল্লাইয়ার। কিন্তু কি করবে? পেটের জ্বালায় সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে হল। মল্লুর চেয়ে দু'চার বছরের বড় ছেলেকে দেখে তার মনে হল। মল্লুকেও কি এই কাজ করতে হবে? ভাবতেই আতঙ্কে সে চমকে উঠল। মনে মনে বলল, "না তা হতে দেব না।" পর পর চার পাঁচ দিন বাজারে গেল মোট বইতে। দিনের শেষে আট দশ আনা রোজগার হত। শুধু একদিন এক টাকার কিছু বেশি রোজগার হয়েছিল। কিন্তু তার মনে আনন্দ ছিল না। থাকবে কোত্থেকে? ঐ হাত দিয়ে সে নিজে কত লোককে দিনের শেষে মজুরী দিয়েছে।

এই অভাবের মধ্যেও নীলি হাত উপুড় না করে পারে নি। একদিন জুজুবুড়োকে একটু ফ্যানে ভাতে খাওয়াল। সে সাধারণত কারোর কাছে ভিক্ষে চাইত না। অনেকের ধারণা জুজুবুড়ো জ্ঞানী পুরুষ। অনেকে তাকে দেখে মনে করে কোন রহস্য আছে। সেদিন সে নীলির ঘরের সামনে দাঁড়াল। নীলি নিজের জন্য যে ফ্যানে ভাতে রেখেছিল তা ওর থালায় ঢেলে দিল। খেয়ে হেসে কি যে সে বিড়বিড় করে বলল নীলি কিছুই বুঝতে পারল না।

কদিন পরে ঝুড়ি নিয়ে পুল্লাইয়া আর বাজারে দাঁড়াতে পারল না। তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ছোট ছোট ছেলেরা তাকে যা নয় তাই বলতে লাগল। তার চুল দাড়ি বড় হয়ে যাওয়ায় তাকে সব সময় পাগল বলে খেপাতে লাগল। পুল্লাইয়া আপন মনে হেসে বলত, "আমাকে পাগল বলছ, দেখনি তো আমার সেই রূপ। আমার লাঠির খেলা দেখতে দশগ্রামের লোক জড়ো হত। তখনকার দিনে চারদিকের লোক এক ডাকে আমাকে চিনত।"

একদিন একটা বুড়ো বিরাট একটা বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিল। অনেক দূর হাঁটাল। পুল্লাইয়া তার পেছনে পেছনে হাঁটছিল। সারা পথে সে অনেক পারিবারিক কথা বলছিল। পুল্লাইয়া অবাক হল। ভাবল, "এতগুলো জিনিস যে কিনেছে, যার কাছে এত পয়সা আছে তার পরিবারেও এত অশান্তি, এত দুঃখ। আর বলছে কাকে, না আমাকে। শিল নোড়া দুঃখ জানাচ্ছে তবলার কাছে। আমি কার কাছে দুঃখ জানাব! লোকে বলে ঘরের কথা পরের কাছে বলতে নেই। আমি একটা অজানা লোক আমার কাছে তো বুড়োটা দিব্যি বলে যাচ্ছে। আবার বলে কিনা নিজস্ব কোঠাবাড়ি আছে। ছেলে নাকি বিরাট চাকরি করে···বুড়োটা যা বলছে তা যদি

সত্যি হয় তাহলে এদের কষ্ট কিসের ? দশ হাজার টাকা না থাকলে নাকি এক একটা মেয়ে পার করা যায় না। ওরে বাবা, একেবারে দশ হাজার ! আমার হাজার দুয়েক থাকলে একেবারে পায়ে পা রেখে কাটিয়ে দিতাম। ঐ যে কথায় বলে যত বড় গাছ তত বেশি হাওয়া।"

বুড়োর প্রত্যেকটা কথাতেই হ্যাঁ হুঁ করে যাচ্ছিল সে। একটা বিরাট পাকা বাড়ির সামনে অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়েছিল। সে দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়া বলল, "ওখানে অত লোক কেন ?" ছেলে ওদের দিকে তাকিয়ে তর্জনী দেখিয়ে বলল, "বাবা, বাবা, দেখ কত লোক !"

বুড়ো বলল, "ওটা হল, এমপ্লয়মেণ্ট্ অফিস। ওখানে চাকরি-বাকরি দেয়।"

পুল্লাইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, "তাই নাকি বাবু ! এই শহরে এ রকম যে একটা জায়গা আছে তা তো আমাকে কেউ বলেনি ! ভাগ্য মন্দ হলে যা হয়।"

"ওখানে গেলেই যে তোমার ভাগ্য ভাল হয়ে যাবে তার কোন মানে নেই।" বুড়োর এই কথা পুল্লাইয়ার কানে ঢোকেনি। মনে মনে ভাবল, তাড়াতাড়ি বোঝাটা দিয়ে আমি সোজা এখানে চলে আসব। হনহন করে বোঝাটা বুড়োর বাড়িতে রেখে সে যে কটা পয়সা দিল তাই নিয়ে সোজা এমপ্লয়মেণ্ট্ অফিসের কাছে এল।

"বাবা, কত লোক।"

ঝুড়িটা বাইরে রেখে জোড়হাত করে একে ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। সকলের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখল। অনেকের গায়ে পরিষ্কার জামাকাপড় ছিল। ময়লা জামা কাপড় পরা লোকও ছিল। কিন্তু ওদের সকলের চেয়ে পুল্লাইয়ার জামা কাপড়ের অবস্থাই খারাপ ছিল।

সে একজনকে কাকুতি মিনতি করে বলল, "আমাকে একটা কাজ পাইয়ে দিন না ?"

সে মুখ টিপে হেসে বলল, "ভেতরে ঢুকে যাও।"

পুল্লাইয়া সোজা ভেতরে ঢুকতে যেতেই দারোয়ান বাধা দিয়ে বলল, "যাও, যাও, বাইরে যাও।"

পুল্লাইয়া চমকে উঠে দু পা পেছিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মল্লুও পেছোল।

ওকে পেছোতে দেখে দারোয়ান বলল, "তোমার যা অবস্থা দেখছি তুমি আর কি কাজ করবে ?"

তার কথা শুনে পুল্লাইয়া সকাতরে বলল, "তোমার পুণ্য হবে বাবা ! আমি পূবের ছেলে, বউ ছেলে মেয়ে আছে। এক সময় ভাল অবস্থাই ছিল। কিন্তু এখন পড়ে গেছে। আপনার সাহায্যে মাস মাইনের একটা চাকরি পেলে আপনাকে খুশী করব। আমার ক্ষমতা আর কতটুকু। তবু যতটা পারি···" দারোয়ান খেপে গিয়ে বলল, "যাও, এখান থেকে। তুমি আমার কাছে ঘুষের কথা বলছ ? দেখছ না কত নোটিশ বোর্ড আছে। ওসব ভাল করে পড়ে দেখ। তুমি পড়তে না পার অন্যকে দিয়ে

পড়িয়ে নাও।”

“দিন, যে কোন ভাবে একটা চাকরি পাইয়ে দিন। আপনার পায়ে জুতো হয়ে হয়ে থাকব।”

দারোয়ান অফিসারের মত জবাব দিল, “যাও, যাও। কাজ করতে এসেছে, কাজ। কত এম. এ. বি. এ. ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে···” বেল বাজতেই দারোয়ান ভেতরে চলে গেল। সে আর কথাটা শেষ করতে পারল না।

পুল্লাইয়া এক কোণে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু কেউ তাকে ডাকল না। শেষে ঝুড়িটা পাশে রেখে বসে পড়ল। তখনও মল্লু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাপকে প্রশ্ন করছিল। ভিড় অনেকখানি কমে গিয়েছিল। বিরক্তির জন্য অথবা বাপের প্রতি দরদের জন্য মল্লু ঘরের ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দেখল। একটা লোক ঐ ঘরের চেয়ারে বসেছিল। ঐ লোকটাই হয়ত কাজ দেয়। সবাইকে দেবে আমার বাবাকে দেবে না কেন? আমার বাবা কত ভাল। সে ঝট করে ভেতরে ঢুকে ঐ অফিসারকে বলল, “আমার বাবাকে কাজ দেবে কিনা বল?” পরক্ষণেই দারোয়ান মল্লুকে ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাইরে আনল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, “আমার বাবাকে যদি কাজ না দাও আমি কুকুরছানা এনে সবাইকে কামড়ে দিতে বলব।” আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা হো হো করে হাসতে লাগল। দারোয়ান রেগে গিয়ে গর্জে উঠল, “যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে। পুঁচকে ছোঁড়া তার আবার কথা কি। একেবারে ধানিলঙ্কা।” আরও কত কি সে বলল।

পুল্লাইয়া ঠায় বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। মল্লু ঝুড়িতে বসে অফিসারের ঘরের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন সময় একটা লোক—দেখতে বেশ ভদ্র, পুল্লাইয়াকে জিজ্ঞেস করল, “তোমার দেশ কোথায়?”

পুল্লাইয়া লোকটার পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, “আজ্ঞে আমার দেশ পূবে। গ্রামের নাম নবিরি।”

“তাই নাকি!” লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল।

লোকটার কথাবার্তা শুনে পুল্লাইয়ার মনে হল তার মনে দরদ আছে। সে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল।

লোকটার বাড়ি কাছেই ছিল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে পুল্লাইয়া দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে বলল, “দেখ, আমি কিছুই করতে পারব না।” বলে লক্ষ্য করল পুল্লাইয়া নড়ছে না। তবু দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ঢুকে দুপুরের খাওয়া খেতে বসল। খেয়ে উঠে দরজা খুলে দেখে পুল্লাইয়া বসে আছে। সে বলল, “কি হল বলছি না, চাকরির ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারব না।”

“আজ্ঞে আপনি না করলে আমাকে আর কে করবে বাবু? আপনার মন ভাল।

আপনারা লেখাপড়া জানা লোক। চার রকম খবর রাখেন। আপনি একটু দয়া না করলে⋯”

চেয়ারে বসে লোকটা পুল্লাইয়াকে ভেতরে ডাকল। সে ভেতরে ঢুকে মেঝেতে বসে ছেলেকে দিয়ে প্রণাম করিয়ে, নিজে প্রণাম করল।

“তুমি যা করছ তাতে মনে হচ্ছে আমি একটা ভগবান। ইচ্ছে করলেই তোমাকে আমি চাকরি দিতে পারি। কিন্তু আমার হাতে কিছু নেই। খুব জোর তোমার নাম ঐ চাকরি প্রার্থীদের খাতায় লিখিয়ে দিতে পারি।”

“তাতেই হবে বাবু। আজকে না পাই কালকে তো পাব!”

“ওরে পাগল, ঐ খাতায় নাম লেখালেই চাকরি হয় না। সরকার দেখবে কোথাও খালি থাকলে তোমাকে পাঠান যায় কিনা। সেই কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে কিনা তাও দেখবে। তারপর তোমাকে সেখানে পাঠাবে। শুধু খাতায় নাম লেখালে কিছু হয় না।”

পুল্লাইয়ার উজ্জ্বল মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবু তার মনে দৃঢ়বদ্ধ ধারণা ছিল এই লোকটা চেষ্টা করলে হবে। সেই বিশ্বাসে পুল্লাইয়া বলল, “যাই বলুন বাবু, আমি আপনার পা ছাড়ছি না। আমার এই বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ভালো অবস্থার সময়েই ছেলে আমার জন্মেছিল বাবু! এ যেদিন হয়েছিল সেদিন বাবু বৃষ্টি পড়েছিল। আপনি আমাকে কাজ দিলে এই ছেলে দেখবেন বাবু একদিন কত বড় হবে। নীতি ধর্ম রক্ষা করবে। চোরকে ধরবে। সাধুকে ভিক্ষে দেবে। আপনি দয়ালু লোক, দেখুন বাবু, আমার এই কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে। এই ছেঁড়া গেঞ্জি ছাড়া অন্য কোন জামা নেই। খেতে পাচ্ছি না জামাকাপড় কোত্থেকে পাব! দু দিন না খেয়ে একটা দরখাস্ত রেজিস্টারী করে পাঠিয়ে ছিলাম বাবু, কেউ ডাকে নি। কোন সাড়াশব্দ পাই নি। ঝুড়ি নিয়ে মোট বইতে বেরোই। কিন্তু তাতে কিচ্ছু হয় না বাবু! আপনি বলুন বাবু, আট গণ্ডা পয়সায় ছেলে মেয়ে বউ কি খাব। আমাকে দেখে সবাই ভাবে আমার অসুখ করেছে। অসুখ আমার একটাই বাবু, খিদে। খেতে পাই না। এটাই অসুখ। আপনারা জোয়ান ছেলে আপনারাই পারেন আমাদের উপকার করতে।”

“দেখ, সত্যি বলছি আমি চাকরি দিতে পারি না। আমার সে ক্ষমতা নেই।”

লোকটা এমন ভাবে বলল তাতে বোঝা যায় যে সে অসহায়। কিন্তু তার ঐভাবে সবিনয়ে বলার ফলে পুল্লাইয়া বলল, “বাবু, সত্যি যারা পারে তারা কি মুখ ফুটে বলে বাবু? আপনি ধর্মাত্মা। আমার বউকে আপনি চেনেন না বাবু। খুব ধর্ম মানে। ন্যায় বিচার আছে। তাকে বাবু আমি একটু ভয় করি। ওর অনেক পুণ্য জন্মেছে। আজ না হোক কাল ওর পুণ্যের ভাগটা আমি পাব। ভগবান আমার মত গরীবদের খুব কষ্ট দেন বাবু। শেষে বাবু ঐ ভগবানই আমাদের একটা পথ দেখান। ভগবান

নিজে কি আর দেখান! আপনার মত লোককে পথ দেখাতে পাঠিয়ে দেন। আমি বাবু বেশি কিছু চাই না, পেটে একটু কিছু খেতে চাই। ফ্যানে ভাতে হলেও আমার চলে যাবে বাবু! দেহটা আমার এখন পড়ে গেছে বাবু, আগে ভাল ছিল। কাজে আমি ফাঁকি দিই না। আমার এই অবস্থায় ভগবান আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবু। আপনাকে শতকোটি প্রণাম বাবু। দেন আমাকে একটা চাকরি পাইয়ে দেন বাবু।" বলে পুল্লাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। ছেলেও প্রণাম করল। চেয়ারে বসে লোকটার চোখে জল এল। আড়ালে দাঁড়িয়ে তার বউ এতক্ষণ শুনছিল। তার চোখেও জল দেখা দিল।

তার ওঠার সময় হয়ে এল। কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। যাই বলুক না কেন পুল্লাইয়া তার দুঃখের কাহিনী শুরু করে দেবে ভেবে সে বলল, "কাল সকালে দশটায় এসো। দেখি কি করতে পারি···ভাল কথা, তোমার নাম কি?"

"বাবু, আমার নাম পুল্লাইয়া।"

"এই নাও, এই আট আনা নিয়ে যাও। ছেলেকে কিছু খেতে দাও।"

খুশী হয়ে পুল্লাইয়া বলল, "আপনার এই ঋণ বাবু ভুলবো না। বাড়িতে কোন কাজ আছে বাবু? কয়লা ভেঙ্গে দেব? কাঠ চিরে দেব? আশেপাশে যে জঞ্জাল আছে তা পরিষ্কার করে দেব বাবু?"

প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবেই 'না' বলে শেষে লোকটা বলল, "এখন দুপুর হয়ে গেছে। ভীষণ গরম পড়েছে। আজ নয়, অন্যদিন করবে।"

লোকটাকে বউ বলল, "হ্যাগো দেখনা বেচারিকে কিছু করতে পার কি না। বেচারা বড় কষ্টে আছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বউকে বলল, "যারা এই ধরণের কিছু করতে চায়, তাদের ক্ষমতা থাকে না। আমি সামান্য একটা কেরানী। ইতিমধ্যেই আমাদের অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে লোকের বিরূপ ধারণা হয়ে গেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করে আমি কোথাও ওকে পাঠাতে পারি। কিন্তু কাজে নেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই। ওদের যদি পছন্দ হয় নেবে।"

সে পুল্লাইয়াকে যা বলবে ভেবেছিল তা বউকে বলে দিল।

পরের দিন রেজিষ্টারী খাতায় পুল্লাইয়ার নাম লিখে দিল। সন্ধ্যার সময় পুল্লাইয়াকে সব কিছু বলে বুঝিয়ে দিল। "কোথাও খালি হলে আমি তোমাকে পাঠাবো। ওদের যদি পছন্দ হয় তোমাকে নেবে। এর বেশি আমি কিছু করতে পারছি না।"

"এতটা কে করে বাবু! আজকাল আমার খিদে পেয়েছে বললে কে খেতে দেবে বাবু। আপনার মত এখনও দু চারজন আছে তাই জগৎ সংসার ডুবে যায় নি। তা না হলে কবে এসব কিছুকে সমুদ্দুর গিলে ফেলত।"

পরের আট দশদিন, মাঝে মধ্যে এসে পুল্লাইয়া খবর নিয়ে যেত। একদিন লোকটা পুল্লাইয়াকে হাতে একটা কাগজ দিয়ে বলল, "ঠিক দশটার সময় এই আপিসে যাবে। এই ভাবে যদি যাও কোন কাজ হবে না। ভাল জামাকাপড় পরে যাবে। আর দাড়িটা কাটবে। আর অত বড় চুল রেখেছ কেন? চুল ছেঁটে ফেল। ছোট ছোট চুল রাখবে। ভাল করে চুল আঁচড়ে যাবে। মনে রেখ, পহিলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী। আগে তো তোমাকে দেখবে, তারপর তোমার কথা শুনবে। শেষে দেখবে, তোমাকে কাজ দেবে কিনা। যা জিজ্ঞেস করবে সব বলবে। ঢুকেই এভাবে স্যালুট করবে।" লোকটা বার বার পুল্লাইয়াকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল।

দিনের দিন এসে গেল। পুল্লাইয়া চুল কেটে ফেলল। জামাকাপড় পাশের ঘরের পকেটমারের কাছে ধার চাইলে সে জানিয়ে দিল, ওগুলো কোনটাই তার নয়। প্রত্যেকটাই নাকি ধোপার। ধোপারা জামাকাপড় ভাড়া খাটায়। তার উপদেশে পুল্লাইয়া ধোপার বাড়ি থেকে একটা খাঁকি প্যাণ্ট ও জামা ভাড়ায় আনল। গায়ে দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়া হতাশ হল। চুলের ঝুটি কেটে ফেলায় তাকে আরও ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছিল। এক সময় তার ঐ ঝাকড়া ঝাকড়া চুলের নাচন, লাঠি ঘোরানোর সময়, কত লোকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখত। চুল কাটার সময় মল্লুও নাপিতের উপর রেগে যাচ্ছিল। পুল্লাইয়ার খুব খারাপ লাগছিল তার এত সাধের চুল ছাঁটতে। জমি হাত ছাড়া হওয়ার দিনেও সে এত কষ্ট পায় নি। তবু পেটে টান পড়লে কি করা যাবে। আগে পেট তারপর সব।

ইণ্টারভিউ দিতে আরও পঁচিশ পঞ্চাশজন লোক এসেছিল। আপিসটা শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে ছিল। রোদ মাথায় করে পুল্লাইয়া হেঁটে গেল। ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুটো অফিসার পরীক্ষা করছে। পুল্লাইয়ার খিদে পেয়ে গেল। পয়সাকড়ি পকেটে ছিল না। যা ছিল পোশাক ভাড়ায় খরচ হয়ে গেছে। ঘরে ফিরে যে খেতে পাবে এমন কোন কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে তাকে ডাকল। সোজা দাঁড়াবার ক্ষমতা তখন পুল্লাইয়ার ছিল না। ডাক পড়তেই উঠে ঐ ঘরে ঢুকল। অতগুলো সজ্জিত লোককে পুল্লাইয়া এর আগে কোনদিন দেখেনি। ওদের মধ্যে একজন ছিল ফর্সা, লম্বা। আর একজনের গায়ের রং একটু কালো। তার চোখে চশমা। মুখটা বড় এবং গম্ভীর।

"তোমার নাম?" ঐ বাঙালী অফিসার হিন্দিতে প্রশ্ন করলে পুল্লাইয়া ঘাবড়ে গেল। পাশেই ছিল তামিল অফিসার। সে একটু আধটু তেলুগু জানত। পুল্লাইয়াকে সে বুঝিয়ে বলল, "তোমার নাম জিজ্ঞেস করছেন।" সেই ঘরে মাতৃভাষায় প্রশ্ন শুনে পুল্লাইয়া আবার চমকে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "বাবু, আমাকে একটু দয়া করুন। আমি পূবের ছেলে। ঘরে কাচ্চাবাচ্চা বউ আছে। এক সময় ভাল অবস্থা ছিল এখন পড়ে গেছে। খেতে না পেয়ে আমরা মরে যাচ্ছি বাবু!"

বাঙালী অফিসার তামিল অফিসারকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, "কি বলছে ?" তামিল অফিসারটি তেলুগু যে ভাল বুঝতে পারেনি তা না বলে বলল, "লোকটা নিজের অতীত জীবনের কাহিনী বলে যাচ্ছে।" পরক্ষণেই পুল্লাইয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "ওসব নয়, তোমার নাম কি বল ?"

"পুল্লাইয়া।"

বাঙালী অফিসার তামিল অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, এই নামে আশেপাশে কোন ঠাকুর দেবতা আছে নাকি ?"

তৎক্ষণাৎ তামিল অফিসার বলল, "না, না, পুল্লা মানে টক। মানে ও হল টকে যাওয়া লোক।"

"সে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।" বলে বাঙালী অফিসারটি একটা বাক্সের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করতে করতে বলল, "ওটা মাথায় তুলে নাও তো।" পরক্ষণেই তামিল অফিসারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "বেচারা কাঁপছে।" পুল্লাইয়া বাক্সটা মাথায় তুলে আবার নামিয়ে বলল, "পেটে দানাপানি কিছু নেই তো বাবু, সেইজন্য শরীরটা কাঁপছে। এই জামা কাপড় ভাড়ায় এনেছি। শুধু আমি কেন, ছেলেমেয়ে বউ সবাই ঝাঁটাকাঠির মত রোগা হয়ে গেছে। দশবেলা ঠিকমত খেতে পেলে একটা কেন একসঙ্গে দুটো বাক্স মাথায় তুলে নিতে পারব।" বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেল।

তামিল অফিসার বলল, "ঠিক আছে যাও। এম্‌প্লয়মেন্ট্‌ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে খবর পাবে।" শুনেই পুল্লাইয়ার বুকে সাহস হল। তার মনে হল সে চাকরি পেয়ে গেছে। থেমে থেমে হেঁটে হেঁটে সে যখন ঘরে ফিরল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সোজা এসে বারান্দায় হেলান দিয়ে বসে পড়ল। নীলি দুপয়সা দিয়ে শাক এনে ফুটিয়েছিল। ঐ পাড়ারই এক মেয়েছেলের কাছ থেকে নীলাম্মা মাসে চার আনা সুদে একটাকা ধার করেছিল। পেট কিছুটা ভরে গেলেই পুল্লাইয়া ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ঐ বাবুর সঙ্গে দেখা করল। যা হয়েছিল তা বলল।

"ঠিক আছে খবর নিয়ে আমি তোমাকে পরে জানাব।" বলে ঐ ভদ্রলোক পুল্লাইয়াকে বিদায় দিল। প্রণাম করে পুল্লাইয়া ফিরে গেল। এটা ওটা করে চারদিন কাটিয়ে আবার ঐ বাবুর কাছে সে গেল।

ভদ্রলোক পুল্লাইয়াকে বলল, "ওরা তোমাকে নিল না। আমি আর কি করব বল ?" পুল্লাইয়ার মনে হল যেন তার কোমর ভেঙ্গে গেছে। শুনেই সে মাটিতে বসে পড়ল। তার কান্না পেল। হাউ মাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করল। কিন্তু অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। শেষে ভাঙ্গা গলায়, কোন আপনজন মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ধরণের স্বর বেরোয় সেই স্বরে সে বলল, "বাবু, আমার ঐ ঝাকড়া ঝাকড়া চুল দেখে, আমার লাঠি ঘোরানো দেখে দশ গাঁয়ের লোক জড়ো হয়ে তাকিয়ে দেখত। আমার অত সাধের চুল ছেঁটে ফেললাম। হতে হতেও আমার কাজটা হল না। আপনি কত

চেষ্টা করলেন তবুও হল না। আমার শনির দশা হয়েছে বাবু, আমার আর এখন কিছু হবে না।" বলতে বলতে পুল্লাইয়া চলে গেল।

বত্রিশ

খুব শীত পড়েছে। এখানে ওখানে যারা কুলিগিরি করে দিন এনে দিন খেত তারা এমনি এমনি মিটিং-এ যেতে রাজী হল না। একবেলা খোরাকি না পেলে তারা যেতে রাজী হল না।

"দেখ দাদা, এ লোকটার একটা পয়সাও নেই। এক টাকার সম্পত্তিও নেই। এ বেচারা বড়লোকদের মত ভোটের বাজারে খরচ করবে কি করে? আমাদের মত লোকের জন্যই লোকটা খাটে। এই ভোটের সময় আমরা যদি একটু দেখি ও ভোটে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।" এই কথা শুনে পুল্লাইয়া পেটের কথা না তুলে "ভোট দাও, ভোট দাও" করে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াল। অনেক ধরনের লোককে দেখল। ওদের মধ্যে মাস মাইনের চাকরি করার লোকও ছিল। কেউ কেউ মাইনে পেয়ে জুয়ো খেলে, ঘরে এক পয়সাও এনে দেয় না। ছেলে মেয়ে বউকে না খাইয়ে মারে। ওরাও চায় যারা গরীবদের রক্ত চুষে খাচ্ছে ওদের গুলি করা হোক। সরকারের বিরুদ্ধে ওরা অনেক গরম গরম কথা বলল। "ওরা ন্যায়ের পথে চলে না। এখন যে সরকার আছে সে সরকার গরীবদের দিকে তাকাচ্ছে না।" এই ধরনের অনেক কথাই ওরা বলছিল। পুল্লাইয়ার কানে কিছু কথা গেল, কিছু কথা গেল না। তবে সবাই মিলে "জয়" বলে চিৎকার করার সময় পুল্লাইয়াও হাত তুলে বলছিল। ঘরে ফেরার সময় সে ভাবল, "এবার আমি চাকরি পাব। ওখানে যা বলছে নিশ্চয়ই তা হবে। তা না হলে আমার মত অত লোক ঐ মিটিং-এ যাবে কেন!"

পর পর তিন দিন এক পয়সাও রোজগার নেই। তৃতীয় দিনে পুল্লাইয়া নীলিকে সব কথা বলল। নীলি হতাশ হয়ে বলল, "এই জন্যই তুমি অত সকাল সকাল যাচ্ছ।"

"তুমি বুঝতে পারছ না। এবার নতুন ছেলেরা উঠছে। এবার সব ওলটপালট হতে পারে। রাজা থেকে আমাদের মত লোক পর্যন্ত সব সমান হয়ে যাবে। সবাই সমান ভাবে খাবে।"

নীলি হেসে বলল, "ঐ মাঠে চেঁচিয়ে খাবে?"

"তুমি হেসো না তো। যা বোঝ না তা নিয়ে হেসো না। তুমি জানো আমরা যার জন্যে খাটছি সেই গর্মেণ্ট হবে। যে হাতে করে লাঙ্গল চালায় তাকেই জমি দেবে। যারা মোট বয় তারা দিনে কম করে তিন টাকা পাবে। কাউকে ভিক্ষে করতে হবে না।"

"যারা করে তারা ওভাবে বলে বেড়ায় না।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না তো দেখবে, বড়লোকদের টাকা পয়সা গর্মেণ্ট কেড়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেবে।"

"ঐ টাকা যা পাবে খরচ করো না। গরীবদের নিয়ে সবাই ভাবছে। "পেটে নেই ইন্দি ভজরে গবিন্দি'। তুমি আর কাজ পেলে না ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে? তোমার পাঁচটা আঙুল কি সমান আছে? যে জিব চারজনের সঙ্গে ভাল কথা বলে সে জিবটাকে কেটে তুমি দুটো জিব বসাতে বলছ? এসব করা কি আমাদের সাজে! বড় নাক কেটে সকলের সমান নাক করা হয়। আজকে নাক কাটবে কাল গলা কাটবে পরশু পেটের বাচ্চাটা মাটিতে পড়লে তাকেও কাটবে। এসব আমার ভাল লাগে না।" বিরক্ত হয়ে বলে নীলি তার দিদিমাকে স্মরণ করল। বিপদ আপদে দিদিমাকে স্মরণ করা নীলির অভ্যেস।

পুল্লাইয়া কোন কথা বলল না। শীত করছিল তবু সে বাইরে ঘুমোল। সেই রাত্রেও শুয়ে শুয়ে সে শুনতে পাচ্ছিল "ভোট দেবেন কাকে" ধ্বনি। ভোটের একটা আওয়াজ চারদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। প্রত্যেকটা বাড়িতে ভোট নিয়ে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। পাশের ঘরের পকেটমার এবং তার বউ ভোটের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি করছিল।

তর্কাতর্কি দু একটা জায়গায় হাতাহাতিতে পরিণত হচ্ছিল। সেই রাত্রে জুজুবুড়ো গাছের নিচে কুকুরছানার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল। ওর কথা .কিছু কিছু পুল্লাইয়ার কানে আসছিল। পুল্লাইয়ার ইচ্ছে করল কুকুরছানাটিকে তুলে মল্লুর ঘুম ভাঙ্গাতে। কিন্তু পরক্ষণেই আর ইচ্ছে করল না। জুজুবুড়ো যা বকবক করে বলছিল তাতে মনে হল সেও ভোটের ব্যাপারেই কথা বলছে। সে বলছিল, "ভোট আর ভেট। ওরা জানে ভোটের কত ভেট। ভেট না হলে ভোট হয় না। ভোটে যারা জেতে তারাও ভেট পায়। যার দিকে বেশি হাত উঠবে সেই হল ডেমোক্রেসির বাবা। সবাইকে সব কিছু জানাতে হয়, এটাই ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসির নামে হয় ভোট। ভোটের নামে হয় তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি। যখন সে গদিতে থাকবে তখন তাকে কিছু লোক অপছন্দ করলেই ডেমোক্রেসি রইল।"

পুল্লাইয়া এক পা এক পা করে ঐ ভাষণদানকারী জুজুবুড়োর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাকে বলছ?"

সে পুল্লাইয়ার দিকে না তাকিয়েই বলল, "কাকে আর বলব, ইট, কাঠ, আর পাথরকে বলছি। এই গাছটাকেও বলছি। দু'দিন পরে এরাও ভোটে দাঁড়াবে। গাছ জিতে যাবে। গাছের প্রাণ আছে। প্রাণ থাকলেই প্রাণী। প্রাণী হলেই ভোটার।"

"তুমি এসব কথা মিটিং-এ বল না কেন?"

"ধুৎ। ইংল্যাণ্ডে যে পার্লামেণ্ট আছে তাতে রয়েছে ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসি

কি শুধু পার্লামেন্টে থাকে। হুঁ হুঁ এসব খবর কেউ জানে না।" বলেই জুজুবুড়ো অনেকক্ষণ হাসতে লাগল।

জুজুবুড়োর কথা পুল্লাইয়া কিছুই বুঝতে পারল না। তবু তার কাছে বসে কিছু কথা শুনতে তার ইচ্ছে করছে। খালের ওপর থেকে যে হাওয়াটা আসছিল তা যে আরও ঠাণ্ডা। ওর কাছে বসে তার বেশ ভাল লাগছিল। কিছুক্ষণ পরেই তার মনে হল এই সুযোগে এই জুজুবুড়োকে ঐ সোনার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কেমন হয়? সোনার সন্ধান যদি ঠিক পেয়ে যাই কিছু জমি কিনে দেশে থাকব। একেও এখানে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে দেব না। দেশে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে পরিয়ে রাখব। পরক্ষণেই মনে হল এভাবে রাতারাতি যে টাকা আসে সেই টাকা তো আবার রাতারাতি চলে যায়। গাঁয়ের মোড়লের রাতারাতি টাকা হল কি করে? তার বাবা ছিল রেঙ্গুনে। বাড়ির বোনেদ খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ সোনার বাক্স পেল। সেটা পেয়েই তো রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল। সে ভাবে আমিও তো হতে পারি। সোনা পেলে এই অভাবের দিন আর থাকবে না। মল্লুকে লেখাপড়া করাতে পারব। এই ধরণের কথা পুল্লাইয়া ভাবছিল।

জুজুবুড়ো আবার বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "ও নাকি গণ্যমান্য ব্যক্তি। শহরে চারকোণে চারটি মাগী রেখেছে। সে নাকি দেশভক্ত। সবাই নাকি তাকে মানে। ওকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে। ও নাকি আবার দানধর্ম করে। দু একটা জায়গায় দাতা হিসাবে ওর নাম ফলকে লেখা আছে। ওর এই হাবভাব দেখে আমার গা জ্বালা করে। আজ এর দিকে কাল ওর দিকে। যে জেতে তার দিকে থাকে। এহেন লোকটাকে এবারে আবার ভোটে দাঁড় করাবে। দাঁড়াক, বেশ কিছু লোককে ঠকানোর সুযোগ পাবে। লেখাপড়া জানা লোকগুলোই বেশি বোকা। খেতাব আছে কিন্তু অসভ্য। মূর্খদের খেতাব নেই কিন্তু সভ্য। না আমি ওকে মেরে ফেলতে বলছি না। কোন মানুষ খুনোখুনি পছন্দ করে না। মানুষ মানুষই, পশু নয়। মানুষ আর পশুর মধ্যে প্রভেদ আছে। এখন ভাবতে হবে ঐ লোকটা পশু না মানুষ! যারা সত্যের জন্য লড়ে তারাই মানুষ। তাদের মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করে। যারা নিজের কথা ভেবে নিজেকে তুলে ধরে ওরা কিসের মানুষ? পশু শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যারা পরের জন্য ভাবে তারাই মানুষ! দেবতা কি আকাশে থাকে, দেবতা থাকে সত্যের মধ্যে। যেখানে সত্য সেখানেই দেবতা।"

বলতে বলতে জুজুবুড়ো শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল। পুল্লাইয়া এই সুযোগে সোনার প্রশ্নটা করবে ভাবছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে আরও এগিয়ে খুব কাছে বসে সে বলল, "সোনা কোথায় পুঁতে রেখেছ?"

"কি?"

"সোনা পুঁতে রেখেছিলে না?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ?"

"নারকোল গাছের গোড়ায় ।"

"বাড়ির পেছনের…"

"হ্যাঁ ।"

"নারকোল গাছের কোন দিকে ?"

"সামনেই ।"

"কত ভরি…তোমার তো ?"

বিরক্ত হয়ে জুজুবুড়ো বলল, "ওর ? ওই তো আমাকে খুন করাল। সোনাটা ওরই। এ সবের তোমার দরকার কি ? যাও, যাও।" হঠাৎ ধমক দিল। আর কোন প্রশ্নের জবাব সে দিল না। পুল্লাইয়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

"দুনিয়ার কি অবস্থা ! বিচিত্র দুনিয়া ! কিচ্ছু নয়। সব ঝুটা হায়। সব মায়া। মেয়েছেলে মাত্রই মায়া। পুরুষ মাত্রেই ধোকাবাজ। আমার কুকুর সেটাও চুরি হয়ে গেল।"

পুল্লাইয়ার মনে দয়া জাগল। তাড়াতাড়ি সে বারান্দায় গিয়ে মল্লুর পায়ের কাছে যে কুকুরছানাটি ঘুমোচ্ছিল সেটিকে এনে তাকে বলল, "এই নাও তোমার কুকুরছানা। এখানে তুমি আর আসবেনা। এলেই তোমার কুকুর হারিয়ে যাবে।"

জুজুবুড়ো আনন্দে একলাফ দিয়ে কুকুরছানাটিকে বলল, "এসেছ বাবা, এসেছ ! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" বলে তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে চুমো খেল। যাওয়ার সময় কুকুরছানাটি কেঁও কেঁও করে উঠল।

"বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। কত দিন পরে দেখা, তোমারও অনেক কথা আছে। চল।" বলে কোলে নিয়েই সে চলে গেল।

পরের দিন সকালে ঘরের সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে তাকে বলল, "কাজ করতে আসবে ?" পুল্লাইয়া অবাক হল। ভাবল, "একি ! রাতারাতি সব ওলটপালট হয়ে গেল নাকি ? একেবারে বাড়িতে এসে কাজ করব কিনা বলছে। কি হল দেশের !"

"কি কাজ ?"

"দিনে দু'টাকা। মোট বইতে হবে না. ইট বইতে হবে না, কোন ভারী কাজ নয়, আগে টাকা পরে কাজ। এই নাও তোমার দু'টাকা।"

পুল্লাইয়া টাকা নিয়ে নীলির হাতে দিয়ে ওর সঙ্গে চলে গেল। মল্লুও বাপের সঙ্গে গেল। আধ মাইল হাঁটল। বিরাট এক কোঠাবাড়ির সামনে ওরা দাঁড়াল। সকলেরই চেহারা প্রায় তারই মত। অনেকেই নিজেদের মধ্যে ফিসফাস কথা বলছিল। পুল্লাইয়া বুঝল ভোটের ব্যাপার।

ওদের ডাক পড়ল বাড়ির ভেতরে। সবাই ভেতরে গেল। ওদের সামনে চেয়ারে একটা লোক বসল। বয়স পঞ্চাশ হবে। এক একটা হাতে চারটে করে আংটি।

মুখের রং শ্যামবর্ণ। পরণে পাতলা ধুতি। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। হাতে বাটির মত বড় একটা ঘড়ি।

"শোন, শোন, ভাল করে শোন।" ভেতরে যে পঞ্চাশজন লোক জমেছিল তারা কিছু একটা শোনার জন্য কান খাড়া করে সবাই দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি যা বলব তা যারা আজকে ঠিকমত করবে তারা কালকে তিন টাকা করে পাবে। বুঝতে পেরেছ ?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।"

ঐ লোকটা চেয়ার থেকে উঠে ভাষণ শুরু করে দিল। বেশ কিছুক্ষণ নানা কথা বলার পর একটু গলা ঝেড়ে বলল, "যারা লেখাপড়া জানে তাদের কাছে তোমরা বোঝাতে যেওনা···আমাদের দেশের লেখা পড়া জানা লোকের চেয়ে ধোপা নাপিত অনেক ভাল। শিক্ষিতদের জ্ঞান থাকে অর্ধেক। তাই বলছি তোমরা এই বিরাট শহরের গরীব আর লেখাপড়া না জানাদের বাড়িতে যাবে। ওদের দুঃখ কষ্ট তোমরা বোঝ। আমিও বুঝি। শুনতে পাচ্ছ ?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।" সবাই বলল।

"আমি এখানে তোমাদের সামনে যে ভাবে বলছি, সেই ভাবেই তোমরা বুঝিয়ে বলবে। আমি নাকি ইংরিজী জানি না ; যদি নাই জানি তেলুগু তো জানি। আমি তোমাদের সামনে যে ভাষায় কথা বলছি সেই ভাষাতেই এসেম্বলিতেও কথা বলব। ইংরিজী জানলেই যে সব হয়ে যাবে, আর না জানলে হবে না, এটা ঠিক নয়। আমার চারপাশে যারা আছে কই ওরা তো ইংরিজী জানে না। ওরা যেভাবে ধুতি জামা পরে আমিও সেই ভাবেই পরি। আমি কারোর চেয়ে কম কিসে ? কোন কিছুতেই কম নই। ঠিক বলছি কিনা ?" ঐ লোকটা জিজ্ঞেস করল।

পায়চারি করতে করতে সে বলল, "এই গভর্ণমেণ্টের চালচলন মোটেই ভাল নয়। দেখছো তো, চোলাই মদের দোকানগুলো কি অবস্থায় আছে। অনেক ভাল ভাল অফিসার চাঁদির জুতোর কাছে মাথা নোয়াচ্ছে। যে ঘুষ দিচ্ছে তাকে কর দিতে হচ্ছে না। আমি এসেম্বলিতে গিয়ে এই সব প্রশ্নগুলো তুলব। গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করব যাতে এইসব ভাটিগুলো জাতীয়করণ করে নেয়। গভর্ণমেণ্ট নিজে যদি পান্তাভাত দিয়ে মদ বানিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করে তাতে সবাই উপকৃত হবে। ঐ করে যে পয়সা উঠে আসবে সেই পয়সা খরচ করে শহরের আবর্জনা দূর করা যাবে। আমাদের শহর সুন্দরী হয়ে উঠবে। এই কথাগুলো বলার জন্য কি ইংরিজীর দরকার ? আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা ইংরিজী জানতো না। ওরা বিচারে বসলে যে রায় দিত সেই রায়ের খবর লণ্ডন পর্যন্ত চলে যেত। শুনে কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারতো না। আমি যা বলছি তোমরা সব ভালো করে শুনছো তো ? নাও এবার বল, জোরে চেঁচাও, চিৎকার করে চেঁচিয়ে বল, ভোট দেবেন কাকে ?" কেউ কোন কথা বলল না। বিরক্ত হয়ে

লোকটা বলল, "জোরে জোরে বল, 'বাঙ্গারাইয়াকে'। নাও এবার বল, ভোট দেবেন কাকে ?"

"বাঙ্গারাইয়াকে।" কয়েকটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল। পুল্লাইয়াও শেষের দিকে "রাইয়া" বলল। তার মনে হল লোকটার ভাষণের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। তারপর সে মজুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শীত বাড়ার তালে তালে ভোটের বাজারও গরম হতে লাগল। যেখানে সেখানে "ভোট দেবেন কাকে" ধ্বনি। সেখানকার একটি সীটে তিনজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র প্রার্থীর নাম বাঙ্গারাইয়া। পূর্বপুরুষ যত টাকা জমিয়েছিল বাঙ্গারাইয়া সেই টাকার অঙ্ক আরও বাড়িয়েছিল। যুদ্ধের সময় অনেক কিছুর কনট্রাক্ট নিয়ে দু'হাতে সে টাকা রোজগার করেছিল। সেদিন চোদ্দ হাজার টাকা ঢেলে একটি গাড়ি কিনেছে। সামনের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে নিজের নাম যশ ছড়িয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। দু'হাতে সে টাকা খরচ করছে। দিনরাত পরিশ্রম করছে। সে বলে বেড়াচ্ছে আমি দাঁড়িয়ে গেলে, দেশে মদ আর তাড়ির কোন অভাব রাখবো না। যেখানকার রোজগার সেখানেই খরচ করাব। আকাল হতে দেব না। যা বলছি তা আমি দাঁড়ানোর চার মাসের মধ্যে করে ফেলব। প্রতিটি অঞ্চলে সে লোক পাঠিয়ে প্রচার চালাচ্ছিল। তার ধারণা ভোটারের ইচ্ছায় ভোট পড়ে না। ভোটারকে ভোট দেওয়াতে হয়। ছলে, বলে, কৌশলে তার হাত থেকে ভোটটা নিতে হয়। প্রত্যেক পাড়ায় কয়েকজন নেতা থাকে। ওদের টানতে পারলেই ভোট পাওয়া যায়। আরও কিছু ঢাললে ওরাই তার প্রচার চালাবে। এসব ভেবে যেখানে যত প্রয়োজন সেখানে তত খরচ করে গেল। হিসেব করে সে বুঝে নিল বস্তির চারভাগের তিনভাগ ভোটার তাকেই ভোট দেবে।

অন্যদিকে বাঙ্গারাইয়ার সম্পর্কে অন্য দলের লোক নানা ধরণের প্রচার চালিয়ে গেল। মধ্যবিত্তদের কাছে বাঙ্গারাইয়া ছিল অবহেলার পাত্র। ওরা বলাবলি করল, "যার অত বড় বাড়ি আছে তাকে আর ভোট দিয়ে কি হবে ?" অন্যেরা বলল, "অত টাকা রেখে কি করবে, নির্বাচনের নামে কিছু খরচ হোক।" গাড়ি কিনে চালানোর সময় বাঙ্গারাইয়া ড্রাইভারের পেছনে বসেছিল। দু'একবার গ্যাব্ গ্যাব্ আওয়াজ হতেই চমকে উঠে সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কি হল ?" ড্রাইভার জবাবে বলল, "গিয়ার চেঞ্জ করছি।"

"এসব আগে করতে পারলে না ?" বলে সে ড্রাইভারকে খুব ধমক দিয়েছিল।

আর একবার বাঙ্গারাইয়া গাড়িতে করে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "কি হল ? হঠাৎ থেমে গেলে কেন ?"

"এজ্ঞে রাস্তার মাঝখানে মস্ত বড় পাথর আছে।"

"তা তুমি হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন ? হর্ণ দাও ! সরে যাবে।"

একবার এক বস্তিতে প্রচার করতে সে বেরিয়েছিল। অনেকে তাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে রেগে গিয়ে বলল, "আপনারা অত ভাবছেন কেন ? আমি যদি এসেম্বলিতে গুছিয়ে বলতে না পারি, আমার কথা গুছিয়ে বলার জন্য, উকিল রাখবো। উকিল নিশ্চয় গুছিয়ে কথা বলবে। পয়সা থাকলে সব হয়।"

এই ধরণের কথা অন্য দলের লোক প্রচার করছিল। তবে সে সব প্রচারে বাঙ্গারাইয়া ঘাবড়ে যায়নি। সে বুক ফুলিয়ে বলত, "শহরের প্রত্যেক গরীব মানুষ আমাকে ভোট দেবে। কে আমাকে আটকাবে দেখবো।"

সেদিন বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে প্রচার করে কর্মীরা ফিরে এল। বাঙ্গারাইয়া ওদের পেট ভরে খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, "খাও, খাও পেট ভরে খাও। আমি যে তোমাদের দুঃখ বুঝি এখন তার প্রমাণ পেলে তো ?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।"

খাওয়ার পর ওরা যে যার বাড়ি যেতে চাইলে বাঙ্গারাইয়া বলল, "তা কি করে হবে ? আজ রাত্রেই সব দলের বিরাট বিরাট মিছিল বেরোবে। ওরা যখন বেরোচ্ছে আমাদেরও বেরোতে হবে। ওরা যত জোরে শ্লোগান দেবে আমাদের তার চেয়ে জোরে শ্লোগান দিতে হবে। যখন যেমন তখন তেমন করতেই হবে। তোমরা সবাই খুব ভাল ভাবে কাজ করে এসো, প্রত্যেককে আমি দুটো করে টাকা দেব।"

তার কথায় প্রত্যেকে রাজী হল। অনেকদিন পরে পুল্লাইয়া পেট ভরে খেল। সে মনে মনে ভাবল, ইনি সত্যিই ভাল লোক। গরীবের দুঃখ বোঝেন। এই ধরণের লোককে গর্মেণ্ট করলে গরীবদের দুঃখ থাকবে না। ঐ যে দাদাটার পেছনে চারদিন ছুটেছিলাম, ব্যাটা একদিনও একবাটি ফ্যান খাওয়ায়নি। খালি পেটে ওর জন্য চেঁচিয়েছিলাম।

সে রাত্রে বাজনা আর পেট্রোম্যাক্স নিয়ে মিছিল বেরিয়েছিল। পথে মুখোমুখি পড়ে গেল অন্য দল। মাত্র কদিন আগে পুল্লাইয়া ঐ দলেরই এক দাদার সঙ্গে ঘুরেছিল। তার মনে হল ঐ দলের মিছিলের প্রত্যেকটা লোক তার দিকে তাকাচ্ছে। তাকে যে লোকটা দাদা বলে ডেকেছিল সেও ছিল ঐ মিছিলে। পাশের ঘরের পকেটমারটাও ছিল ঐ দলে। প্রথমে তার লজ্জা করল। পরে পুল্লাইয়া ভাবল, আগে পেটের চিন্তা। ওদের সঙ্গে তো ঘুরেছি চারদিন। কিছুইতো খাওয়ায়নি। ভেবে সে মন থেকে সঙ্কোচ ভাবটা ঝেড়ে ফেলল। কিছুদূর যাওয়ার পর আর একটা মিছিল ওদের মুখোমুখি হল। ঐ মিছিলের সামনে ছিল জোড়া বলদ। ভীষণ হৈচৈ চেঁচামেচির মধ্যে যে যার দলের শ্লোগান জোরে জোরে দিচ্ছিল। মানুষের চিৎকার মাঝে মাঝে লাউডস্পীকারের আওয়াজকে যেন ডুবিয়ে দিচ্ছিল। দেখতে দেখতে একটি দলের কিছু লোক অন্য দলের লোককে যা তা বলতে লাগল। ফলে মিছিলের কিছু লোক গরম হয়ে গেল। গরম

মিছিলকে ঠাণ্ডা করার লোকও ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কথা কাটাকাটি বন্ধ হয়ে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। তারপর রাস্তার ইটপাটকেলের উপর হাত পড়ল। অনেকগুলো হাত ইটপাটকেলের ছোঁড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটা পাথর পুল্লাইয়ার গায়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পুল্লাইয়ার পৌরুষ চাগা দিয়ে উঠল। সেও একটা পাথর হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়তে যাবে এমন সময় তার বউয়ের হাত যেন তার হাত ধরে ফেলল। নীলির মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ পাথরটাকে নিচে ফেলে দিল।

ইতিমধ্যে কে যেন "পুলিশ আসছে" বলে চিৎকার করে উঠল···শুনেই কিছু লোক পালিয়ে গেল। একদল একদিকে চলে গেল। অন্য দল গেল অন্য দিকে। বাঙ্গারাইয়ার দল শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

কোত্থেকে জুজুবুড়ো সেখানে এসে হাজির হল। কুকুরছানাটিকে কোলে নিয়ে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বসে পড়ল। তিনটি দলের দলাদলি দেখে সে কিছুক্ষণ হো হো করে হাসল। তারপর ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল, "দেখলে তো ভাই, এই পাগল ভাইগুলো নিজেদের মধ্যে কি ভাবে মারামারি, কামড়াকামড়ি করছে। কিসের জন্য না, প্রত্যেকেই নাকি, দেশের সেবা করতে চায়। একে অন্যকে সম্মান দিচ্ছে না। যারা এভাবে ঝগড়া করে তাদের মধ্যে মানবতা কোথায়? দেশে মানুষ কোথায়? নেই। দেশে সব আছে, মানুষ নেই।

জুজুবুড়ো দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার শুরু করল, "ও আমাকে জিজ্ঞেস করছ? আমার কেন এই অবস্থা জানতে চাইছ? অন্যের খারাপ কাজের মধ্যে আমি ভাল কিছু খুঁজে পাইনি। প্রেম আমার কাছে নিছক খেলা নয়। সব সময় আমার মধ্যে একটা অহঙ্কার ছিল। জগতে দুঃখ কষ্ট এত বাড়ছে কেন জানো? মানুষ তর্কে ডুবে গেছে। মায়ায় জাল বিস্তার করে চলেছে যে। এই জাল সরাতে পারলেই রাম রাজ্য হয়ে যেত। এই জাল থাকাতেই মানুষের আশা বেড়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার যেমন লাগাম থাকে এই আশারও একটা লাগাম থাকা চাই। যার হাতে রক্ষার ভার সেই যদি ভক্ষক হয় তাহলে দেশ চলবে কি করে? সারথি হতে হলে ঠিক পথে চলতে জানা চাই। শুধু চললেই হবে না, ঘটে কিছু থাকা চাই। দু একজন বেঠিক হওয়ার ফলে অনেককেই কষ্ট পেতে হয়। আগেকার দিনে রাজা আর মন্ত্রী বসে পরামর্শ করে কিভাবে প্রজাদের সুখ শান্তি বাড়ানো যায় ভাবতো। এখন কেউ তা ভাবে না। আর ভাবে না বলেই যার মনে যত আশা আছে সে সেই আশা নিয়ে ছোটে। দেখ বাছা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব বিশ্বাসী। আমার পরিবারে কেউ বিশ্বাসঘাতক নয়। আর সেই ভরসাতেই আমি তোমাকে এত কথা বললাম। আমার কথা বুঝতে পারছ তো?"

কুকুরছানাটি কুঁ কুঁ করে উঠল। তার সেই শব্দ শুনে জুজুবুড়ো হাসল। ঠিক সেই

সময় শোনা গেল কান্না। কুকুরছানাটির কান খাড়া হয়ে গেল। জুজুবুড়োর ভয় কুকুরছানাটিকে সেখানে রেখে গেলে কেউ তুলে নিয়ে যাবে। তাই সে সেটিকে কোলে নিয়ে যেদিক থেকে কান্না আসছিল সেদিকে চলে গেল। দেখতে পেল একটি মানুষের মৃতদেহ। তার বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদছে দুটি বাচ্চা। পাশে বসে তার বউও কাঁদছিল। ওদের কান্না শুনে, ওদের অবস্থা দেখে প্রতিবেশীরাও কাঁদছিল।

জুজুবুড়ো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তা দেখল। নুয়ে শবের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "ছোটভাই, মরে গেছ?" সেখানে যারা জড়ো হয়েছিল তারা জুজুবুড়োর দিকে তাকাল। মুখ ভর্তি দাড়ি, ফকিরের মত তার মাথায় চুল। তার সেই ফর্সা মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকেই তার কথা ভাবতে লাগল। জুজুবুড়ো শবের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমরা সব কাঁদছ কেন? কান্নার কিচ্ছু নেই। এই দেখ…" বলে একটা ত্রিভুজাকার পাথর তুলে নিয়ে পথের উপর ঘষল। ঘষতেই স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল সে ঐ পাথরটা দেখিয়ে বলল, "এটা হল মন। আর এই পথটা হল আত্মা। এই দুটোর মিলন না হলে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হয় না। মন আর আত্মাকে মেলাতে পারেনি বলেই বেচারা মরে গেছে। যতদিন না মিলছে ততদিন মরবে আর জন্মাবে।" তারপর সে কিছুক্ষণ সেখানে পায়চারি করতে লাগল। সবাই জুজুবুড়ো আবার কি বলবে, কি দেখাবে তা শোনা ও দেখার জন্য হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সে আর কোন কথা না বলে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

তেত্রিশ

ভোটের ঝামেলা চুকে গেছে। পুল্লাইয়ারও কিছুদিনের সুখের সমাপ্তি ঘটেছে। বাঙ্গারাইয়া হেরে গেল। তবু পুল্লাইয়া দু বেলা তার দরজার সামনে দাঁড়াত। তার ধারণা, "আমার মত লোককে কি আর সাহায্য করবে না।" কিন্তু বাঙ্গারাইয়ার ধারণা তার কাছে যারা পয়সা নিয়েছে তারাই ধোকা দিয়েছে।" নির্বাচনের পরে বাঙ্গারাইয়া পুল্লাইয়াকে চিনতেই পারল না। সে যে একটা মানুষ তাও যেন সে স্বীকার করতে চায় না। তার এই ধরণের ব্যবহার পেয়ে পুল্লাইয়া ভাবল, "সবই আমার ভাগ্য।"

কদিন বাঙ্গারাইয়ার জন্য ঘোরাঘুরি করে পুল্লাইয়া যা পেল তাতে তার ধার শোধ হল। সুদও সে কড়ায় গণ্ডায় মেটাতে পেরেছিল। তারপর যা বেঁচেছিল তাতে তাদের দু বেলা খাওয়া আর বাচ্চাদের ইজের প্যাণ্ট জামা কিনতেই খরচ হয়ে গেল। মল্লুর দুটো করে জামা কেনা হল। ঐ কাজটা আরও কিছুদিন থাকলে নীলির ইচ্ছা ছিল একটা চরকা কেনার। ঐ চরকা কেটে পয়সা জমিয়ে একটা মোষ কিনতে পারলে, জল না মিশিয়ে দুধ বিক্রি করে যে পয়সা পাওয়া যাবে তাতে কোন রকমে বেঁচে থাকা

যাবে। মনে মনে নীলি এই ধরণের হিসেব নিকেশ করেছিল। কিন্তু নির্বাচন যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি।

পুল্লাইয়ার আবার মোট বইতে ঝুড়ি নিয়ে বেরোতে লজ্জা করছিল। গত কয়েক দিনে সে পেট ভরে খেতে পেয়েছিল। তার শরীরটা একটু ফিরেছিল। তার মনে হল আমার মত লোকের এই মোট বওয়ার কাজ পোষায় না। দুদিন সারা শহরে চাকরির সন্ধান করতে করতে ঘুরল। এক বেলা স্টেশনে গিয়ে মোট বয়ে আট আনা পয়সা পেল। ব্যস ঐটুকু। আবার তার অবস্থা আগের মত হয়ে আসছিল। মাঝে কদিন দুশ্চিন্তার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু এখন আবার তার মনে দুমুঠো খাওয়ার চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ঝুড়ি নিয়ে বাজারে গেল। "আবার এসেছে রে" বলে ছেলে বুড়ো তার পেছনে লাগল। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা তার কাছা ধরে টানতে লাগল। কয়েকটি ছেলে পুল্লাইয়ার দিকে তর্জনী দেখিয়ে "পাগল এসেছে, পাগল এসেছে" বলে চেঁচাতে লাগল। এসব পুল্লাইয়ার কাছে অসহ্য লাগল।

আবার না খেতে পাওয়ার দিন এল। বাচ্চারা খিদের জ্বালায় ছটফট করতে লাগল। একদিন পুল্লাইয়া বাইরে শুয়েছিল। চারদিকে নিস্তব্ধ ভাব। মল্লু খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়েছিল পাশে। রেলগাড়ি সশব্দে চলে গেল। একবার পুল্লাইয়ার সমস্ত শরীরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। তার মনে হল এই ভাবেই তাকে না খেতে পেয়ে মরতে হবে। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "আমার অবস্থা এমন একটা জায়গায় পৌছে গেছে! আমার বাবা কি রকম তেজী পুরুষ ছিল। চারজনের মাথা হয়েছিল। একটা রাজার মত ঘোরাঘুরি করত। তার মরে যাওয়ার পর কত লোক ছুটে এসেছিল, কেঁদেছিল। আমার কপালে কত ভাল বউ জুটেছে। কিন্তু সে বেচারি দুবেলা আমাকে ফ্যানও খেতে দিতে পারছে না। এই সংসারে আগে পেট না আগে ধর্ম। একটা কাজ করলে তো হয়, জুজুবুড়োর বাড়ি খোঁজ করে…ঐ নারকেল গাছের নিচে মাটি খুঁড়ে যত সোনা আছে নিয়ে নিলেই তো হয়।" বলতে বলতে সে সামনের গাছের দিকে তাকাল। সেই যে সেই দিন জুজুবুড়ো ঐ গাছের নিচে কুকুরছানাটিকে ফিরে পেয়ে নিয়ে গেল আর সে সেখানে আসেনি। গাছের ডাল হাওয়ায় নড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ এই ধরণের কথা ভাবতে ভাবতে পুল্লাইয়া ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাত্রে তার শীত করলে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই রাত্রে পুল্লাইয়া স্বপ্ন দেখল গুড্ডি ভেঙ্কান্না মারা গেছে। স্বপ্নের মধ্যেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে পড়ে গেল গ্রামের কথা। ভজন মন্দিরের কাছে ভেঙ্কান্না যে কথাগুলো বলেছিল সেই কথা তার মনে পড়ল। পড়তেই তার চোখে জল এল। তার ইচ্ছে করল সকালেই দেশের গ্রামে ফিরে যাওয়ার।

সকাল হল। সারা সকাল ঘোরাঘুরি করে কোথাও কাজ পেল না। জুজুবুড়োকে একটা তিনতলা বাড়ির সামনে, পোড়ো বাড়ির বারান্দায় দেখতে পেল। ঐ তিনতলা বাড়ির পেছনের দিকে নারকেল গাছ আছে কি না ঘুরে দেখল সে। ছিল না। তারপর আরও অনেকক্ষণ সে ঘোরাঘুরি করল। লক্ষ্য করল বহু বাড়ির পেছনে নারকেল গাছ আছে। ঘুরতে ঘুরতে তার মনে অনেক রকমের সন্দেহ জাগল। তার মনে হল জুজুবুড়োর দেশ সেখানে নয়। অন্য কোনখানে। দুপুরে পুল্লাইয়া ঘরে ফিরল। নীলি একবাটি ফ্যান দিল। বউয়ের অবস্থা দেখে তার মনে হল সে সেই বেলাতেই যে কোন মুহূর্তে মরে যাবে। তবু পেটে ফ্যান পড়ার পর তার একটু ভাল লাগল।

পা টনটন করছিল পুল্লাইয়ার। দুপুরে শুয়ে সন্ধ্যের সময় উঠল সে। রাত্রে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরোল সে। শহরের পথে পথে মানুষের ভিড়। বিভিন্ন দোকানে কেনাকাটা চলছিল। ওসব দেখলে তার চোখে ধাঁধা লাগে। ইচ্ছে করল মল্লুর জন্যে একটা রবারের বল কিনতে। ঐ তো রাস্তার উপরেই বল খেলছে। তার খেলা দেখে মল্লু বলল, "বাবা দেখ, দেখ কি রকম বল খেলছে দেখ।" আর একটি মেয়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল।···মল্লুর বোধ হয় ভাল লেগেছিল অথবা সেটা তার চাই তাই সে বাবাকে দেখিয়ে বলল, "বাবা দেখেছ, ঐ মেয়েটার হাতে দেখ রবারের কুকুর!"

"দেখ বাবা, তুই ভাল ঘরেই জন্মেছিস। কিন্তু কি করবি বল, ওসব তোর ভাগ্যে এখন নেই।" কিছুদূর যাওয়ার পর সে দেখল রাস্তার পাশে বসে একটা জ্যোতিষী একটা লোকের হাত দেখছে। তার ইচ্ছে করল হাত দেখাতে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, "আমার দিন কবে ফিরবে? আমার সৌভাগ্যের দিন কবে শুরু হবে?" পকেটে পয়সা না থাকলেও সে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করল, "হাত দেখতে কত পয়সা নেন?"

"মোদাকোণ্ডাম্মার নাম করে যা দেবে তাই নেব বাবা!" বলল ঐ পাহাড়ী লোকটা। পকেটে কানাকড়িও না থাকায় পুল্লাইয়া বিরক্ত হয়ে পা বাড়াল। তার পা টনটন করছিল। একটা খালের পাড়ে উঁচু জায়গায় পা রেখে বসল। পেটে খিদের চোটে আগুন জ্বলছিল। তারই যখন এই অবস্থা না জানি ছেলের অবস্থা কি! উঠে দাঁড়ানোর শক্তি তার ছিল না। এই ভাবে সেখানে অনেকক্ষণ বসে রইল। খিদেটা যেন বাঘের মত তাকে গিলে খাচ্ছিল। দেখতে দেখতে রাস্তায় লোকের আনাগোনা কমে গেল। আশেপাশের দোকান পাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে হাওয়া বইছিল। সেই হাওয়ায় রাস্তার ধুলো এক পাশ থেকে অন্য পাশে উড়ে যাচ্ছিল···মল্লু বাপের জানুতে মাথা রেখে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। তার মুখে আর কোন প্রশ্ন শোনা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে সে ছেলের গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। ছেলের প্রতি মায়া মমতা তার ভীষণ ভাবে জাগছিল। ভাবতে ভাবতে পুল্লাইয়ার শিরা উপশিরাগুলো উঠছিল ফুলে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল মল্লুর জন্মদিনের দৃশ্য। সে আপন মনে বলে গেল, "আমার গ্রামে এ রকম ছেলে আর জন্মায়নি। অত বড় পরিবারের ছেলে আমি, আর

আজ আমাকে কিনা খিদের জ্বালায় ছটফট করতে হচ্ছে। আমার ছেলে খিদের জ্বালায় কোন প্রশ্ন করতে পারছে না।" খিদের কথা যত ভাবে তত তার খিদে বাড়ে। সামনের রুটির দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করল দোকান থেকে একটা রুটি তুলে আনার। পরক্ষণেই তার মনে প্রশ্ন জাগল, "রুটি চুরি করব! রুটি চুরি করে আবার পুলিশের খপ্পরে পড়ব···"

ঘরে ফেরার প্রয়োজন মনে করল না সে···কিন্তু শিশির পড়ছে। সে আর ছেলে ঐ ঠাণ্ডায় বসে থেকেই বা কি হবে! রাত্রে যদি কেউ হঠাৎ চোর চোর বলে চেঁচায়! তাছাড়া নীলি, ওরা ফিরছে না বলে হয়তো ইতিমধ্যেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

শেষে সে উঠে পড়ল। মল্লুও এক পা এক পা করে হাঁটতে লাগল। রাস্তার দূরত্ব কমানোর জন্য ওরা আঁকাবাঁকা গলি পথে হেঁটে গেল। সে সব পথে লোকজন ছিল না। শুধু ওরা দুজনে হেঁটে যাচ্ছিল। মিউনিসিপ্যাল আলোর থামের নিচে কাপড় বিছিয়ে একটি অন্ধ মেয়ে ভিক্ষে করছিল। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল, পরনে তার ছেঁড়া শাড়ি। ছেঁড়া শাড়ির ভেতর দিয়ে তার শরীরের হাড় পাঁজরাগুলো দেখা যাচ্ছিল। সেই অন্ধকার পথের পাশে বসে, লোকজনের যাতায়াত না থাকলেও "মা, মাগো···বাবা আমি অন্ধ। আমার কাজ করার কোন ক্ষমতা নেই। গত জন্মে না জানি কত পাপ করেছি। এ জন্মে এত কষ্ট পাচ্ছি বাবা! তোমরাই আমার মা-বাবা··· এই অন্ধের হাতে দয়া করে কিছু দিয়ে যাও বাবা।"

পুল্লাইয়া তার দিকে তাকিয়ে ভাবল, "বেচারা কত পাপ করেছে কে জানে।" ওদের মনেও বাঁচার আশা দেখে সে অবাক হল। আর সে হাঁটতে পারছিল না। কাছেই বসে পড়ল। তখনও সেই অন্ধ মেয়েটি নানা কথা বলে যাচ্ছিল। ডান হাত দিয়ে মাঝে মধ্যে শাড়িটা ঠিক করে নিচ্ছিল। আঁচল হাতড়ে হাতড়ে দেখছিল। আঁচলের কোণে মনে হল এক আনা বাঁধা আছে। পুল্লাইয়ার মনে হল সে সত্যি অন্ধ। নিছক ভিক্ষে করার জন্য সে অন্ধ হয়নি। অদূরেই সিনেমা হল ছিল। বই শেষ হওয়ার পর বহু লোক এই পথ ধরে যাবে। এতক্ষণে পুল্লাইয়া বুঝল অন্ধ মেয়েটা কেন ঐ রকম একটা নির্জন জায়গায় বসে আছে। সে যতক্ষণ বসেছিল ততক্ষণের মধ্যে মাত্র দুটি লোক সেই পথে গেল।

মল্লু আর সে চুপচাপ বসেছিল। অন্ধ মেয়েটা কিছুক্ষণ ঐ কথাগুলো বলে থেমে যাচ্ছিল। বসে বসে পুল্লাইয়ার অনেক কথাই মনে পড়ছিল। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগছিল, "ঐ আঁচলে এক আনা না এক টাকা?" অন্ধের গলা আবার শোনা গেল। ওর কথা যত কানে গেল তত পুল্লাইয়ার মনে দুঃখ আর পেটে খিদে বাড়তে লাগল।

"আচ্ছা ঐ আঁচলের পয়সা নিয়ে নিলে কেমন হয়? যেদিন আমার হবে সেদিন সুদ সহ পয়সাগুলো ফেরৎ দিতে পারব।" পরক্ষণেই তার মনে হল, "ছি, ছেলের সামনে চুরি করব? এর আগেই একবার ছেলের সামনে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছি। আমি

যদি চোর হই আমার ছেলেও কি চোর হবে না ?"

কয়েকটি কণ্ঠস্বরের আওয়াজ কানে যেতেই তার চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেল। ওরা খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করতে করতে সেদিকে আসছিল। ওদের গলা যত পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল পুল্লাইয়ার মনে অতীতের দৃশ্য তত পরিষ্কার ভেসে উঠছিল। তাদের গ্রামেও ঐ ধরণের গান বাজনার দল ছিল। ওরা মাঝে মধ্যে দল বেঁধে এই ভাবেই গান গাইতে গাইতে ঘোরাঘুরি করত। ওরা যে ভাবে নেচে নেচে গাইছে তার চেয়েও ভালভাবে নেচে গাইতে পারত সে আর তার ছেলে। কিন্তু সব মাটি করে দিচ্ছে এই খিদে।

গান বাজনার এত আওয়াজ সত্ত্বেও মল্লু একটুও নড়ল না। এতেই পুল্লাইয়া বুঝতে পারল তার ছেলের পেটে কত খিদে। ভাবতে ভাবতে পুল্লাইয়ার শরীর মন আরও নিস্তেজ হয়ে গেল।

"এই তো সেই চলন্ত মিষ্টির ভাণ্ডার। লাড্ডু বিক্রি হচ্ছে ঠেলাগাড়িতে। ঠেলাগাড়ি অত বড় নয়। গাড়িটা ছোট। তবে ঠেলতে হয়। প্রথম যেদিন শহরে এসেছিলাম সেদিন এই গাড়িটাকে দেখেছি। এত রাত্রেও লোকটা হেঁটে চলেছে। কি সুন্দর কায়দায় সে হাঁকছে। ওর কথাগুলোও কত মিষ্টি!" পুল্লাইয়া হয়ত নিজেকেই বলছিল।

মল্লু চলন্ত মিষ্টি ভাণ্ডারের ঘণ্টার আওয়াজ শুনে মাথা তুলে বলল, "বাবা, বাবা, মিষ্টির গাড়ি।"

গাড়ি ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। পুল্লাইয়ার মন দুঃখে ভার হয়ে গেল। সে ভাবল, "আমার ছেলের পেটে ভাত নেই। ফ্যানও নেই। আমার পেটেও নেই। আমার ছেলে মরে গেলে ধর্ম আমাকে বাঁচাবে···বাবা, ওঠ। যা, ছুটে গিয়ে ওকে থামতে বল। আমি যাচ্ছি কিনব।" বলে মল্লুকে পাঠিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আঁচলের গিট খুলে দেখে একটা আনি। হাতে মাত্র একটি আনা! সে ছুটে গিয়ে এক আনার পকোড়া কিনল। মল্লু একটু আধটু করে খেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পকোড়ার ঠোঙা খালি হয়ে গেল। পুল্লাইয়া দেখল ছেলের মুখ একটু খুলেছে। সে আগের মতই হাসছে। ছেলেকে জড়িয়ে আদর করার সময় সেই দরিদ্র অন্ধ মেয়েটির গলা সে শুনতে পেল। কিছুক্ষণ পরে তার গা গুলোতে লাগল। আর ঐ অন্ধ মেয়ের গলা শুনতে ভাল লাগল না। সে মনে মনে বলল, "ছি, ছি, এ আমি কি করলাম! একটা অন্ধ ভিখিরীর পয়সা চুরি করলাম! আমার মধ্যে যে ন্যায় ধর্ম ছিল তা কি মরে গেছে? কিন্তু আমি তো চুরি করতে চাইনি। চাইনি যখন তখন করলাম কি করে। তাহলে আমি কি চোর হয়ে গেলাম! আমি চোর? তার চোখে জল ঘুরতে লাগল। পেট গুলোচ্ছিল। তর্জনী মুখে ঢুকিয়ে সেই নির্জন জায়গায় পুল্লাইয়া সশব্দে বমি করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মল্লুও বাপকে অনুসরণ করল।

"বাবা, বাবা, ভাল লাগছে না।" বলতে বলতে মল্লু বমি করতে লাগল। কিছুক্ষণ

আগে যে ছেলে অত ভাল ভাল পকোড়াগুলো খেল আর এখন সে এভাবে বমি করছে। পুল্লাইয়ার মন দুঃখে আরও ভার হয়ে গেল। ছেলেকে কোলে তোলার শক্তি না থাকলেও তুলে নিল। ছেলে কোলে উঠে দেখতে পেল বাপের গেঞ্জী আরও ছিঁড়ে গেছে। "বাবা, অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে···" বলতে বলতে মল্লু কোল থেকে নেমে গেল। নেমে বাপের সঙ্গে গুটি গুটি পা-পা যেতে লাগল।

"বাবা, গেঞ্জী ছিঁড়ে গেছে···ভাল গেঞ্জী পরো।"

"এখন নয়।"

"বাবা, আমি বড় হলে তোমাকে অনেক কিছু দেব।"

তার এই কথাগুলো শুনে একদিকে যেমন আনন্দ হল অন্যদিকে তেমনি পুল্লাইয়ার দুঃখ হওয়ায় সে বলল, "তা তো দিবি বাবা কিন্তু এই অবস্থায় বড় হবি কি করে ?"

মল্লু খুশী খুশী ভাব দেখিয়ে বলল, "হব, হব। দু হাতে হাম্ হাম্ করে ভাত খেয়ে যাব।" বাপের চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

চৌত্রিশ

পরের দিন সকালে ঝুড়ি নিয়ে পুল্লাইয়া বাজারে গেল। সেখানে তার অবস্থা আরও চরমে পৌছাল। ছেলেদের ঠাট্টা, বুড়োদের গালাগাল সে সহ্য করতে পারছিল না। শেষে সে কাকুতি মিনতি করে ওদের বলল, "শুধু আজকের দিনটা কাজ করতে দাও। আর কোনদিন আসব না।" সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে তার রোজগার হল মাত্র চার আনা। এই চার আনা দিয়ে চারটে পেটে কি পড়বে। মনে হল কি যেন দু মুঠো পেটে পড়ল।

তার পেটে যাই পড়ুক সে যা বলেছে তা তাকে করতে হবে। বাজারে আর যাওয়া মানায় না। সন্ধ্যার সময় সে দেখল পথে মানুষের ভিড় অনেক বেড়ে গেছে। যা সে ভেবেছিল তাই। জ্যোতিষীকে সেখানেই দেখতে পেল। সবিনয়ে তার সামনে সে বসল। মল্লু বসল তার পাশে। জ্যোতিষী তার দিকে তাকিয়ে বলল, "পোশাকে কাপড়ে তো কিছু থাকে না বাবা ! আসল জিনিস হল মন। তবে মনে হচ্ছে ছেলে তোমার পাশে দাঁড়াবে···তোমার নাম রাখবে। তোমার মুখ উজ্জল করবে।"

এই কথাগুলো শুনে পুল্লাইয়ার খুব আনন্দ হল। জ্যোতিষীর প্রতিটি কথা সে বিশ্বাস করল। কিছুক্ষণ পরে পুল্লাইয়ার হাত টেনে নিয়ে দেখতে দেখতে জ্যোতিষী বলে গেল, "বাবা, তোমার ঘাড়ে যা চেপেছিল তা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। তোমার মনের অবস্থা এখন ঠিক যেন পদ্ম পাতায় জল। শনির দাপট এখনও রয়েছে। তুমি চাইছ চারজনে বেঁচে থাক। বাঁচবে। যাদের বাঁচাতে চাইছ তারা বাঁচবে। চারদিক

থেকে তোমার পয়সা আসবে। ভবিষ্যতে তোমার সুখের দিন আসছে। কষ্টের দিন শেষ হবে। দুঃখও আর বেশিদিন নেই। সবই হল গ্রহ। গ্রহকে খুশী করতে পারলেই ভাগ্যের চাকা আপনি থেকেই অন্যদিকে ঘুরবে। পুরুষ যেন একটা হাঁচি। আর নারী যেন একটা ফুল। মোদাকোওাম্মার নামে পূজো দিতে হবে। ঐ মা-ই পারবে শনিকে দূরে সরাতে। ওই মায়ের হাতেই রয়েছে সুদিন আনার দায়িত্ব। নাও মাথাটা এগিয়ে দাও। এই মায়ের কুমকুমের টিপ তোমার কপালে লাগিয়ে দি।" বলে সে ঐ টিপ লাগিয়ে দিল পুল্লাইয়া ও মল্লুর কপালে। উৎসাহিত হয়ে পুল্লাইয়া ছেলের সম্পর্কে আরও অনেক প্রশ্ন করল। তার হাত দেখে বলতে বলল। জ্যোতিষী হেসে বলল, "ওরে পাগল, তোমার ছেলের মুখটা পরিষ্কার আয়নার মত। কি বলব বাবা, তোমার ছেলে হাঁটবে বাঘের আগে। বাঘ তোমার ছেলেকে ভয় পেয়ে পেছনে পেছনে যাবে। তোমার ছেলের মুখ দিয়ে অন্যায় কথা বেরোবে না। শ'য়ে একটা নয়, লাখেও নয়, কোটিতে একটা ছেলের ভাগ্য এ রকম হয়। তোমার ছেলে হল কোটি ছেলের ভেতর একটি।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে পুল্লাইয়ার মন আনন্দে ভরে গেল। আর কোন প্রশ্ন সে করল না। ওর হাতে দু আনা পয়সা দিয়ে চলে গেল। তখনই পথের আলো জ্বলে উঠল। সে যেন নতুন উৎসাহ পেল। হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে সে ছেলের মুখের দিকে তাকে লাগল। যত তাকায় তত তার মনে আনন্দ বাড়ে। ছেলের জন্মদিনে যা ঘটেছিল তা তার মনে পড়ে।

আমার আয়ু আছে আশি বছর। শনি আর কদিন আমার মাথায় চেপে থাকবে··· ছেলেকে আমি পড়াব। শহরে যখন একবার ঢুকেছি যে কোন ভাবে, প্রয়োজন হলে কারও হাতে পায়ে ধরে, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবো। আমার ছেলে অনেক দূর পড়বে। ন্যায় পথে চলে সে একদিন রাজার আসনে বসবে। এ রকম ছেলে কোটিতে নাকি একটি হয়। একি যে সে কথা। আমার ছেলে যে উঠতে উঠতে কোথায় পৌঁছাবে তা কেউ বলতে পারে। ভাবতে ভাবতে সে পীর্লাকোনের রাস্তায় পৌঁছাল। এই সব চিন্তা ভাবনাগুলো তার পেটের খিদের কথা ভুলিয়ে দিল।

সেদিনও ঐ অন্ধ ভিখারিণী একই জায়গায় বসে ভিক্ষে করছিল। আগের দিনের রাত্রের কথা ভাবতে তার নিজের কাছেই খারাপ লাগছিল। আগের দিন সারারাত তার ঘুম হল না। এখন সে এক আনার সঙ্গে আর এক আনা জুড়ে একটি দু আনি তাকে ভিক্ষে দিল। হাতড়ে হাতড়ে সে দু আনিটা হাতে তুলে নিয়ে মুখ উজ্জ্বল করে জোরে জোরে আশীর্বাদ করল। পুল্লাইয়ার কাছে তার আশীর্বাদ অভিশাপের মত লাগছিল। তার ইচ্ছা করল আগের দিন রাত্রে যা করেছে তা বলে ফেলতে। কিন্তু তা না বলে সে বলল, "অত আশীর্বাদ করো না মা! আমি তোমার ঋণ শোধ করব!"

সেই অন্ধ ভিখারিণী হেসে বলল, "কি যে বলছ বাবা, ভাল লোক এই ধরণের কথাই বলে। আমি কি তোমার কাছে পয়সা জমা রেখেছি বাবা? তোমাদের রোজগারের টাকা থেকে দু'চার পয়সা আমাদের ঝুড়িতে পড়লে আমরা কোন রকমে বাঁচতে পারি। তাতে তোমাদেরও পুণ্য হয়।"

পুল্লাইয়া হঠাৎ বলল, "পুণ্য? পাপ?"

"কি বলছ বাবা? এক সময় আমিও অনেক বড়লোকের বাড়িতে জন্মেছিলাম। না জানি কোন জন্মে পাপ করেছিলাম তাই আজ আমার এ অবস্থা। যাদের ভাত জোটে না তাদের আয়ু বাড়ে বাবা! একদিন না একদিন সবাইকেই সেখানে যেতে হয়। কিন্তু যতদিন না সেদিন আসছে পেট তো চালাতে হবে। যে দেয় সে যে নেয় তার চেয়ে অনেক বড় বাবা। যে দেয় তার পুণ্য হবে না তো কার হবে।" অন্ধ ভিখারিণী বলল।

কিছুক্ষণ পুল্লাইয়া তার দিকে তাকিয়ে দেখল। আগের দিন তার দিকে তাকাতে তার অসহ্য লাগছিল। তার মনে হয়েছিল অমন হীন জীবন যাপন করার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কিন্তু সেদিন মনে হল এই ধরণের মায়েরা যুগ যুগ বেঁচে থাকুক। জ্যোতিষী ঠিক বলেছিল, পোশাক কাপড়ে কিছু নেই, আসল জিনিস হল মন। যত আবর্জনার মধ্যেই থাকুক না কেন কই আমার নীলির মন তো ছোট হয়ে যায় নি। একে একে বড় হৃদয়ের বহু লোকের কথা পুল্লাইয়ার মনে পড়ল। দারিদ্র্যের মধ্যেও নীলির দিদিমা কত সুখে মারা গেল। রাজু বুড়ির মৃত্যুর পর কত উৎসাহে তার কাজের ভার নিল। জগৎ সংসারে মাত্র দুটি জিনিসই আছে। ভালোর মৃত্যু নেই। সে অমর। খারাপের মৃত্যু আছে। সে মরে আবার বেঁচে ওঠে। প্রতিদিন মরে প্রতিদিন বেঁচে ওঠে!

ঐ ভিখারিণীর পাশে বসে পুল্লাইয়ার আরও কত কথা মনে পড়ল। ঘরে ফিরে গিয়ে জ্যোতিষী যা বলেছিল তা সে বউকে বললে বউ বলল, "ঐ পয়সাগুলো থাকলে এই বেলা কোন রকমে চলে যেত।" নীলির কথা শুনে তার ভীষণ রাগ হল। সে বলল, "ছেলের ভবিষ্যৎ দেখব না। ওর সুখ দুঃখের কথা ভাববো না?"

পরের দিন পুল্লাইয়া বাজারে গেল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, "আর আমি বাজারে যাবো না।" তারপর থেকে এক একটা দিন এক পয়সাও রোজগার হত না।" নীলির শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেল। তার দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়ার মনে হল যে কোন মুহূর্তে সে বিছানা ধরবে। ঐ তল্লাটে যারা নীলির কথায় ধার দিয়েছিল তারা বার বার তাগাদা দিতে লাগল। ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িওয়ালী যখন তখন চেঁচামেচি করে লাফালাফি করে। ভাড়া না দিলে জিনিসপত্র রেখে ভাড়াটেদের তাড়িয়ে দেওয়া তার অভ্যেস। নীলি চেষ্টা করল কারও বাড়িতে ঝিগিরি করার। তার প্রস্তাব শুনে, "কী লোকের এঁটো হাঁড়ি বাসন মাজবে? মরে গেলেও অমন কাজ করতে যাবে না।" বলে

দিল পুল্লাইয়া। দিনকে দিন সে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এদিকে পুল্লাইয়া ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে গেল কিন্তু কোথাও কাজ পেল না। কি যে করবে তা ভেবে না পেয়ে তার জীবনের প্রতি বিরক্তি জাগছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় পেটে প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও ছেলেকে নিয়ে বিভিন্ন দোকানে চাকরির সন্ধানে ঘুরল। একটা দোকানদার তাকে বলল, "তোমাকে চিনি না জানি না আমার দোকানে নেব কি করে? এই পরশুদিন একজনকে রেখেছিলাম, কালকে সে হাতে কাঁচা পয়সা যত পেল নিয়ে পালিয়ে গেল।" পুল্লাইয়া অনেক করে বলল, কিন্তু তাদের মন থেকে অবিশ্বাস সরাতে পারল না। ঘুরতে ঘুরতে খিদের জ্বালায় টলতে টলতে বাপ আর ছেলে বৌভারা রোড দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ 'দাদা' শব্দটি শুনে পুল্লাইয়া থমকে দাঁড়াল। এর আগেও শব্দটি সে শুনেছিল। মুখ ঘুরিয়ে সে ঐ আন্নাকে দেখে লজ্জা পেল। ভোটের বাজারে ঐ আন্না তাকে নিয়ে কয়েকদিন ঘুরেছিল। কিন্তু সেই ভোট হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকতে পারেনি। চলে গেল বাঙ্গারাইয়ার কাছে টাকা পাওয়ার আশায়।

যথারীতি সেই আন্না কাঁধে হাত দিয়ে পুল্লাইয়াকে বলল, "এই যে দাদা, অনেক দিন পরে দেখা হল। তা কেমন আছ বল। ঐ বাঙ্গারাইয়া তোমাকে চাকরি দিয়েছে?"

"না রে আন্না। তার যখন প্রয়োজন ছিল তখন সে আমাদের ভালবেসেছিল। কাজ ফুরিয়ে গেলে আর কে কাকে পোঁছে বল! ওকে দোষ দিয়ে কি লাভ! সবই আমার ভাগ্য। আমার ঘাড়ে চেপেছে শনি। আমাকে কে কি করতে পারে বল। সেদিন তোমার কথা মত চলিনি ···"

"দেখ দাদা, আমিও কষ্টের মধ্যে আছি। আমি বুঝি কেন সেদিন তুমি আমার কথামত চলনি। তুমি গেছ বেশ করেছ। তুমি তো সেখানে চাকরি করতে গেছ। এসো চা খাই।" আন্না বলল।

পুল্লাইয়া না বলতে পারল না। রাস্তার পাশেই ছিল একটা চায়ের দোকান। দোকানের বেঞ্চি থেকে শুরু করে দেয়াল পর্যন্ত সবই নোংরা। এক কোণের একটি টেবিলের উপরে এ্যালুমিনিয়ামের থালায় নানা ধরণের খাবার ছিল। দোকানের মালিকের ভুঁড়িটা দেখার মত। সামনেই সে বসেছিল। তার সামনে আর একটা টেবিল। টেবিলের উপর একটি গ্রামোফোনও বসানো ছিল। আর ছিল কয়েকটি হিন্দী গানের রেকর্ড।

আন্না পুল্লাইয়া ও মল্লুকে বণ্ডা (আলুর চপ) ও পরোটা খাইয়ে চারটে বণ্ডা ঠোঙায় পুরে মল্লুর হাতে দিয়ে বলল, "এটা মাকে দিয়ে দেবে।" পুল্লাইয়াকে সে একরকম জোর করেই চা খাওয়াল। এই নিয়ে তৃতীয়বার সে আন্নার পয়সায় খেল। বার বার তার পয়সায় খেতে পুল্লাইয়ার লজ্জা করল। পেট ভরে যেতেই শরীরে যেন সে শক্তি পেল।

তিনজনে মিলে পথে হাঁটছিল। পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করল, "আন্না, কোথাও চাকরির সন্ধান পেয়েছ?"

"ওরে দাদা, করতে চাইলে কাজের কি অভাব আছে ? নেহাত বোন বিছানায় পড়ে গেছে। সংসারে কত লোকে কত কথা বলে। পেটে ভাত থাকলে জগৎ সংসার সব কিছুই সুন্দর দেখায়।"

"তাহলে তোমার কি ভাবে চলছে আন্না ?" পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করল।

"সব বলছি। এসো বসি।" বলে রাস্তার পাশে একটা পাথরের ঢিপির উপর বসল। কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলার পর আন্না বলল, "কাল সকালে একবার এসো। তোমাকে দেখাব, টাকা পয়সার আশা কাকে বলে। আর গরীবের দুঃখ যে কি তাও তুমি দেখতে পাবে। এসব দেখলে জগতে কোন্‌টা যে পাপ আর কোন্‌টা যে পুণ্য বোঝা যায় না। নীতি রীতি ফেলে সরিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে।"

"নীতি রীতি না থাকলে আর কিছুই তো থাকে না আন্না।"

"দাদা, বলেছ ভাল। তুমি যদি না খেতে পেয়ে মরে যাও তাহলে নীতি আদর্শ ওসব কি তোমাকে বাঁচাতে আসবে ? তুমি বেঁচে থাকলে নীতি আসবে। তোমার ভাগ্য খুলবে···আর আমাদের অধিকার ? বাঁচার অধিকার ? কার কাছে চাইব ! যে চোখ কান বুজে টাকা লুটছে তার কাছে চেয়ে লাভ আছে ! ওরা বসে বসে হুকুম দেয়। ওর উপর বোমা ফেল, এর পেটে ছোরা বসিয়ে দাও, আরও কত কি। কিন্তু যে মরল তার বউ কাচ্চা বাচ্চাদের কি হবে ? এমন সরকার চাই যে সকলের কথা দরদ দিয়ে ভাববে। আমাদের জন্য কে ভাবে ? আমাদের জন্য কারও মনে কি দরদ আছে ? সরকার হবে ঠিক মা-বাবার মত। কিন্তু কি দেখছি আমাদের সে কি করে ? আমরা কি করে ন্যায়পথে, ধর্মের পথে চলবো দাদা ?"

"আমাদের গর্মেণ্ট এখন শিশু। কতদিকে আর তাকাবে।"

"দাদা, তুমি এখনও এই শহরের অবস্থা জানো না। আমরা যখন ছোট ছিলাম কি দেখতাম ? আমাদের বাবা-মা সাধারণ একটা ধুতি শাড়ি পেয়ে খুশী ছিল। আর এখন কি দেখছি ? একটু যার পয়সা হচ্ছে সে চায় গাড়ি। আশা তার সীমা ছাড়িয়ে, যাচ্ছে। যার পেট যত বড় হচ্ছে সে তত বেশি খেতে চাইছে। আশার বেলুন ফুলছে তো ফুলছেই, বড় হচ্ছে তো বড় হচ্ছেই। ওর আশা আর পূরণ হয় না। ওর খিদে আর মেটে না।"

সে আবার বলল, "বল দাদা, তুমি, আমি, আমরা কি গাড়ি চাই ? না, আমরা শুধু কাজ চাই, দুবেলা দুমুঠো খেতে চাই।"

"তাইত।"

"তাই আমরা সরকারকে বলি, দেখ, তুমি হলে আমাদের মা-বাপ। ঐ ধনী লোকটা যদি গাড়ি চায় তার গাড়ি হোক। তবে আমাদের পেটে যাতে দুটো ভাত পড়ে সেদিকেও তুমি লক্ষ্য রাখ। তুমি বিপদে পড়লে ঐ ধনী লোকটা তোমাকে উদ্ধার করবে না। আমাদের মত গরীব লোকরাই পাশে দাঁড়াবে। ধনীদের সংখ্যা আর

কত ? ওদের তুলনায় সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি ।"

পুল্লাইয়া মাঝপথে থামিয়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আন্না, তাহলে গর্মেণ্ট আমাদের কিছু করছে না কেন ?"

"ঐ তো মজা দাদা। গর্মেণ্টের চোখে ঠুলি পরিয়ে দেওয়ার লোক আছে। গর্মেণ্টের চোখে যাতে সব কিছু না পড়ে তার চক্রান্ত করার লোকও আছে। অতবড যে রাজা রামচন্দ্র, উনি কি করতেন ? ঘুরে ঘুরে লোকের কথা শুনতেন। প্রজাদের কথা শুনে সতীদেবী সীতাকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। দাদা, সে রকম রাজা থাকলে দু'বেলা ফ্যানেভাতে জুটে যেত। আর তখন ঐটাই আমাদের কাছে অমৃত মনে হত।"

"ঠিকই বলেছ আন্না। ঐ রকম রাজা আর আসবে না।"

"লঙ্কা থেকে ফিরে এসে রাজা রামচন্দ্র কি করে ছিল ? যারা রাতারাতি অনেক সম্পত্তি করে ফেলেছিল, তাদের পেছনে হনুমান লেলিয়ে দিয়ে ওদের কাছ থেকে অর্থ কেড়ে নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। ঠিক সেইভাবে আমাদের গভর্নমেণ্ট কালোবাজারী করে যারা রাতারাতি বড়লোক হয়েছে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা কেড়ে নিলে আমাদের কাজ জুটত, দুবেলা ফ্যানেভাতে আমরা বাঁচতে পারতাম।" আন্না বলল। "আমাদের গ্রামে কি হয়েছিল জানো ? হাজার মণ ধান যার হত তাকে দেখানো হল কম ধান হয়। ওর নাম রাজু। রাজু পয়সাকড়ি দিয়ে কম ধান হওয়ার মত লিখিয়ে নিল। আর আমার নামে দেখানো হল অনেক ধান। সাধে কি আজ আমাকে গ্রামের ভিটে মাটি ছেড়ে এখানে আসতে হয়েছে দাদা ! অনেক দুঃখে এসেছি।" পুল্লাইয়ার কথা মন দিয়ে শুনে আন্না বলল, "তাই বলছি দাদা, জগৎ সংসারের তো এই অবস্থা। ন্যায়ের পথে, ধর্মের পথে চলে তো বাঁচতে পারছি না। সবাই যখন যেমন, তখন তেমন চলছে। আবার সেই রকমের রাজা না এলে ওলট পালট কিছু হবে না। আমাদের তো সেদিনের অপেক্ষায় বেঁচে থাকতে হবে। খিদের জ্বালায় তুমি আর তোমার ছেলে যদি মরে যাও সেই রাজার রাজত্বে কে বাস করবে ? তাই বলছি, আমার কথা শোন...তুমি যদি রাত্রে আস..."

"কিসের জন্য ?" পুল্লাইয়ার মুখ থেকে আতঙ্কিত প্রশ্ন বেরিয়ে এল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আন্না বুঝল পুল্লাইয়ার মনে এখনও পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্ব আছে। তাই সে বলল, "না দাদা, চুরি টুরির কাজ নয়, রাত্রে জাহাজ থেকে গমের বস্তা নামাতে হয়। কি করবে বল, ইচ্ছে করলে তো আর এক্ষুণি তুমি গ্রামে ফিরে যেতে পারছ না। এই শহরে যখন এসেছ নানান ধরণের কাজ কর, বাঁচো খাও। কিছু পয়সা করে নাও, তারপর ফিরে যাও তুমি তোমার দেশে।"

পুল্লাইয়া একটু হেসে বলল, "হুঁ অত টাকা আর আমি জীবনে করতে পারব ?"

"কেউ বলতে পারে না দাদা। ওপরওয়ালার নজরে যদি পড়ে যাও, কপাল যদি ভাল থাকে হাজার হাজার টাকা এসে যাবে। কাল রাত্রে ঠিক এই সময় এখানেই

থাকব। আসবে তো? আমি তোমার জন্য ঠিক এইখানেই অপেক্ষা করব। ঠিক এইখানে। এই রাস্তার পাশে। একা এসো কিন্তু।"

পুল্লাইয়া ছেলেকে দেখিয়ে বলল, "এ যে আমাকে ছাড়ে না।"

"বাঁচতে হলে ছাড়তে হবে দাদা!"

পুল্লাইয়া খুশী মনে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল। নীলিকে সে বলল, "আজ আমাদের কষ্টের দিন শেষ হল। কাল থেকে আমি যা রোজগার করব তাতে আমাদের সকলের পেট ভরে যাবে। তুমি ভিখিরীকে খাওয়াতে পারবে। তারপরেও কিছু টাকা বাঁচবে। তারপর টাকা জমিয়ে সেই টাকা নিয়ে আমরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যাব।" বলে আনন্দে ফুলে উঠছিল পুল্লাইয়া।

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বাতাসে বাড়ি তুলতে চাইছ। রোজগারের পয়সায় খেয়ে পরে বাঁচতে পারলেই যথেষ্ট।" নীলি বলল।

এই শহরে পা রাখার পর সেদিন রাত্রেই প্রথম পুল্লাইয়ার ভাল ঘুম হল।

পঁয়ত্রিশ

যা ভাবা হয়েছিল তাই হল। মল্লু পরের দিন রাত্রে বাপের পিছু নিল। অনেক করে বোঝালেও কোন লাভ হল না। নীলিও বোঝাল। তাতেও হল না। শেষে নীলি বিরক্ত হয়ে ছেলেকে জোর করে ধরে রেখে স্বামীকে চলে যাওয়ার ইশারা করল। পুল্লাইয়া যাওয়ার সময় মল্লু আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। চেঁচিয়ে লাফিয়ে শেষে সে নিজেকে মায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। তাকে ধরে রাখতে না পেরে নীলি ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে তার হাত পা বেঁধে ঘরের এক কোণে ফেলে রাখল। ঐভাবে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে অনেকক্ষণ পরেও সে ঘুমিয়ে পড়ল না।

পুল্লাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্না তাকে নিয়ে নিজের ঘরে গেল। এই প্রথম পুল্লাইয়া তার ঘর দেখল। জ্যোৎস্নার আলোতে সে আশেপাশের ঘরগুলোও দেখল। খুব কাছাকাছি ঘর। ঘিঞ্জি বস্তি। ছোট্ট ঘরের এক কোণে শুয়েছিল আন্নার বোন আর এক কোণে ছিল তিনটি বাচ্চা। একটি মাত্র ছোট্ট ঘর। সেটাকে ঘর না বলে রান্নাঘর বললেও বড় কিছু বলা হয়। একটা লম্ফ জ্বলছিল ঐ ঘরে। মেঝের উপর আঁচল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছিল তার ছোট বোন। মাঝে মাঝে তার গোঙানি শোনা যাচ্ছিল। আন্নার ছেলে মল্লুর চেয়েও বছর তিনেকের বড় হবে। বই হাতে নিয়ে এককোণে বসে জোরে জোরে পড়ছিল। বড় মেয়ে ছোট মেয়েকে কোলে রেখে ঘুম-

পাড়ানোর চেষ্টা করছিল।

পুল্লাইয়া ঐ ছেলেটির পড়া শুনে নিজের ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে বলল, "বেশ পড়াশুনা করছে তো?" পুল্লাইয়ার কথা শুনে আন্না ছেলের সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলল। ঐ ছেলের আশাতেই নাকি সে বেঁচে আছে। তার কথাগুলো শুনতে শুনতে নিজের ছেলের কথা শোনার মতই পুল্লাইয়া উৎসাহিত হল, আনন্দবোধ করল। আন্নার বোনের দিকে আর ঐ মা-হারা বাচ্চার দিকে তাকিয়ে দুঃখ পেয়ে পুল্লাইয়া বলল, "আন্না, এই মা-হারা মেয়ে আর ঐ অসুস্থ বোনকে নিয়ে তুমি তো খুব কষ্টে আছ।"

আন্না ছোট্ট বারান্দায় বসে নিজের কাহিনী শুরু করল, "কি করব দাদা, সবই আমার ভাগ্য। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ পর্যন্ত সবই আমি করে থাকি, এত রকমের কাজ করেও প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত। বউ যেদিন মারা গেল সেদিন আমার হাতে কাণাকড়িও ছিল না। ওকে আমি কোন দিন দু'বেলা পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি। খিদের জ্বালায় বেচারি কষ্ট পেয়ে পেয়ে, তিলে তিলে শেষ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি দাদা, বউ যে মরে গেছে তার জন্য আমিই দায়ী। মরার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, সে কোনদিন আমার এটা নেই ওটা নেই বলে অভিযোগ করেনি। শত অভাবেও সে এমন করেছে যেন সব আছে। সে যেদিন মরে গেল, সত্যি কথা বলতে কি দাদা, আমারও সেদিন মৃত্যু হল।"

তার বিষাদের কাহিনী শুনতে শুনতে পুল্লাইয়া কাজের কথা ভুলেই গেল। আন্না কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু করল, "আমাদের হাতে কি আছে দাদা, শুধু আছে এই বুকের সাহস আর ধৈর্য। এটুকুই আমাদের সম্পদ। ওর ভরসাতেই এদের নিয়ে আমি দিন কাটাচ্ছি···"

এমন সময় একজন এল। লোকটা বেঁটে, গাঁয়ের রং কালো। দেখতে তেমন না হলেও তার আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্না দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনজনে মিলে কিছুদূর হাঁটল। রাস্তার পাশে খালের ধারে বসে আন্না পুল্লাইয়াকে বলল, "এই সে যার কথা বলছিলাম। দেখতে এরকম হলে কি হবে এর মন গরিবদের জন্য ভীষণ কাঁদে। গরিবদের পেটের খিদে মেটাতে ইচ্ছে করলে এ নিজের গায়ের মাংসও কেটে দিতে পারে। যেমন রোজগার করে তেমনি খরচ করে। এর কাছে টাকার চেয়েও মানুষ বড়···"

অদূরেই বন্দর। বন্দরের আলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়ার ইচ্ছে করছিল তাড়াতাড়ি গিয়ে গমের বস্তা নামাতে। যত তাড়াতাড়ি কাজ করবে তত তাড়াতাড়ি পয়সা পাবে। এটাই পুল্লাইয়ার ধারণা ছিল। তাই সে বলল, "কাজে যাবো না?"

"এখনই···সাধারণত এই ধরণের রাত্রে কাজ করাই যায় না।"

"কেন?"

"উপরের দিকে তাকাও। ঐ যে দেখতে পাচ্ছ ঐ চাঁদ ঢাকা না পড়লে কাজ হবে না।"

পুল্লাইয়া সন্দেহের দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকাল। কি একটা সন্দেহ তার মনে জাগল। সে আন্নাকে বলল, "আন্না, জাহাজ থেকে মাল নামানোর কথা বলেছিলে না ?

"বলেছিলাম দাদা। কত জাহাজ আসবে কত জাহাজ যাবে। আমাদের কি জাহাজের অভাব।"

"কি যে বলছ আন্না কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু খুলে বল।" পুল্লাইয়া বলল।

"খুলে বলার কিছু নেই দাদা। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ? এ কাজের একটা ধারা আছে তো, যেদিন কাজ হয়, হয়, যেদিন হয় না, হয় না। ছোট্ট একটা কাজ করে আমরা কোন লোকের পাকা ধানে তো মই দিচ্ছি না।"

"চুরি করা না কি ?" সবিস্ময়ে পুল্লাইয়া প্রশ্ন করল।

"ওহে চন্দ্রাইয়া, এই দাদাটি অকর্মার ঢেঁকির মত না খেতে পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে চাইছে। কিন্তু যে কোনভাবে গতর খাটিয়ে পেটে দানাপানি ফেলতে চাইছে না।" বলে সে পুল্লাইয়ার দিকে ঘুরে বলল, "দাদা, তুমি চেষ্টা চরিত্র করে একটা কাজ যোগাড় করতে পেরেছ ? পারবে ?"

পুল্লাইয়া মাথা নেড়ে অক্ষমতা জানাল।

"বল কিছুদিন পরেও কি জোগাড় করতে পারবে একটি চাকরি ?"

"না।"

"তাহলে বাঁচার জন্য চুরি করতে পারবে না ?"

"চুরি করতে পারি না।"

"যদি কোনভাবে কিছু টাকা আসে নেবে না ?

"পাপ হবে। পাপ।"

"তাহলে তুমি এই জগৎ সংসারে কোন কাজে আসছ না, বোঝা গেল। তুমি নিজে চাকরি জোগাড় করতে পারবে না, কোন ভাবে টাকা তুলে দিলে তুমি নেবে না··· পাপ হবে তোমার। এই তো ? তাহলে এলে কেন ?"

"তোমার সঙ্গে মরতে এসেছি।" চন্দ্রাইয়া ওদের কথার পিঠে বলল।

"দেখ দাদা, তোমার ওসব পাপ পুণ্য আমার মগজে ঢুকছে না। পেটের জ্বালায় মরতে বসে পাপ পুণ্যের কথা ভাববে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কি করেছিল ? মিথ্যে কথা বলে নি ? তার চেয়েও তুমি কি বড় সত্যবাদী ? তুমি দেখছি ভীষণ বোকা। আমার কথামত যদি না চল দু চার দিনের মধ্যে তোমার এমন অবস্থা হবে যে তোমাকে টেনে তুলে দাঁড় করানো যাবে না। তোমাকে দাঁড় করাতে কেউ যাবেও না।"

পুল্লাইয়া মাথা নিচু করে ফেলল। আন্না আবার বলল, "আমরা কাউকে ধোঁকা

দিচ্ছি না। কোন লোকের রক্তও নিংড়াতে যাচ্ছি না। ন্যায় পথে চলেছি। বার বার আবেদন নিবেদন করেছি। তাতেও চাকরি পাইনি। এখন অন্যভাবে নিজেদের পেট চালানোর মত কিছু জোগাড় করার ধান্দা করছি। আকাশে যে মেঘ দেখছ সেই মেঘ সকলের জন্য। মাটির উপরে যে ফসল দেখছ সেই ফসলের উপর অধিকার সকলের আছে। এই ফসল বড় যদি বেশি খায় বাচ্চা যদি কম খায় কোন ঝামেলাই থাকবে না। ভাগ করে খেলে আমাদের এই কাজে নামতে হত না। আমাদের বাচ্চাদের যারা মেরে ফেলেছে, আমাদের বউদের যারা মরতে বাধ্য করছে তাদের সম্পত্তি রক্ষার কোন দায়িত্ব আমাদের নেই।"

পুল্লাইয়া তখনও নীরবে শুনে যাচ্ছিল। আন্নাও বলে গেল, "তোমার ধারণা এই ভাবে রাত্রে যারা বেরোয় তারাই চুরি করে।···তুমি জানো না, এই যে বড় বড় ব্যবসাদার এরা এক টাকার জিনিস দু টাকায় বিক্রি করে। ওরা চোর নয়? যত চোর হলাম আমরা? তুমি ভেবো না তুমি না এলে আমাদের লোকের অভাব। আসলে তোমাকে এমন এক মুহূর্তে দেখেছি···তোমাকে দেখে তোমার অবস্থা শুনে, তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি জেগেছে। দাদা, নেহাৎ এটা তোমার পাগলামি। তুমি যদি ভাল করে একটু চোখ খুলে দেখ, কান খাড়া রেখে শোন, তাহলে দেখবে চুরি করে না বা অন্যায়ের পথে চলে না এরকম ধনী একজনও নেই।···ঠিক আছে তোমাকে আমাদের সঙ্গে চুরি করতে যেতে হবে না। তুমি বাইরে থাক। কাজ হয়ে যাওয়ার পর তোমার একটা ভাগ তুমি পাবে।"

চাঁদ মেঘে ঢাকা পর্যন্ত ওরা বসে রইল। সেখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছাও পুল্লাইয়ার জাগল না। ধার আছে ঘর ভাড়া দিতে হবে। বউয়ের কাছে সে আগের দিন রাত্রে অনেক বড় বড় কথা বলেছিল। ভাড়া না দিলে বাড়িওয়ালী চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে ঘর থেকে বের করে দেবে। বার বার আজ দেব কাল দেব বলা যায় না। পুল্লাইয়া ভাবতে লাগল মল্লু বড় হচ্ছে। ওকে ইস্কুলে দিতে হবে। শ্লেট পেন্সিল, বই তার জন্য কিনে দিতে হবে। ইস্কুলে গেলে জামা-কাপড় লাগবে। এদের সঙ্গে কাজ না করলে কাল থেকে কি খাবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে পুল্লাইয়া আপন মনে বলল, "কাল দেশে চলে গেলে কেমন হয়? অমন সুন্দর জমি, নদীর জলের স্রোত, সুন্দর বাড়ি···বলদ···চাষ আবাদ···অমন সুন্দর সবুজ ঘাস, গাছ লতাপাতা, মা লক্ষ্মীর গ্রাম·· নীলাম্মা দেবীর উৎসব···লাঠি খেলা···সে কি আনন্দ···ভরপুর আনন্দ···" পরক্ষণেই সে যেন বিকট হাসি শুনতে পেল। কে যেন তাকে বলল, "পুল্লাইয়া, ভুলে যাচ্ছ, ভুলে যাচ্ছ সেদিনের কথা। তোমার মনে নেই তুমি কেন দেশের মাটি ছেড়েছ? দিনকে দিন মানুষ বদলে যাচ্ছে! সব কিছু বদলে যাচ্ছে। গ্রামে ফিরতে চাও? কোথায় দাঁড়াবে? কি করবে? এক ছটাক জমি তোমার আছে? মাথা গোঁজার

চালা আছে? গাঁয়ে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কি তোমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসবে না? তুমি ওদের করুণা চাও? পাবে। দু একদিনের জন্য পাবে। কিন্তু তারপর কি ভাবে বাঁচবে? কোন মুখে তুমি ফিরতে চাও?" পুল্লাইয়ার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তার মনের সমুদ্রে যেন তুফান চলেছে। সে বিড় বিড় করে বলল, "মা, নীলাম্মা দেবী···আমাকে দয়া কর মা···আমি এই কাজ করতে পারবো না···আমি যাতে ন্যায় পথে থাকতে পারি তুমি তার একটা পথ দেখাও···মা, মাগো।'

"আরে এ যে কাঁদছে।" চন্দ্রাইয়া বলল।

"প্রথম দিনে আমরা কি কাঁদিনি। এই কাদায় নামার আগে সবাই মানুষের মত ছিলাম। না নেমে উপায় থাকে না বলেই নামি। নামার পর আর মানুষ থাকতে পারি না। একেবারে শূয়োর হয়ে যাই।"

তিনজনেই নীরবে অনেকক্ষণ বসেছিল। তারপর আন্না উঠে দাঁড়িয়ে পুল্লাইয়াকে বলল, "ওঠ দাদা, তোমাকে চুরি করতে হবে না। আমরা দুজনেই করব। তুমি দূরে দাঁড়িয়ে থেকো। যতদিন না তুমি চাকরি পাও ততদিন তোমাকে তো বাঁচতে হবে, বাঁচার জন্য যতটুকু খাদ্য চাই সেটা তো জোগাড় করতে হবে। ঐ খাদ্যের পয়সা মাঝে মাঝে তুমি আমাদের কাছ থেকে নিও। ঐ দেখ···" বলে আন্না চন্দ্রাইয়ার হাতের তালুতে হাত রেখে পুল্লাইয়ার হাতকেও ঐ দুটো হাতের উপর রেখে বলল, এবার সবাই ভগবানের নামে বল, আমাদের মধ্যে যে কোন একজন দুর্ভাগ্যবশত যদি ধরা পড়ি বাকি দুজনের কথা মরে গেলেও আমরা মুখ ফুটে বলব না।" এই কথাগুলো আরও দুবার সবাই মিলে বলল। দ্বিতীয়বার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল। তৃতীয়বার তার কথা পরিষ্কার শোনা গেল।

এই পর্ব শেষ করে তিনজনে মিলে রওনা হলো। চন্দ্রাইয়া আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল সেদিন রাত্রে কোন্ জায়গায় মাল চুরি করবে। সেই জায়গায় যাওয়ার মুখে মিউনিসিপ্যালিটির একটা বাতি ছিল। সে প্রথমেই ঢিল ছুঁড়ে ঐ আলোর বাল্‌ব ভেঙ্গে ফেলল। আন্না ঐ অন্ধকারে পুল্লাইয়াকে দাঁড় করিয়ে চন্দ্রাইয়াকে নিয়ে চলে গেল। পুলিশ এলে কি ভাবে ইশারা করতে হবে তাও আন্না পুল্লাইয়াকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল। প্রয়োজন হলে কি ভাবে পালাতে হবে, কোন্ পথে পালাতে হবে তাও আন্না তাকে জানিয়ে দিল।

ওদের মধ্যে চন্দ্রাইয়াই পোক্ত লোক। পুল্লাইয়া এক কোণে বসেছিল বটে কিন্তু তার পা ঠকঠক করে কাঁপছিল। শুধু পা কেন সমস্ত শরীরটাই কাঁপছিল। মাঝে মাঝে তার শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে আতঙ্কে সে ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবল, "আমার পাড়ায় চোর ঢুকলে আমি কি এভাবে চুপচাপ এক কোণে বসে থাকতাম। যে কোন ভাবে ওকে ধরে ফেলতাম। আর আজ সেই আমি চোখের সামনে চুরি হতে দেখেও কিছু বলছি না! "চোর চোর" বলে একবার চিৎকার করে উঠতে তার ইচ্ছে

করল। জিবের ডগায় শব্দটা তার এসে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল তার অভাবের কথা।

ওদের দুজনের ফিরে আসতে খুব বেশি সময় লাগেনি। আবার তিনজনে পা টিপে টিপে হেঁটে সেই খালের ধারে, আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এল। সে রাত্রে যে কাজ হল তাতে চন্দ্রাইয়ার মন উঠল না। গেঞ্জীর ভেতরের পকেট থেকে একটা সোনার মত চকচকে জিনিস বের করল। আরও একটা ভারী জিনিস আছে বলে মনে হল। সেটাও বের করল সে। ছোরা! চকচকে ছোরা দেখে পুল্লাইয়ার ভয় করল। তার মনে হল সে যেন চোরের হাতে ধরা পড়েছে।

সকাল হতে দু ঘণ্টা বাকি। আন্না বলল, "দাদা, কাল সকালে আমাদের আবার দেখা হবে।" পুল্লাইয়া ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ফেরা পথে পুল্লাইয়ার অনেক কথাই মনে পড়ল। কাল সকালে কি করবে তাও সে ভাবল "কালকে নীলির হাতে টাকা তুলে দেব কি করে? কি ভাবে রোজগার হয়েছে জিজ্ঞেস করলে আমি কি জবাব দেবো? বিয়ের দিন তো অগ্নিসাক্ষী করে বলেছিলাম, যা অর্জন করব তার অর্ধেক বউকে দেবো। তাহলে কালকে কি আমি চুরি করে অর্জন করা টাকা নীলির হাতে তুলে দেব? তাকেও পাপের ভাগী করব? না, কালকে আর আসব না।"

ছত্রিশ

সকালে বাপকে দেখে মল্লু গাল ফুলিয়ে বসে রইল। বাবা বার বার ডাকলেও তার দিকে ঘুরে তাকাল না। নীলি প্রশ্ন করল, "হ্যাগো কত দিল?" চট করে জবাব না দিলে না জানি কি ভাববে ভেবে পুল্লাইয়া বলল, "তিন টাকা।" নীলি খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওরা রোজ কাজ দেবে তো?"

"যেদিন পাবো সেদিন করবো। না পেলে করবো না!" এই কটা মিথ্যা কথা পুল্লাইয়া জোর করে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল। বলার সময় তার ভয় করছিল। বলা কওয়ার পরেও টাকা না দেওয়ায় নীলি জিজ্ঞেস করল, "হ্যাগো, ওরা মজুরি দেয়নি?"

"দেবে।"

"কবে?"

"আজকেই।"

পুল্লাইয়ার একটু ঘুমোতে ইচ্ছে করল। ঘরেই শুয়ে মল্লুকে ডাকল। ছেলে এল না। মেয়ে কাছেই খেলছিল।

"বাবা শোন, মল্লু শুনে যাও, আজ তোমাকে নিয়ে যাব···এসো।"

ছেলে এল বটে কিন্তু তার মুখে হাসি নেই। পুল্লাইয়া তাকে হাসানোর চেষ্টা করল। এমন সময় ঘরের পেছন দিক থেকে বাড়িওয়ালীর চড়া গলা শোনা গেল। সেই দিনেই তিন টাকা দিতে হবে। এই হল দাবী। তার গলা শুনে পুল্লাইয়ার পৌরুষ মাথা চাড়া দিল।

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা কোথাও পালিয়ে যাব।"

"অত যদি দম্ভ থাকে টাকাটা ফেলে দিলেই তো হয়।"

"ফেলে দেব নাতো কি রেখে দেব ?"

"কবে ফেলবে তার আশায় কি আমি বসে থাকব ? অনেক লোক ঘর ভাড়া নিতে আসছে। অত যদি দেমাক থাকে পুরুষ মানুষের মত টাকা কটা ফেলে দিলেই হয়।"

নীলি এ কথা সে কথা বলে স্বামীকে বুঝিয়ে ঘরে টেনে আনল। পুল্লাইয়া ঘরে ঢুকলেও বাড়িওয়ালীর গলা থামে নি। ঘরে পা রেখে পুল্লাইয়ার বুক জ্বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে আন্নার ঘরে গিয়ে তাকে বলল, "আন্না, ভীষণ দরকার। তিনটি টাকা চাই।"

সব কথা শুনে সে চন্দ্রাইয়ার কাছ থেকে টাকা এনে তার হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "রাত্রের জিনিসটা এখনও বিক্রি করা হয়নি। চোরাই মাল তো। ব্যাটা স্যাকরা ভয়ে প্রথমে কিনতেই চায়নি। কিনলেও সে চার ভাগের এক ভাগ দাম দিতে চায়। তুমি তোমার ভাগের দশ টাকা পাবে। চন্দ্রাইয়া এই কথাগুলো তোমাকে বলতে বলল।"

"বাঁচালে আন্না, সে টাকার হিসেব পরে হবে। ওসব আমি বুঝিও না।" বলে পুল্লাইয়া চলে গেল। ঘরে ফিরে নীলির হাতে ঐ টাকা দিয়ে পুল্লাইয়া বলল, "যাও ওর মুখের উপর টাকাটা ছুঁড়ে দাও।" তার কথা শুনতে পেয়ে বাড়িওয়ালী আবার গলা ফাটিয়ে নানা কথা বলতে লাগল। নীলি তার হাতে টাকা দিয়ে সবিনয়ে বলল, "কেন এসব কথা বলছ মা ? এই জগতে কে কতদিন থাকবে। মুখ খারাপ করে কি হবে। প্রতিবেশীরা বিপদে না দেখলে কে দেখবে।" বাড়িওয়ালী তক্ষুনি থামে নি। তবে কিছুক্ষণ পরে সে থেমে ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় পুল্লাইয়া মল্লুকে সঙ্গে নিয়ে আন্নার ঘরে গেল। আন্না তাকে জোর করে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল। পর্দায় ছবি দেখে মল্লুর আনন্দ আর ধরে না। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে উঠে লাফাতে আরম্ভ করছিল। আশপাশের লোক বিরক্ত হয়ে পুল্লাইয়ার দিকে তাকাচ্ছিল। যতক্ষণ সিনেমা দেখছিল ততক্ষণ পুল্লাইয়াও স্বপ্নের ঘোরে ছিল। সে ভাবছিল এধরণের বিরাট বিরাট বাড়ি, এত টাকা থাকলে তার কত ভাল হত। মল্লুকে সে বড় করতে পারতো। কত সুখে সে নীলিকে রাখতে পারতো। তার ঐ ছবি বারবার দেখতে ইচ্ছে করছিল। গানগুলো কত চমৎকার। টানা তিন ঘণ্টা

পুল্লাইয়ার মনে একবারও তার নিজের দুঃখের কথা মনে পড়েনি।

ঘরে ফেরার পর পুল্লাইয়াকে নীলি জিজ্ঞেস করল, "আজ কাজে যাবে না ?"

"আজ নাকি কাজ হবে না।"

মল্লু সিনেমায় কি কি দেখেছে, কিভাবে কি হচ্ছিল সব হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল।

পরের দিন চন্দ্রাইয়ার দেখা পেয়ে তার সঙ্গে পুল্লাইয়া গেল। এ গলি সে গলি ঘুরে যেখানে সে গেল সেখানে একটি ঘরের বারান্দায় বসে কয়েকটি লোক তাস খেলছিল। "বসো, দেখো।" বলে চন্দ্রাইয়া পুল্লাইয়াকে বসিয়ে টাকা বের করে জুয়ো খেলা শুরু করে দিল। পুল্লাইয়া বড় বড় চোখে হা করে দেখছিল ওদের খেলা। মল্লুও দেখছিল। সকাল থেকে দুপুর হয়ে গেল। কিন্তু চন্দ্রাইয়া নড়ল না। পুল্লাইয়া উঠে পড়ে যাওয়ার কথা বলল। তখন চন্দ্রাইয়া উঠে একবার আড়ালে গিয়ে পুল্লাইয়াকে বলল, "আজ রাত্রে কাজ হবে। তুমি এক্ষুণি গিয়ে আন্নার সঙ্গে দেখা কর।"

পুল্লাইয়া মাথা নেড়ে রাজী হলেও ঘরের দিকে পা বাড়াল। ঘরে ঢুকে দেখে কিচ্ছু নেই। নীলি বলল, "সুদে আর কত টাকা পাব! যারা টাকা দিয়েছিল, তারা বার বার এসে তাগাদা দিচ্ছিল।"

তার কথা শুনে পুল্লাইয়া বারান্দায় বসে পড়ল। কোলের বাচ্চা মেয়েটা খিদের জ্বালায় কাঁদতে লাগল। নীলি কোন কথা না বলে চুপচাপ ঘরের পেছনে বসে রইল।

মেয়ের কান্না শুনতে শুনতে পুল্লাইয়া আপনমনে বলল, "কোথায় কাজ পাব আমি। একবার যখন কাদায় পা ডুবিয়েছি ভাল ভাবেই ডুববো। পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার আগে এদের একটা ব্যবস্থা করে যাব। বাঁচতে হলে পেটে কিছু ফেলতে হবে। ওসব নীতি-রীতি, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম কোনটারই কোন দাম নেই। অত বড় যে বিশ্বামিত্র তাকেও তো একদিন খিদের জ্বালায় ডোমপাড়ায় গিয়ে কুকুরের মাংস নাকি চুরি করে খেতে হয়েছে। অতবড় লোকের যখন এই অবস্থা তখন আমি কোন্ ছার। আমার যে এরকম অবস্থা কেন হল···যাক যে কোন কারণেই হোক হয়েছে যখন, এবার আমাকে এই কষ্টের দিন দূর করতেই হবে। এই পথ ধরেছি বলেই হয়ত যমরাজ জলন্ত শলাকা আমার চোখের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে। তা দেয় দিক। চিরকাল কে আর বেঁচে থাকবে। মরার পরে তো শাস্তি দেবে। আমি তো আর টের পাব না। আমার ছেলে মেয়ে বউ তো আর টের পাবে না। এখন তো ওদের দুঃখ দূর হবে।" এসব কথা ভেবে সোজা আন্নার কাছে গিয়ে সাতটি টাকা চেয়ে নিল।

টাকা হাতে দিয়ে আন্না তাকে বলল, "দেখ দাদা, এসব টাকা যে ভাবে আসে সে ভাবেই চলে যায়। তুমি ভেব না এসব টাকা থেকে যাবে। যখন টাকা হাতে আসবে পেট ভরে খাবে, শরীরটাকে মজবুত করবে, পারলে কিছু টাকা জমাবে। বলা যায় না ঐ টাকা ঘুষ দিয়ে তুমি একদিন চাকরি পেলেও পেতে পার।" এই কথাগুলো পুল্লাইয়ার

মনে ধরল।

"চন্দ্রাইয়া আজ রাত্রে কাজ হবে বলেছে। ও না থাকলে আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় আর কি হবে বল। তাই সে যা দেয়, মাথা পেতে নি। ওর আবার সমস্যা অনেক। খরচও বেশি। দুটো বউ পোষে, জুয়ো খেলে তার উপর আকণ্ঠ মদ খায়। ওর সঙ্গে তুমি যদি মেশো তিনদিনের মধ্যে তোমাকে বদলে ফেলবে। তাই বলছি, কাজের প্রয়োজনে যতটুকু তার সঙ্গে মেশা উচিত ততটুকুই ভাল। তার বেশি মিশলে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারবে না।" আন্না বলল।

পুল্লাইয়া ইশারায় ছেলেকে দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমার এই ছেলেটা রাতদিন আমাকে একটু নড়তে দেয় না। সব সময় সঙ্গে থাকবে। চন্দ্রাইয়া ঘুমের বড়ি দিয়েছে। আজ রাত্রে একে খাইয়ে দেব।"

"আমার ছেলেকেও প্রথম প্রথম ঐ বড়ি দিতে হয়েছে। কিছুদিন পরে সব অভ্যেস হয়ে যাবে! তখন বড়ি না দিলেও চলবে।" আন্না বলল।

ফেরা পথে সমস্ত টাকা নীলির হাতে দিলে পাছে সে সন্দেহ করে এই ভয়ে পুল্লাইয়া মাত্র দুটি টাকা তার হাতে দিয়ে "ধার করে এনেছি" বলবে ঠিক করল।

সাঁইত্রিশ

"জাহাজের মাল নামাতে হবে," বলে প্রত্যেকদিন রাত্রে চুরি করতে বেরোনো পুল্লাইয়ার অভ্যেস হয়ে গেল। একটা রাতও সে ঘরে ঘুমোত না। যতদিন গেল তত তার হাত তৈরি হয়ে গেল। ঘরে মল্লুও ঘুমিয়ে পড়ত। দেখতে দেখতে একা ঘুমিয়ে পড়া মল্লুর অভ্যেস হয়ে গেল। এক একদিন ঘুমের বড়ি না দিলেও সে ঘুমিয়ে পড়ত। তবে সকালে উঠে বাপকে না দেখতে পেলে আর রক্ষে ছিল না।

এখন পুল্লাইয়ার অবস্থা কিছুটা ফিরে গেছে বলা চলে। ছেলে মেয়ে বউ আর সে নিজে সকলেই দুবেলা পেট ভরে খাচ্ছে। ছেলের জন্য জামা প্যান্ট সেলাই করাল। তাকে ইস্কুলে ভর্তি করাল। তার ধারণা ছিল ইস্কুলে যাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেলে তার সঙ্গ ছেড়ে দেবে। ইস্কুলে গেলে তার মন লেখাপড়ায় বসে যাবে।

শুধু তাই নয়, পুল্লাইয়াও তার দলের অন্যদের মত সপ্তাহে তিনদিন সিনেমা দেখতে যেত। চন্দ্রাইয়ার সঙ্গে এখন তার গলায় গলায় বন্ধুত্ব। আন্নার সঙ্গে এখন আর তার অত ভাব নেই। পুল্লাইয়া এখন জুয়ো খেলে। এক এক খেপে পাঁচ ছ টাকা বাজী রাখে। যত হারতে থাকে তত তার মনে জিদ চাপে। তার ধারণা যেমন হারছে তেমন জিতবে। জুয়োর চাকা একদিকে ঘোরে না। উল্টোদিকেও ঘোরে। ভাল ভাবে জিতে গেলে সব টাকা নিয়ে সে গ্রামে ফিরে যাবে। ক্রমশ তার ধারণা হল,

"যত টাকা হেরে গেছি তত টাকা যদি এক সঙ্গে জিতে যাই গ্রামে গিয়ে এক একর জমি কিনে ফেলতে পারব।" আন্না তাকে বারবার বোঝালেও এখন আর পুল্লাইয়ার মনে পাপ, পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, প্রভৃতির বোধ অত নেই। কোনটাই সে এখন পাপ মনে করে না। এর মাঝে সে এক রাত্রে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। তারপর ওরা এক সপ্তাহ কাজ করতে বেরোয় নি।

গত ছ মাস ধরে ওরা যা করছিল সেগুলোকে ছোট ছোট চুরি বলা চলে। পুল্লাইয়া নীলির হাতে দু টাকা তিন টাকা করে দিত। যেদিন জুয়ো খেলে সব টাকা হেরে যেত সেদিন কিছুই দিত না। নীলির সঙ্গে মিথ্যে কথা বলা তার অভ্যেস হয়ে গেল। কথায় কথায় স্বাভাবিক ভাবে সে নীলিকে মিথ্যে কথা বলে। এত টাকা হাতে এলেও সে নীলির জন্য একটিও শাড়ি কিনল না। শেষে একদিন নীলির পরণে যে ছেঁড়া শাড়িটা ছিল সেটার দিকে আর তাকাতে না পেরে পুল্লাইয়া একটা শাড়ি কিনল।

"কোথায় পেলে এত টাকা? রাত্রে তো টাকা পাওনি বললে? কি করে এই শাড়ি কিনলে?" নীলি প্রশ্ন করল।

"জাহাজের ক্যাপ্টেন, সাহেব—খুব ভাল লোক। লাঠি খেলা দেখাতে বলল, দেখালাম। দেখে খুশী হয়ে আমার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলল, 'বউকে একটা শাড়ি কিনে দাও।' ব্যাস্ আমিও টাকা নিয়ে দোকান থেকে কিনে আনলাম।"

নীলি শাড়িটা পরল বটে কিন্তু তার কেমন যেন লাগছিল। শাড়িটা পরার পর তার শরীরটা কেমন যেন কাঁপছিল। ঐ শাড়িটাও তার গায়ে মানায় নি। প্রায় প্রত্যেক দিন স্বামী টাকা এনে তার হাতে দিলেও নীলির মনে আনন্দ ছিল না। পুল্লাইয়ার চোখেমুখে আগে যে সরল ভাব থাকত সেই ভাব, তার সেই চাউনি নীলির চোখে ইদানিং পড়ে না। তার শরীর একটু ফিরলেও মুখে সেই সারল্য নেই। তার চাল চলনেও একটা পরিবর্তন যে এসেছে তা নীলি লক্ষ্য করল।

শাড়িটা খুলে ফেলার পর তার মনে যেন শান্তি ফিরে এল। সে ভাবল একবার কাচলে শাড়িটা হয়ত পরা যাবে।

একদিন রাত্রে ওরা সেই ধর্মশালায় গেল। যে ধর্মশালায় পুল্লাইয়া প্রথম উঠেছিল। সেখানে যাওয়ার পর পুল্লাইয়ার সব কথা মনে পড়ল। সে মনে মনে বলল, "সেদিনের পুল্লাইয়ার সঙ্গে আজকের পুল্লাইয়ার কত তফাৎ। না, কোন তফাৎ নেই। আসলে সেদিনের পুল্লাইয়া মরে গেছে। যে মরে গেছে তার সঙ্গে আবার তুলনা কিসের। যে মরে গেছে তার কথা ভাববোই বা কেন?"

একদিন আন্না পুল্লাইয়াকে জোর করে নিজের ঘরের দিকে নিয়ে গেল। আন্না না-জানি-কি বলবে এই ভয়টা তার মনে ছিল। ইদানিং চন্দ্রাইয়া ও পুল্লাইয়া যা বলতো

তার সঙ্গে আন্না সব সময় একমত হত না। যা করতে বলত তা সব সময় করত না। একথা-সেকথা বলতে বলতে আন্না পুল্লাইয়াকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে খালের ধারে বসল। সন্ধ্যের সময় একটু একটু ঠাণ্ডা পড়ছিল। আন্না তাকে জিজ্ঞেস করল, "চাকরি খোঁজার ব্যাপারে কতদূর কি করলে?"

"আমাদের কে চাকরি দেবে?"

"কেন? না দেওয়ার কি আছে? কত টাকা জমিয়েছ আমার হাতে দাও তো। আমি তোমাকে চাকরি পাইয়ে দিচ্ছি। টাকা ফেললে চাকরির অভাব?"

"টাকা জমবে কোত্থেকে? আর কাজ পেলেও আমরা ক টাকা পাব?"

"যা অন্যেরা পায়!"

"কি দরকার অত ঝামেলার। এই ভাল আছি। একদিন কি আর ভাগ্যের চাকা ঘুরবে না? মোটা দাঁও পেলেই সোজা দেশের গ্রামে ফিরে যাব। ঐ রাজুকে এক হাত দেখে নেব। আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে যাব। বাবা, যে রকম গাঁয়ের মাথা ছিল আমিও সেই রকম হব।"

পুল্লাইয়া আবেগের সঙ্গে যা বলছিল ধৈর্য ধরে শুনে আন্না তাকে বলল, "ওরে দাদা, দেয়ালে যে চূণ লাগানো হয় সেই চূণ আর ফিরে পাওয়া যায় না। জুয়োতে যে টাকা চলে গেছে, তুমি আশায় আছ আবার সে টাকা ফিরে পাবে। তুমি ন'মণ তেলও জোগাড় করতে পারবে না আর রাধাও নাচবে না। না, তোমাকে আর বাঁচান গেল না।"

"যাবে না কেন? সব দিন সমান থাকে না?"

"দেখ আন্না, চন্দ্রাইয়ার পেশা হল চুরি করা। তুমি আর আমি পেটের জ্বালায় চুরি করতে নেমেছি। চাকরি পেয়েও যদি চুরি করতে যাই তখন বুঝতে হবে আমরা পাকা চোর হয়ে গেছি। নিজেরা চোর হয়ে গর্মেন্টের উপর দোষ চাপাতে পারব না। চুরি করতে গিয়ে দিনকে দিন হাত পেকে যায়, মনের পরিবর্তন হয়। আমার কথা শোন দাদা, আস্তে আস্তে টাকা পয়সা জমিয়ে তুমি একটা চাকরি পাওয়ার চেষ্টা কর। দু'বেলা পেট ভরানোর জন্য যেটুকু খরচ করার প্রয়োজন সেটুকু খরচ কর। কষ্ট করে যে টাকা রোজগার করবে সেই টাকায় কেনা চালের ভাত খেতে অনেক ভাল লাগবে দাদা।"

"এখন আমাকে ওসব কথা বলো না আন্না। অনেক টাকা হেরে গেছি। ওসব টাকা হাতে আনতে হবে। এই শহরে আর আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না। যতক্ষণ ঐ হেরে যাওয়া টাকা হাতে না পাচ্ছি ততক্ষণ তুমি আমাকে যাই বল, আমার কানে কোন কথাই ঢুকবে না।" পুল্লাইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

আন্না উঠতে উঠতে বলল, "আমি সেদিন যা বলেছিলাম তাই হল দেখছি। তুমি দেখছি ঐ কাদায় পুরোপুরি নেমে গেছ। শূয়োর হয়ে গেছ।"

পুল্লাইয়া কোন কথা না বলে চলে গেল।

আটত্রিশ

গ্রীষ্মকালের সকাল। পুল্লাইয়া ও চন্দ্রাইয়া একসঙ্গে পথে হাঁটছিল। জুজুবুড়ো যেখানে সাধারণত বসে থাকে সেখানেই বসেছিল। পাশে ছিল কুকুর। পুল্লাইয়া হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে বলল, "একে কোনদিন দেখেছ ? এর ব্যাপারে কিছু জান ?"

"জানি বৈকি। এ হল সাক্ষাৎ দেবতা। তুমি যদি ওকে কিছু দাও সে নেবে না। যেদিন নেবে সেদিন বুঝবে আমরা মোটা দাঁও মারতে পারব।" চন্দ্রাইয়া বলল।

পুল্লাইয়া হাঁটতে হাঁটতে বলল, "ওর মুখে একদিন শুনেছি, নারকেল গাছের নিচে নাকি ও সোনা পুঁতে রেখেছে। এ-কথা সে-কথা বলে ওর পেটের কথা বের করার চেষ্টা করেছি। তবে ওর বাড়িটা যে কোথায় তা জানতে পারিনি।"

ওর বাড়ি ঐ তো—ঐ তিনতলা বাড়িটা। এই জুজুবুড়ো নামটা বাচ্চাদের দেওয়া। আগে লোকটা খুব ধনী ছিল। ধনী পরিবারের ছেলে। অনেক দূর লেখাপড়া করেছে। তোমাকে ঠিক বলেছে নারকেল গাছের নিচে ?" চন্দ্রাইয়া বলল।

"তা বলেছে। কিন্তু ঐ বাড়ির পেছনে নারকেল গাছ কোথায় ?"

"এখন নেই, দু বছর আগে দেখেছিলাম। কিন্তু সেখানে তো এখন ঘর উঠে গেছে। সেই গাছটা তো নেই। কতটা সোনা আছে তা কিছু বলেছে ?"

"যত আছে বলেছে তত যদি আমাদের হাতে পড়ে আর জীবনে আমাদের অন্য কিছু করতে হবে না।"

চন্দ্রাইয়া হো হো করে হেসে বলল, "ঠিক আছে, এখন যা করতে হবে আমি করব। তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও। যা করবার আমি করব। যে কোন ভাবে ঐ সোনা আমাদের চাই। ওটা পেলে আমাদের আর এই অবস্থা থাকবে না।"

এর তিন দিন পরে আন্না, চন্দ্রাইয়া ও পুল্লাইয়া ঐ খালের ধারে জড়ো হল। বসে চন্দ্রাইয়া বলল, "ঐ বাড়ির সমস্ত গুহ্য খবর বের করে ফেলেছি। বাড়ির কর্তা খুব কড়া লোক। তিন তলার উপরে একটি মাত্র ঘর আছে। ঐ ঘরেই নাকি সিন্দুক আছে। লোকটা বালিশের নিচে নাকি চাবি রাখে। বাড়ির কাউকে রাত্রে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।"

"তাহলে ঐ সোনার ব্যাপারটা কি হল ?"

"শোন না···ঘর তোলার জন্যে নারকেল গাছটা কেটে ফেলেছিল। তারপর মাটি খোঁড়ার সময় সোনা দেখতে পেল। সেই সোনা পাওয়ার পর থেকে সে আর কাউকে বিশ্বাস করে না। এখন প্রশ্ন হল সোনা রেখেছে কোথায় ? কোথায় আর রাখবে, নিশ্চয় সিন্দুকে রেখেছে।"

"এর চেয়ে বেশি খবর আর কি ভাবে পাওয়া যাবে। সোনাটা তো আর ওর নয়, জুজুবুড়োর। ঐ সোনা আমরা আনতে পারলে আমাদের পাপ হবে না।" পুল্লাইয়া বলল।

"আগে শোন, হাঁকপাঁক করলে কোন লাভ হবে না। সময় আর সুযোগ বুঝে কাজ করতে হবে। এত বড় কাজ এর আগে আমরা কোনদিন করিনি। ভবিষ্যতে করতে পারব কি না তাও জানি না। তাই সব দিক ভালভাবে দেখে শুনে আঁটঘাট বেঁধে কাজ করতে হবে। একটু উনিশ-বিশ হলে সব শেষ। তাই আমি ঐ বাড়ির চাকরটাকে হাত করেছি।" চন্দ্রাইয়া বলল।

"এই খেয়েছে।" বলল আন্না।

"কি হল ?" পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করল।

"চাকরটা আজ আমাদের সব খবর জানাল। কিন্তু কাজ হয়ে গেলে সেই হয়ত পুলিশকে সব জানিয়ে রাজসাক্ষী হয়ে যাবে। তখন তো আমাদের সবাইকে···" আন্না বলল।

চন্দ্রাইয়া হো হো করে হেসে বলল, "পেট চালাতে না পেরে তুমি চোর হয়েছ। ধনী হওয়ার আশায় আমি চুরি শুরু করেছি। তুমি জান, আমি এর আগে কত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছি। আমি কি চন্দ্রাইয়া সেজে চুরি করতে যাব যে পুলিশ আমাকে দেখবে আর ঝট করে ধরে ফেলবে। জান, আমি একবার সাধুর বেশ ধরেও কাজ করেছি। পুলিশের হাত দেখে তার অতীতের কথা বলেছি। সে আমার পায়ে প্রণাম করেছে। পুলিশের ঠাকুরদাদাকে ঘুরে আসতে হবে আমাকে চিনতে। শোন অত ভয়ের কিছু নেই। সব কিছু যাতে নিরাপদে হয়ে যায় সেটা দেখার দায়িত্ব আমার। ঐ লোকটা তার স্বামী-ত্যাগী প্রেমিকাকেই বিশ্বাস করে না। যে প্রেমিকার জন্য সে অত সোনা পেল, অত বড় বাড়ি পেল তাকেই যখন বিশ্বাস করে না তখন বুঝতে পারছ লোকটা কি ধরণের। প্রেমিকাকে এখন সে খুব খারাপ অবস্থায় রেখেছে। কথায় কথায় ওকে বলে 'তুমি যখন স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তখন যে কোনদিন আমার প্রতিও করতে পার।' এখন না কি ঐ মেয়েছেলেটা মাঝে মাঝে আড়ালে ভেউ ভেউ করে কাঁদে। 'কেন যে আমার মরণ হয় না' বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। মাঝে মাঝে সে না কি ভয় পায়। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, আমাদের সময় এবং সুযোগ বুঝে কাজটা করতে হবে।"

"অত বড় বাড়িতে কত জন থাকে কে জানে! ঐ বাড়িতে কাজ করা কি সম্ভবপর হবে ?" পুল্লাইয়া বলল।

চন্দ্রাইয়া হেসে বলল, "দেখ, আমাদের কাজ হল পুরুষের কাজ। ভীরুর কাজ নয়। কাপুরুষের কাজ নয়। আকাশ ভেঙ্গে কিছু পড়ে গেলেও যে বলবে ধরতে পারব সেই এই জগতে কিছু কাজের কাজ করতে পারবে। ঐ বাড়িটার দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখেছো ?"

"অনেকবার দেখেছি।"

"বল তো ঐ বাড়ির ছাদে কি ভাবে উঠবে?"

"ওদিকে দরজা, এদিকে দরজা। ওদিকের গলিতে আলো নেই। তবে এদিকে আলো আছে।" পুল্লাইয়া বলল।

"আমি সব প্ল্যান করেছি। প্রথমে ঐ থামের আলো নিভিয়ে দিতে হবে। বাল্ব ভেঙ্গে দিতে হবে। পশ্চিমদিকে তিনতলা থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ার পাইপ নিচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। অন্ধকার রাত্রে ন'টার পরে ঐ পথ দিয়ে কেউ যাতায়াত করে না। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রে সোজা ঐ পাইপ বেয়ে উঠে পড়ে, যা করার তা করে নেমে যেতে হবে। তবে নামতে হবে অন্য দিকের পাইপ বেয়ে। সেদিকে তিনটে পাইপ আছে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।" চন্দ্রাইয়া বলল।

"কেন, যেদিক দিয়ে উঠব সেদিক দিয়ে নামলে কি হয়?"

"কারণ আছে। যেদিক দিয়ে উঠব সেদিক দিয়ে নেমে দেয়াল টপকে যে পথে পড়ব সেখানে পুলিশ মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরি করে। ঝট্ করে লুকোনোর কোন জায়গা নেই। আর অন্য দিক দিয়ে নামলে অনেক সুবিধা আছে। সে পথে পুলিশ যাতায়াত করে না। ঝট্ করে লুকোনোর অনেকগুলো ছোট ছোট ঘরও আছে। আর প্রয়োজন হলে তিনজনে তিনটে পাইপ বেয়ে নেমে যেতে পারব।" চন্দ্রাইয়া বলল।

"যদি দরজা বন্ধ করে দেয়?" পুল্লাইয়া জিজ্ঞেস করল।

"দরজা খোলার দায়িত্ব আমার। তা ছাড়া ঐ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলে সোজা আমরা সমুদ্রের তীরে পৌঁছে যেতে পারব। গ্রীষ্মকালে বালির উপর সেখানে বহু লোক ঘুমোয়। আমরাও ওদের পাশে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করব। যা যা বললাম ঠিকভাবে মনে রেখো। একটু এদিক ওদিক হলেই সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। যেদিন কাজ হবে সেদিন আমি যথা সময়ে ঘরে গিয়ে খবর দিয়ে আসব।" আন্না ও পুল্লাইয়া চন্দ্রাইয়ার কথায় ঘাড় নেড়ে রাজী হল।

অন্ধকার রাত্রি শুরু হল। টানা পনের দিন কেটে গেল। কিন্তু চন্দ্রাইয়া কোন সাড়াশব্দ করল না। পুল্লাইয়া হাঁক পাক করতে লাগল। তার ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে তত তাড়াতাড়ি নবিরি গ্রামে ফিরে যাবে। গ্রামে গিয়ে কি ভাবে কি করবে তারও পরিকল্পনা সে করে ফেলেছিল। পর পর তিনদিন সে কাজে গেল না। রাত্রে ছেলেকে নিয়ে বারান্দায় ঘুমোল। নীলি যথারীতি ঘরে ঘুমোত।

সেদিন ছিল শনিবার। সকাল থেকে পুল্লাইয়ার মন ছটফট করছিল। এত দেরি করাতে চন্দ্রাইয়ার উপর তার রাগ হচ্ছিল। গ্রামে ফিরে গিয়ে সব জানার পর নীলি দুঃখ পেতে পারে। তখন নীলিকে সে কি বলবে তাও মনে মনে ঠিক করে নিল। এতদিনে তার গ্রামেও হয়ত পরিবর্তন এসে গেছে। যাই ঘটুক ছোট্ট এক খণ্ড জমি

কিনে সে দিনরাত পরিশ্রম করবে। তাতে নিজের গ্রামের মাটিতে বসে দুবেলা খেতে পারবে। মনে মনে গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য যত ব্যস্ত হয় চন্দ্রাইয়ার প্রতি তত তার বিরক্তি জাগে। সেদিন রাত্রে বারান্দায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিল। সামনের গাছের ছোট ছোট ডাল হাওয়ায় নড়ছিল। খালের জলের দুর্গন্ধে গোটা তল্লাটে টেকা যাচ্ছিল না। কোন্ এক পাখি ডেকে উঠেছিল। বিশ্রী লেগেছিল সেই ডাক। দূর থেকে ভেসে আসছিল রেলগাড়ির আওয়াজ।

নীলি বাড়িওয়ালীর সঙ্গে ওদের বারান্দায় বসে গল্প করছিল। মল্লু মায়ের পাশে বসে শুনছিল বাড়িওয়ালীর কথা। ওর কথা অনেকক্ষণ শুনে তার হয়ত ভাল লাগল না অথবা সে বুঝতে পারেনি। তাই মল্লু চলে এল তার বাবার কাছে। ছেলের চোখে ঘুম নেই, বাপের তো নেই। পুল্লাইয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী। মল্লু দুপুরে টেনে ঘুমিয়েছিল। তাই তার চোখে ঘুম ছিল না।

স্বামী ঘরে না থাকায় বাড়িওয়ালী, যে একদিন বিড়ালছানা মরে গেছে বলে কেঁদে ভাসিয়েছিল, সে নানা কথা নীলিকে বলতে বলতে নিজের কথায় এল। সে এমন ভাবে বলছিল, তার বলার ভঙ্গী দেখে মনে হল সে যেন নীলিকে তার জীবনের অনেক গোপন কথা বলছে। সে বলে গেল, "জান নীলাম্মা, তোমাকে কি বলব আমার দুঃখের কথা। যেদিন তোমরা এসেছিলে সেদিন তো দেখেছিলে কি ভাবে আমি বুক চাপড়ে কাঁদছিলাম। পোষা বিড়াল মরে গেছে বলে আমি কাঁদছিলাম। আবার নিন্দুকেরা বলে আমি নিজেই নাকি বেড়ালটাকে মেরে ফেলে কেঁদেছি। নিন্দুকেরা আমার সম্পর্কে যে কত কথা বলে, আমি নাকি আসলে কেঁদেছি অন্য কারণে। বিড়াল মরে গেছে নয়···আমার স্বামীকে তো তুমি দেখছ নীলাম্মা। ওর চেয়ে মেয়েছেলে অনেক ভাল। আমার সামনে সে ভেজা বেড়াল হয়ে যায়। কোন কথা বললে মিন্‌মিন্ করে তার জবাব দেয়। তোমার কাছে কি বলব···আমার মনের মত মানুষ সে হল না। তাই মনের মানুষও হতে পারল না। তোমার ঘরে, তোমাদের আগে একটা লোক ভাড়া থাকত। বিয়ে থা করেনি। জোয়ান মদ্দ লোক। যেমন দুহাতে রোজগার করত তেমনি ঢেলে খরচ করত। পেট ভরে খেত। আকণ্ঠ পান করত। কি বলব তার সম্পর্কে নীলাম্মা! এই তল্লাটে সবাই আমাকে ভয় করে। না জানি কেন ওর সামনে আমি কেমন হয়ে যেতাম। আমার সেই দেমাক সেই দাপট কোথায় হারিয়ে যেত। তোমাকেই বলছি, লোকটা মাঝে মাঝে আমাকে মারত। আবার প্রাণভরে আমাকে সুখও দিত। এহেন লোক আমার মরে গেল। ইচ্ছে করল তক্ষুণি আমিও মরে যাই। কিন্তু নীলাম্মা মানুষের বাঁচার স্বাদ যে কেন এত বেশি···মরতে পারলাম না। কিন্তু বুকে দুঃখটা তো ছিল। কি করি, পোষা বিড়ালটাকে দূরে ফেলে এসে 'মরে গেছে' বলে হাউমাউ করে বুক চাপড়ে কেঁদেছি। আমার চোখে কেউ কোন দিন জল দেখেনি নীলাম্মা! তারপর থেকেই আমার সব কেমন হয়ে গেল। ও আমাকে

পাগল করে দিয়েছে। নীলাম্মা! ওর জন্যই আমি পাগলি হয়ে গেছি…”

নীলি কোন কথা না বলে চুপচাপ তার কাহিনী শুনল। ততক্ষণে অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়িওয়ালী উঠতে উঠতে বলল, “তোমার ঘুম পাচ্ছে নীলাম্মা…পাবেই তো… তোমার শরীরটা তো ভারী হয়েছে। যাও ঘুমোও গে।” নীলি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার ঘুম এল না। তার কানে যাচ্ছিল মল্লুর প্রশ্ন। মল্লু একটার পর একটা প্রশ্ন করছে তার বাবাকে। সেই প্রশ্নগুলো শুনতে শুনতে নীলি ঘুমিয়ে পড়ল।

সময় চলে যাচ্ছে। কিন্তু পুল্লাইয়ার চোখে ঘুম নেই। ঐ গাছের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে জুজুবুড়োর তাল তাল সোনা। ঐ গাছের শাখা-প্রশাখার মতই তার আশাও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। সোনার স্বপ্ন দেখতে দেখতে তার চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

এমন সময় দুজন লোক গাছের নিচে দাঁড়াল। ওদের দেখেই পুল্লাইয়া চিনতে পারল। খুব খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে ঝট্ করে পাশে শুইয়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেও দাঁড়িয়ে পড়ল। পুল্লাইয়ার ভীষণ রাগ হল। সে ঐ দুজনকে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করে আবার ছেলেকে বুকে ফেলে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করল।

মল্লুর ছোট্ট হৃদয়ে বাপের এই আচরণের ফলে সন্দেহ দানা বাঁধল। সে বুঝেছিল তার বাবা তাকে সঙ্গে যেতে দেবে না। মনে মনে সে ঠিক করল, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করবে। সেই রাত্রের মত আজও পা টিপে টিপে বাবাকে অনুসরণ করবে। এই কথা ভেবে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে পুল্লাইয়া ছেলেকে পাশে শুইয়ে উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ছেলে একটু চোখ খুলে দেখল। বাপকে দেখতে না পেয়ে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল।

“ঐ তো বাবা! পথের মোড়ে! ঐ তো দুজন লোক।” তিনটি ছায়া মূর্তি এক জায়গায় ঘন হয়ে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে চন্দ্রাইয়া ফিস্‌ফিস করে বলল, “শুধু সে একা ঘরে ঘুমোচ্ছে। দরজাটা খোলা আছে। বাড়ির সবাই গেছে বিয়েতে। সব ঠিক আছে। শুনেছি ওর কাছে পিস্তল আছে। হাজার চোখে তাকিয়ে কাজ করতে হবে। যাওয়ার পথে কোন পুলিশ প্রশ্ন করলে ‘সিনেমা দেখে ফিরছি’ বলতে হবে। কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে ‘সমুদ্রের তীরে ঘুমোতে যাচ্ছি’।” তারপর তিনজনে হাত একটার পর একটা রেখে এক সঙ্গে বলল, “ভগবানের নামে শপথ করছি, আমাদের মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত যে কোন একজন ধরা পড়ি, বাকি দুজনের কথা মরে গেলেও মুখ ফুটে বলব না।” তিনজনের শপথের পালা শেষ হল। চন্দ্রাইয়া আর একটি বিষয়েও বলে দিল, “কেউ ধরা পড়লে অন্যেরা ছুটে গিয়ে তার বাড়িতে বলে আসবে পুলিশ যাই বলুক, যাই করুক বাড়ির লোক যেন পুলিশকে একটি কথা না বলে। আর একটি কথা যে ধরা পড়বে সে যেন কোন ক্রমেই স্বীকার না করে যে সে চুরি করতে ঢুকেছে।”

মল্লু দেখতে পেল তিনটি ছায়া মূর্তি নড়ছে। ওদের অনুসরণ করে মল্লুও বুঝতে পারল তার বাপের পাশে আছে ঐ আন্না আর চন্দ্রাইয়া। মোড় ঘোরার পর আর ওদের দেখা গেল না। সে তাড়াতাড়ি মোড়ে এসে আবার ঐ তিনজনকে দেখতে পেল। মল্লু ওদের দেখলেও ওরা মল্লুকে দেখতে পায়নি। যে পথে ওরা যাচ্ছিল, সে পথে মল্লুও বাপের সঙ্গে অনেক বার গেছে। সে ভাবছিল, "এই তো, এইখানেই তো এই পাড়ার ছেলেরা গুলি খেলে। ইস্কুল তো এই পথেই যেতে হয়।" খালের ধারে নুয়ে হাঁটতে হাঁটতে মল্লু ওদের অনুসরণ করতে লাগল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর মল্লু পরিষ্কার দেখতে পেল একজন লোক, কে যে সে তা বুঝতে পারল না, সাদা দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। মল্লু হাঁ করে সেদিকে তাকিয়েছিল। ব্যাপারটা তার কাছে যেমন রোমাঞ্চকর ছিল তেমনি ছিল রহস্যজনক। তার মনে হল, তাকেও একদিন তার বাপের মত ঐ দেয়াল বেয়ে উঠতে হবে। তক্ষুনি উঠতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু ভয় ছিল তার মনে, "যদি বাবা দেখে ফেলে। সেদিন ইস্টিশনে গেছি বলে বাবা আমাকে কি ভাবে মারল! না বাবা, আর কোন কথা বলব না।"

এমন সময় কুকুরের ডাক শোনা গেল। পাইপ বেয়ে দুজন তার আগেই উঠে গেছে। তৃতীয় জন উঠছিল তখন। কুকুরের ডাক শুনে সে কিছুক্ষণ থেমে আবার উঠতে লাগল।

কুকুরটা জুজুবুড়োর। জুজুবুড়ো কুকুরের পিঠে থাবড়া মেরে বলল, "ঘুমো নারে বাবা!" কিন্তু কুকুর তার কথা শোনেনি। কুকুরের ডাক শুনে জুজুবুড়োর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেখানে আলো ছিল না। জুজুবুড়োর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কুকুরটা এক নাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। তারপর কুকুরটা যেদিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছিল সেদিকে তাকিয়ে জুজুবুড়ো দেখতে পেল পাইপ বেয়ে কে যেন তিনতলায় উঠছে। সে চিৎকার করে ডাকল, "ওরে, শ্রীনি, চোর ঢুকছে রে, চোর! চোর!" চোর চোর শব্দটা জোরে জোরেই বলেছিল সে। ওর ডাক আর কুকুরের ডাক শুনে শ্রীনিবাস রাও উঠে পড়ল। পরক্ষণেই গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ হল।

কয়েক মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কি যেন ঘটে গেল। মল্লুরও ভীষণ ভয় করছিল। সে খালের ধারে আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ঐ পাইপ বেয়ে বাবা নেমে যাবে ভেবে সে হাঁ করে ঐ দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কিছু লোক ছোটাছুটি করছিল। ঐ বাড়ির চারদিকে আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু মল্লু তখনও তার বাবাকে দেখতে পেল না। কয়েকটা গাড়ি এসে থেমে গেল ঐ বাড়ির সামনে। ওর চোখে যত এসব পড়তে লাগল তত সে গুটিয়ে ঐ আবর্জনার মধ্যে, ঐ নরকের জঞ্জালের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে নিচ্ছিল। শুধু তার দুটি চোখ নক্ষত্রের মত জলজ্বল করে মাটি থেকে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। নিজের অজান্তেই সে বলে ফেলল, "বাবা এখনও নামেনি···বাবা কবে নামবে·· বাবা এখানে আসবে কখন···বাবা না এলে আমিও এখান থেকে নড়বো না···এখানেই বসে থাকব।"

বলে মল্লুর কচি মন প্রতিজ্ঞা করল।

অনেকক্ষণ পরে লোকের ভিড় কোলাহল কমে গেল। যারা ছুটে এসেছিল তারা চলে গেল। জুজুবুড়ো কুকুরটাকে কি যেন বলছিল। চোরদের সম্পর্কেও সে নানা কথা বলছিল। কিন্তু কোন কথাই মল্লুর কানে গেল না। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "আমার বাবাকে সেদিন ইস্টিশনে মেরেছিল। এখানেও সেরকম মারছে না তো! বাবাকে মারছে আর আমি এখানে বসে আছি। যাই, যারা মারছে তাদের কামড়ে দি। এখন আমি কি ঐ বাড়ির উপরে উঠতে পারব? উঠলেও যদি একবার বাবা আমাকে দেখে তাহলে কি আস্ত রাখবে?" এই ধরণের কথা বলতে বলতে তার মন ছটফট করতে লাগল। ভোরের হাওয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে মল্লুর চোখ আরও ভার হয়ে আসছিল। একদিকে যেমন ঘুম পাচ্ছিল, অন্যদিকে দুর্গন্ধে মল্লু টিকতে পারছিল না।

দেখতে দেখতে মল্লুর চোখ ভার হয়ে এল। কোনদিকে সাড়াশব্দ নেই। কালো আকাশে দু একটি তারা দেখা যাচ্ছিল। শেষে মল্লু ভাবল, "আচ্ছা বাবা যদি অন্য পথে ঘরে গিয়ে থাকে! ঘরে না যাক জাহাজের মাল নামাতে যেতে পারে!" এই কথা ভেবে সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে যে পথে এসেছিল সেই পথে ছুটে গিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ল। শুলেও তার ঘুম এল না। পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মল্লু।

উনচল্লিশ

নীলি সাত সকালে উঠে মল্লুকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা কোথায়?" মল্লু উঠেই এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের পেছনের দিকে চলে গেল। নীলিও সেখানে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল। ঐ কচি মন হয়ত মিথ্যা কথা বলতে পারছিল না। তা ছাড়া ভয়ও ছিল, তাই সে চুপ করে রইল।

নীলি বার বার প্রশ্ন করেও জবাব না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ভাবল, "সত্যিই মল্লু জানে না। পুল্লাইয়া হয়ত এখনও কাজ করছে। কিছুক্ষণ পরে মল্লু পথে খেলতে খেলতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাবা আসছে কিনা দেখছিল। সূর্যের আলোয় ভরে গেছে গোটা তল্লাট। যে যার কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু মল্লুর কচি মন ছটফট করছিল। কিছুই তার ভাল লাগছিল না। তার মনে একটিই প্রশ্ন, "বাবা, কেন এখনও আসছে না। কি হয়েছে?" সে যত বাপের কথা ভাবতে লাগল তত তার অন্যের উপর রাগ হচ্ছিল। হঠাৎ সে ঘরে ঢুকে লাঠিটা খুঁজল। ঘরের পেছন দিকে গিয়ে বেড়া থেকে একটা কঞ্চি ভেঙ্গে নিল। নীলি মল্লুর হাত ধরে আবার জিজ্ঞেস করল, "কি রে তোর বাবা এখনও ফেরেনি কেন?" মল্লু একটা হাত মুখের উপরে রাখল। পরিষ্কার বোঝা গেল সে কোন কথার জবাব

দেবে না। তার চোখে মুখে ভয় পাওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠল। তার ঐ হাব ভাব দেখে ভয় ঢুকল নীলির মনেও। তার মনে হল কোথাও কিছু হয়েছে। অশান্তি তার মনেও মাথা তুলল।

মায়ের হাতে মার খেয়েও মল্লু হাতের কঞ্চিটা রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলে পরক্ষণেই সেও ছুটে গেল রাস্তায়। সেই কঞ্চি তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল। যে পথে রাত্রে ফিরেছিল সেই পথ ধরেই ছুটল। অন্ধকারে যেখানে লুকিয়েছিল, সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেল। হঠাৎ মল্লু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "এই তো সেই বাড়ি! এই বাড়িতেই তো আমার বাবা উঠেছিল। কিন্তু বাবা গেল কোথায়? নিশ্চয় এই বাড়ির লোক লুকিয়ে রেখেছে আমার বাবাকে।" বলতে বলতে মল্লু জানলা দিয়ে উঁকি মেরে যাকে দেখতে পেল তাকেই কঞ্চি দেখিয়ে বলল, "আমার বাবাকে ফেরত দেবে কিনা বল?"

ঘরের ভেতরে ছিল ঐ বাড়ির চাকর। সে বাচ্চা ছেলের ঐ হাবভাব দেখে বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুটা সে অবাক হল। তার মুখ থেকে কোন কথা শুনতে না পেয়ে মল্লু কঞ্চিটা মাটিতে জোরে ঠুকে চিৎকার করে বলল, "আমার বাবাকে না ছাড়লে সবাইকে এই কঞ্চি দিয়ে সপাং সপাং করে মারব।" বলে জোরে জোরে কঞ্চি দিয়ে মাটিতে মারল।

এমন সময় খাঁকি পোশাক পরা একটি লোককে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চিৎকার করে মল্লু বলল, "হুঁ, আমার বাবাকে ফেরত দাও।" ঐ চাকরটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে খাঁকি পোশাক পরা পুলিশ ইন্‌সপেক্টর কোন কথা বলতে না দিয়ে হেসে তাকে বলল, "আরে, এই ছেলেটাকে তো আমি চিনি। এ লজেন্স খুব ভালবাসে। যাও তো এর জন্য লজেন্স নিয়ে এস।" চাকর যাই বুঝুক, লজেন্স আনতে সে চলে গেল। এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে আরও কয়েকজন খাঁকি পোশাক পরা লোক বেরিয়ে এল।

অত লোককে দেখেও মল্লুর ক্ষোভ কমে যায়নি। সে কটমট করে ঘাড় কাত্‌ করে ওদের দিকে তাকিয়ে কঞ্চি নাড়তে লাগল।

ইন্‌সপেক্টর হাসিমুখে মল্লুকে বলল, "তোমার বাবা তো আসে নি!"

"আসেনি মানে? বাবা রাত্রে আসেনি?"

"দরজা বন্ধ ছিল যে। আসবে কোত্থেকে?"

"আমার বাবা, আরও দুজন দেয়াল বেয়ে তো উঠেছিল। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমার বাবাকে ছেড়ে দাও বলছি। আমার বাবা খুব ভাল লোক।" বলার সময় মল্লুর গলার শিরা-উপশিরাগুলো ফুলে উঠেছিল।

চাকর লজেন্স আনল। ইন্‌সপেক্টর হাসতে হাসতে মল্লুকে বলল, "তোমার বাবাকে ছেড়ে দেব। আগে এগুলো খাও!" বলে তার হাতে লজেন্স দিতেই সে সেগুলো দূরে ছুঁড়ে বলল, "আমি এসব চাই না, আমি বাবাকে চাই।"

"একটা খাও।" ফেলে দেওয়া লজেন্সগুলো কুড়িয়ে এনে হাতে দিলেও সে না খেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমার বাবাকে দেবে কি না বল?" বলতে বলতে ইন্‌সপেক্টরের দিকে কঞ্চিটা ছোঁড়ার মত দেখাল।

ইন্‌সপেক্টর প্রসন্ন বদনে মৃদু ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলল, "ঘরে তো অনেক লোক। নাম না বললে তোমার বাবাকে এনে দেব কি করে?"

"ঠিক দেবে?"

"দেব।"

"আমার বাবার নাম তুমি জানো না? পুল্লাইয়া।"

"বাবার নাম জানলেই তো হবে না, সঙ্গে যে দুজন ছিল ঐ দুজনের নাম না জানলে…"

"বাবার নাম বললে বাবাকে দেব বলেছিলে না?"

"দেব। নিশ্চয় দেব। তবে আমি যে প্রশ্ন করছি সেই সেই প্রশ্নের জবাব দিলে দেব।"

"আগে আমার বাবাকে দেখাও।"

"আমি যা যা জিজ্ঞেস করছি প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দিলে তবে তোমার বাবাকে দেব। না হলে চলে যাও।"

"আমি যাব না। আমার বাবাকে ফেরত দাও তবে আমি যাব।" চিৎকার করে বেত নাড়তে নাড়তে মল্লু বলল।

ইন্‌সপেক্টর চাকরকে বলল, "এই ছেলেটাকে বের করে দাও।" চাকর মল্লুর হাত ধরল। চট্ করে কঞ্চিটা অন্য হাতে নিয়ে চাকরটাকে মারতে যাবে ইন্‌সপেক্টর ঝট্ করে তার হাত ধরে কঞ্চিটা টেনে নিল। মল্লু তৎক্ষণাৎ চাকরের হাত কামড়ে দিতে গেল, কিন্তু পারল না। ওরা ধরাধরি করে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে এসে ছেড়ে দিল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে মল্লু মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আমার বাবাকে ফেরত না দিলে তোমাদের সকলের অবস্থা কি করি দেখ না। আমার বাবাকে বলে সবাইকে ধোলাই দেয়াবো।" এতক্ষণে পুলিস ইন্‌সপেক্টর ভালভাবেই বুঝতে পারল যে ভয় দেখিয়ে মল্লুকে সেখান থেকে সরানো যাবে না। তাই সে কিছুক্ষণ পরে "আমি যা জিজ্ঞেস করেছিলাম তার জবাব দিলে এতক্ষণে আমি তোমার বাবাকে ফিরিয়ে দিতাম। এসো ভেতরে এসো। তোমার বাবাকে দেখে যাবে।" বলার সঙ্গে সঙ্গে মল্লু তিনলাফে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। কথায় কথায় ইন্‌সপেক্টর তার নাম জেনে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "তুমি তো খুব ভাল ছেলে মল্লু। তোমার বাবা, পুল্লাইয়া খুব ভাল লোক। তাই না মল্লু?"

বাপের এই প্রশংসা মল্লুর কচি মনে দোলা সৃষ্টি করল। আনন্দে সে হাসতে হাসতে বলল, "আমার বাবা খুব ভাল লোক।"

মল্লুকে নিয়ে ইন্‌সপেক্টর পায়চারি করতে করতে বলল, "মল্লু, ঐ যে তোমার বাবার সঙ্গে দুজন ছিল ওরা কারা বলতো ? ওদের নাম কি ?"

"আন্না, চন্দাইয়া।"

"ওদের তুমি ভাল করে দেখনি। তাই না ?"

"দেখেছি।"

"কেমন দেখতে বল তো ?"

"একজন ঐ যে ওর মত। আর একজন তোমার মত।" বলে একজন লম্বা একজন বেঁটে বুঝিয়ে দিল। ইন্‌সপেক্টর এই ভাবে অনেকক্ষণ ধরে হাসিয়ে, ভাল কথা বলে আদর করে ওরা কিভাবে পাইপ বেয়ে উঠেছিল তা জেনে নিল। তখন মল্লু যে কোথায় ছিল তাও সে জানাল। তার বাবা যে জাহাজ থেকে মাল নামাতো সেটাও ইন্‌সপেক্টরের অজানা রইল না। কিছুক্ষণ পরে মল্লু আবার বলল, "কই আমার বাবা কোথায় ?"

"দাঁড়াও, আমি তোমার বাবাকে নিয়ে আসছি।" বলে সে ঘরের ভেতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে নতুন একজনকে নিয়ে মল্লুর সামনে এসে বলল, "বিরাট বড় জাহাজ নাকি বন্দরে ভিড়েছে। তোমার বাবা জাহাজ থেকে জিনিস নামাতে ছুটে গেছে। খবর দিয়ে গেছে, 'মল্লু এলে রাত্রে ফিরব বলে' জানিয়ে দিতে। তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও। তোমার বাবা ভাল লোক। বলেছে যখন রাত্রে নিশ্চয় ঘরে ফিরবে।" ইন্‌সপেক্টর এমনভাবে বলল যেন ঐ নতুন লোকটাই পুল্লাইয়ার খবর এনেছে।

মল্লুর কচি মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। মল্লু চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাকে অনুসরণ করল ইন্‌সপেক্টর। দেখে নিল মল্লুর ঘর।

ঘরে ঢুকেই মল্লু মাকে বলল, "মা, বাবা জাহাজে মাল নামাতে গেছে।" সন্ধ্যে পর্যন্ত মল্লু কোথাও গেল না। মাঝে মাঝে সে পথের দিকে তাকাতে লাগল।

সন্ধ্যে হল। অন্ধকারও হয়ে গেল। কিন্তু মল্লুর বাবা ফিরল না। যত অন্ধকার হতে লাগল তত মল্লুর কচি মনে উদ্বেগ বাড়তে লাগল। তার চোখ ফেটে জল আসছিল। নীলিও বার বার পথের দিকে তাকাচ্ছিল। প্রতিবেশীদের কাছে নীলি শুনেছিল কোন্ এক বড়লোকের বাড়িতে নাকি কাল রাত্রে চোর ঢুকেছিল। লোকটা নাকি গুলি চালিয়েছিল। কিন্তু একটিও চোর ধরা পড়েনি। এই কথা শুনে নীলি বলেছিল, "মতিভ্রম আর কাকে বলে। কেনরে বাবা, খেটে খেতে পারিস না। চুরি করে পেট ভরানো। ছি, ছি।"

"ঘরের সমস্ত ধন দৌলত চুরি হয়ে গেলেও নাকি দুঃখ ছিল না। ওরা নাকি ঐ বাড়ির মালিকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তার নাকি এখন মর মর অবস্থা। বাঁচলে ভাগ্যবান বলতে হবে।" প্রতিবেশীরা বলল।

শুনে নীলির মনে হল যেন তার মাথাই কেউ ফাটিয়ে দিয়েছে। সে বলল, "বেচারা, কার মুখ দেখে যে উঠেছিল।"

বাড়িওয়ালী বলল, "ওর বাড়িতে যা আছে তার কাণাকড়িও নাকি ওর নয়। অন্য কাউকে নাকি ঠকিয়ে সে নিয়েছে। ঐ যে কথায় বলে যেভাবে আসে সেভাবে যায়। ওর নাকি পিস্তল আছে। দুটো আওয়াজ করেছিল হাওয়ায়। চোরদের দিকে তাক্ করে মারলে ওরা নাকি মরে যেত।"

পকেটমারের বউ বলল, "শুনেছি লোকটা নাকি খুব খারাপ। খারাপ লোকের শাস্তি হওয়া উচিত।" নীলি বলল, "যাই বল দিদি, লোকটাকে একেবারে খারাপ বলা যায় না। ভাল লোক না হলে কি হাওয়ায় গুলি চালাত? খারাপ লোক হলে চোরদের দিকে তাক করেই গুলি চালাত। লোকটা নিশ্চয়ই ভাল লোক। মাথা ফেটে গেলেও আমার মন বলছে সে নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে।"

এই ধরণের আরও অনেক কথা বলাবলি করছিল। রাত আটটা হয়ে গেল তবু পুল্লাইয়া ঘরে ফিরল না। মল্লু আর পারল না। "বাবা" বলে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। শুধু দুঃখ নয়, বাবার উপর তার রাগও হচ্ছিল। নীলি বুঝতে পারছিল না কি করবে। সেও বারান্দায় ঠায় বসে পথের দিকে তাকিয়ে রইল। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে মা আর ছেলে পাশাপাশি বসে রইল। রাত দশটা হয়ে গেল। লোকজনের যাতায়াত ছিল না। সামনের গাছের ডাল একটু একটু নড়ছিল। মা আর ছেলের মনে ক্রমশ দুঃখ বাড়ছিল।

দূরে একটি মানুষের ছায়া দেখা গেল। দেখেই মল্লু লাফিয়ে উঠে, "ঐ তো বাবা!" বলে ছুটে গেল। বাবার পা জড়িয়ে ধরে, তাকে এক পাও এগোতে না দিয়ে মল্লু তাকে অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে বাপ ছেলেকে কোলে তুলে নিল। গালে মাথায় চুমো খেল। কিন্তু সে হাতটা ঠিক সোজা করতে পারছিল না। হাত দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছিল। মুখের চামড়াও কিছুটা উঠে গিয়েছিল। দু একটি জায়গায় পটি দেওয়া ছিল। মল্লু সেগুলোর দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে হাতটা মুখের উপরে বুলোতে লাগল। অবাক হয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, ব্যথা লাগছে? ওরা তোমাকে মেরেছে?"

শেষের প্রশ্নটি শুনে পুল্লাইয়া হতবাক হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, "কে মারবে?"

"ঐ যে বড় বড় লোকগুলো! চল আজ রাত্রে গিয়ে আমরা ওদের দুম্‌দুম্ করে মেরে আসি।" উৎসাহের সঙ্গে মল্লু বলল।

পুল্লাইয়া কোন কথা বলতে পারল না। তার শরীরটা যেন পাথর হয়ে গেল। ছেলে কিন্তু কথা বলা বন্ধ করেনি। সকালে সে কিভাবে ঐ বাড়ির কাছে গেল তা জানাল। ওরা জাহাজ থেকে মাল নামাতে গেছে বলে যে বলেছিল তাও জানাল।

ওর কথা শুনে পুল্লাইয়ার পা সরছিল না। ঘরে যেতে তার ভয় করছিল। মল্লুকে কোল থেকে নামাতেই চোখের সামনে দেখতে পেল নীলিকে। তার ইচ্ছে করল, সেই মুহূর্তে পেছন ফিরে ছুটে পালাতে। কিন্তু পুল্লাইয়ার মনে হল নীলি যেন দড়ি দিয়ে তাকে ক্রমাগত সামনের দিকে টানছে। তার মাথা টলতে লাগল। ছেলের উপর বিরক্তি জাগল, রাগ হল। নীলি এক পা এক পা করে স্বামীর দিকে আরও এগিয়ে এল।

"ঘরে বলে যেতে পারলে না! ছেলেটা সেই সকাল থেকে এদিক-ওদিক খুঁজছে। আমার ভয় করছিল।"

নীলির কথাগুলো শেষ হতে না হতেই দুদিক থেকে কয়েকটি পায়ের শব্দ শোনা গেল। নীলির কানে ঐ শব্দ যায় নি। পুল্লাইয়া আর এক মুহূর্ত দেরি না করে খালের পাড় দিয়ে দ্রুত পা চালাতে লাগল। ঐ পায়ের শব্দও সেদিকে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকগুলো টর্চ জ্বলে উঠল। অনেকগুলো লাল টুপি পরা পুলিশ চোখে পড়ল। এসব দেখে নীলি অবাক হল। এই সব কিছুই ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের মত লাগছিল নীলির কাছে। তার পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। এমন সময় শুনতে পেল, "ধর, চোর ধর।"

"কার কথা বলছে? কে সেই চোর? আমার সোয়ামী চোর! আমি একটা চোরের বউ! না-না! এসব মিথ্যা। এসব আমার দুঃস্বপ্ন। এটা সত্য নয়..."

যে চোর ধরা পড়েছে তার হাতে হাতকড়া পরাতে নীলি দেখল। চোখ বড় বড় করে দেখল। গোটা তল্লাটের লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। হাতকড়া পরা অবস্থায় এতগুলো লোকের মধ্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল চোর—পুল্লাইয়া। নানা জনের মুখে নানা কথা। প্রতিবেশীরাও তখন পর হয়ে গেল। "অত ভাল লোকের মাথা কি আমার সোয়ামী ফাটিয়েছে!" নীলির মনে বার বার এই প্রশ্ন জাগে।

লোকের কথা নীলি আর নিজের কানে শুনতে পারল না। বুকটা তার ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। তার সমস্ত শরীর টলতে লাগল। সামনের দিকে তার ছুটে পালানোর উপায় নেই। মল্লুও তাকে ধরে রয়েছে। চোরকে নিয়ে পুলিশ এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের দিকে নীলি তাকাতে পারছিল না। তবুও মাঝে মাঝে সে তাকিয়ে দেখছিল। মল্লু আকাশ ফাটিয়ে কাঁদছিল। লোকজনের ভিড় কমে যেতে লাগল। কিন্তু তখনও রাস্তায় হাত-পা ছুঁড়ে মল্লু বুক ফাটিয়ে কাঁদছিল।

অন্ধকার ছিল চারদিকে। সেই অন্ধকারে নীলি নিজের সমস্ত দুঃখের ভার নিয়ে ডুবে গেল। ছেলেকে সে ধরে রাখতে পারছিল না। বাবাকে যেখানে ওরা নিয়ে গেছে মল্লু বার বার সেখানে ছুটে গিয়ে নিজের বাপকে ওদের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে চায়। নীলি তাকে ছাড়বে না সেও ছাড়িয়ে নিতে চায়। অনেকক্ষণ পরে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে গেল। ছেলেকে কোলে তুলে এক-পা এক-পা করে এসে নীলি ঘরের এক কোণে বসে পড়ল।

চল্লিশ

সেই রাত্রে পুল্লাইয়াকে পুলিশ অনেক ভয় দেখালেও সে শুধু একটি কথাই বলেছিল, "আমি কিচ্ছু জানি না।" শেষে তাকে লাঠিপেটা করে সমস্ত শরীর ফুলিয়ে দিলেও সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল একটি কথাও না বলার। বিরক্ত হয়ে, ক্লান্ত হয়ে, পুলিশ পুল্লাইয়াকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লক্ আপে পুরে দিল। সমস্ত শরীর ব্যথায় টন্‌টন্ করলেও পুল্লাইয়ার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। লক্ আপের দরজার লোহার রডে হেলান দিয়ে পুল্লাইয়া বসে রইল। ব্যথায় জর্জরিত হয়ে গোঙ্গাচ্ছিল সে। নিজেকে নিজে সে গালাগাল দিচ্ছিল। বার বার নিজের মাথা চাপড়াল। ভোর রাত্রে বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঐ অল্পক্ষণের ঘুমেই সে অনেক রকমের স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্নেও সে দেখতে পেল পুলিশকে। ঘুম ভাঙ্গার পর তার মনে হল সমস্ত শরীরটা যেন পেকে ঘা হয়ে আছে। নড়তে পারছিল না। আপন মনে বলল, "মল্লু কত কাঁদছে কে জানে! নীলু বাঁচবে কি ভাবে? কোন পথে সে যাবে?"

পুল্লাইয়া দাঁড়াতে পারছিল না। খিদের জ্বালায় তার পেট জ্বলে যাচ্ছিল। তার সমস্ত শরীরটা কে যেন খুঁড়ছিল। যেখানে সেখানে কালশিরে পড়ে গেছে। অনেক জায়গা থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল।

সেদিন পুল্লাইয়াকে সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল।

নীলি অনেক চেষ্টা করেও একটু ঘুমোতে পারেনি। তার জীবনের সমস্ত ঘটনাই মনে পড়ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ভোর রাত্রে মল্লু ঘুমিয়ে পড়েছিল। নীলি ভাবছিল, "তাহলে এতদিন আমার স্বামী রাত্রে চুরি করতে বেরোত। আমার কাছে সে মিথ্যে কথা বলত। ও চাকরি খুঁজে না পেলে আমি এর বাড়ি ওর বাড়ি হাঁড়ি বাসন মেজে দিনরাত খেটে ওকে খাওয়াতাম। সে আমার কাছে লুকিয়ে শেষ পর্যন্ত চুরির কাজে নামল! কপাল যখন মন্দ তখন যে কোন কাজ করলেই বা কি ক্ষতি ছিল! আজ কারও মাথা ফাটালে সেই পাপ তো থেকে যাবে। ঋণী থেকে যেতে হবে। সেই ঋণ এখানে শোধ না করি ওখানে তো শোধ করতে হবে। আমাদের যদি কেউ ঠকায় ঠকাক না। সে আমাদের কাছে ঋণী থাকত। তাই বলে এই পথে নেমে···এত নিচে নেমে টাকা আনতে হবে!"

নীলি এসব কথা ভাবছিল আর কাঁদছিল। "দুঃখে কষ্টে পড়লেই নীলির মনে পড়ে তার দিদিমাকে। দিদিমা মরে যাওয়ার আগে বলেছিল, "সে ওরকম হয়ে যাচ্ছে বলে আমি ওরকম হব কেন? ও ভেঙ্গে পড়লে আমি ভেঙ্গে পড়ব কেন? 'সব হারালে বাঁচা যায়, ধৈর্য হারালে বাঁচা যায় না।' ঠিকই বলেছিল দিদিমা। না আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে।" তারপর নীলি নীলাম্মা দেবীকে স্মরণ করল।

সকালে প্রতিবেশীরা নীলির দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সে একটি সমাজ বহিষ্কৃতা নারী। একটি মেয়েছেলে নীলিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেই ফেলল, "চোরের বউ চোর ছাড়া আর কি হবে!" এক বুড়ো দুবার কেশে নিয়ে বলল, "তা হয় নাকি কখনও। সোয়ামী প্রত্যেক রাত্রে চুরি করবে আর তার ইস্ত্রি জানবে না এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। এরকম লোক পাড়ায় থাকলে যখন তখন যাকে তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।" তার কথার পিঠে আর এক প্রতিবেশিনী বলল, "কর্তা তো হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল এবার দেখতে হবে এ কবে ধরা পড়বে।" পকেটমার সকলের সামনে জোরে জোরে বলল, "এই একজনের জন্য পুলিশ সব সময় আমাদের এই বাড়ির উপর কড়া নজর রাখবে। এদের আর সহ্য করা যায় না।"

সব কথাই নীলির কানে যাচ্ছিল। সে চোখ বুজে বলল, "মা নীলাম্মা, এদের এইসব কথা শুনেও আমি যেন ঠিক থাকি মা! আমি যেন ধৈর্য না হারাই মা!" যে যাই বলুক নীলি মুখ ফুটে একটি কথাও বলেনি। মাঝে মাঝে তার চোখের জল মুছে দিচ্ছিল মল্লু। মুছতে মুছতে সেও "বাবা, বাবা" বলে কেঁদে ফেলছিল।

পুলিশ জোর করে মল্লুকেও নিয়ে গেল। অনেক ভাবে চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারল না। নীলি অনেক চেষ্টা করল মল্লুকে ভোলানোর। কিন্তু কোন লাভ হল না। সে শুধু "বাবা-বাবা" বলে কাঁদছিল। "কাল আবার আনব" বলে নীলি মল্লুকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে ঘরে নিয়ে এল।

সেই ভাবে কাঁদতে কাঁদতে রাত নটার সময় মল্লু ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েটা অনেক আগেই খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। নীলির পেটেও খিদে ছিল। কিন্তু তার খেতে ইচ্ছে করছিল না। ঠায় বারান্দায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। এমন সময় এক সাধু "হরে হরে মাধব মাধব, মা, মাগো" বলতে বলতে আশেপাশের কোন ঘরের সামনে না দাঁড়িয়ে সোজা নীলির সামনে এসে দাঁড়াল। নীলি উঠে ঘরে যা ছিল তার অর্ধেক এনে সাধুর ঝোলায় ঢেলে দিল। তখন সাধু বলল, "খুব কষ্টে আছ, না মা?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"আমি জানি। তোমার স্বামী পুলিশের হাতে পড়ে গেছে। তোমার মন এখন পদ্ম পাতায় জলের মতন চঞ্চল। আমি যা বলছি মা তা যদি শোন তোমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। আমি যা বলছি এটা আমার কথা নয়, স্বয়ং ভগবানের কথা।"

নীলি সাধুর সামনে সবিনয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "কি বলছ বাবা, বল।"

সাধু নিচে বসল। নীলি ওর থেকে একটু দূরে বসল। তখন সাধু ফিসফিস করে বলল, "আমি তোমার কর্তার সঙ্গে দেখা করেছি। পুলিশ তোমাকে যাই জিজ্ঞেস করুক তুমি শুধু বলবে, 'আমি কিছু জানি না।' পুলিশ যেন তোমার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে না পারে। ওরা মারুক ধরুক যাই করুক আমি আশা করছি কাল রাত্রের মধ্যে

তোমার স্বামী ফিরে আসবে। আমি নিশ্চিত, ফিরে আসবে।"

নীলি ঐ সাধুর দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে বলল, "বাবা, তোমরা অনেক বড়। জগৎ সংসারে অনেক কিছু দেখেছ। আমি কিছুই দেখিনি। শুধু আমাদের গ্রাম আর এই শহর দেখেছি। বাবা, তুমি যা বলতে বলছ, কি বলব আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারি, জগৎ সংসারে সকলের চোখে ধুলো দিতে পারি, কিন্তু ঐ ভগবানের চোখে কি ধুলো দিতে পারি বাবা? ন্যায় ন্যায়ই, অন্যায়-অন্যায়ই, ধর্ম-ধর্মই, অধর্ম-অধর্মই। আজকে আমি আমার সোয়ামীর জন্যে অন্যায় কথা বললে ন্যায় কি মরে যাবে বাবা? একদিন না একদিন অন্যায়ের জন্য, এই পাপের ফলে আমার সোয়ামীকে কি ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে না? অমন ভাল লোকটা, গুলি উপরের দিকে না চালিয়ে যদি আমার সোয়ামীর উপর চালাতো তাহলে তো সব শেষ হয়ে যেত বাবা। অত ভাল লোকের বিরুদ্ধে আমাকে অন্যায় কথা বলতে বলছ বাবা?"

সাধু তার কথা শুনে বলল, "অহেতুক কষ্ট ভোগ করতে চাও? মনে রেখ তোমাকে দেখার লোক নেই। শেষে তোমাকে ভিক্ষে করতে হবে। খিদের জ্বালায় মরে যাবে তুমি। তোমার সোয়ামীর কথামত না চললে সে তোমার উপর ভীষণ রেগে যাবে। তুমি তার মন থেকে দূরে সরে যাবে। এসব আমার কথা নয়, তোমার সোয়ামী তোমাকে এসব কথা বলতে বলল। আমার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি।" গম্ভীর স্বরে সাধু ঐ কথাগুলো বলল।

নীলি কোন জবাব দিতে পারল না। পরক্ষণেই তার মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। সেও ধীরে ধীরে পরিষ্কার স্বরে বলল, "বাবা, আজ আমার সোয়ামীর কথায় মিথ্যা কথা বললে, সত্য কি মিথ্যা হয়ে যাবে? একদিন না একদিন সত্য তো প্রকাশ পাবেই। তা যদি না হত তাহলে কি জগৎ সংসার থাকত? বৃষ্টি হত? রোদ উঠত? অন্ধকার, জ্যোৎস্না এসব হত বাবা? এসব কথা তোমাদের মত সাধুকে আর কি বলব বাবা। আমি তো বাবা চোখের মাথা খাইনি। যেটুকু দেখেছি সেটুকু বলছি। আমার কর্তব্য আমি করে যাব বাবা! সত্যের পথে চলব। তাতে আমার চলবে চলবে, না চললে কি আর করব!" বলে নীলি উঠে পড়ল।

সাধু বেশধারী চন্দ্রাইয়া ফিরে যাওয়ার আগে নীলিকে বলল, "অত তাড়ার কিছু নেই। আমি যা বলছি তা ভাল করে ভেবে দেখ। সোয়ামীর যদি ভাল চাও আমি যা বলছি তাই কর। তা না হলে ওর ফাঁসী হয়ে যাবে। ও মরে গেলে তোমাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে।" বলে চন্দ্রাইয়া চলে গেল। সে রাত্রে নীলি ঘুমোতে পারল না।

কত কথা যে সে ভাবল তার ঠিক নেই। অনেক কথা সে মনে মনে বলে যেতে লাগল, "গুড্ডি ভেঙ্কান্না চুরি করেছিল বলে তাকে আমার সোয়ামী দু চোখে দেখতে পারত না। আমার বংশে একটা গৌরব আছে। আমার বাবা একাই একশ ছিল। না খেতে পেয়ে মরে যাব তবু চুরি করতে যাব না। ধর্মশালায় একা অত ঝুঁকি নিয়ে

চোর ধরতে কেন গেল ? সেদিন রাত্রে ইস্টিশনে পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়লে, কৈফিয়ৎ দিয়েছিলে, বাঁচার জন্য পকেট মেরেছি। প্রতিজ্ঞা করেছিলে, "জীবনে আর ওপথে যাবো না।" দেশের বাড়িতে তুমি সব ছেড়ে দিলে কিন্তু ন্যায় আর ধর্ম ছাড়লে না। এহেন লোক তুমি চুরি করেছ ? ওগো এ যে আমি ভাবতে পারছি না। খেটে খুটে শরীরের ঘাম দিয়ে মাটি ভেজাবে বলেছিলে। ঘামে ভেজা মাটিতে চাষ করব বলেছিলে। সেই তুমি চুরি করতে গেছ ? না এ হতে পারে না। তুমি কি সেই, না তুমি অন্য কেউ ? না তুমি নও, তুমি চোর নও। তুমি চুরি করতে পারো না !"

ঠিক সেই সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল। "ঐ তো! আমার সোয়ামী আসছে। চুরি করলে কি পুলিশ আমার সোয়ামীকে ছেড়ে দিত ?"···অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও ঐ পায়ের শব্দ আর কাছে এল না দূরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আগের রাত্রের ঘটনা নীলির চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে বলতে লাগল, "কিছু একটা না থাকলে পুলিশকে আসতে দেখে সে ছুটে পালাবে কেন ? মাথা নিচু করে হাঁটল কেন ? পুলিশ ধরার আগেই তার গা বেয়ে রক্ত ঝরছিল কেন ? কিছু একটা সে দলে পড়ে করেছে। তা না হলে এমনি এমনি পুলিশ নিয়ে যাবে ? নবিরি গ্রামে পুলিশ ওকে নিয়ে গেছিল, এমনি তো নয়, কারণ ছিল। কিছু একটা সে করেছে। না করলে সাধুর মাধ্যমে খবর পাঠাল কেন ? আর আমায় কথায় কি যাবে আসবে। আমি বললেই পুলিশ ওকে ছেড়ে দেবে। ও ছাড়া আর আমার এ জগতে কে আছে। ওর জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। আমার সব যাক ও বেঁচে থাকুক, এই তো আমি চাই।"

এইভাবে অনেকক্ষণ তার মনে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলছিল। ভোররাত্রে নীলি আপনমনে বলল, "যে কোন মিথ্যা কথা বলে আমি পুলিশের কবল থেকে সোয়ামীকে ছাড়িয়ে আনব। কিন্তু ভালমন্দ না ভেবে চোখ কান বুজে সোয়ামীর পক্ষে কথা বললে কি সত্য ঢাকা পড়বে! সত্য সত্যই, মিথ্যা মিথ্যাই থাকবে। ন্যায়ের জয় হবে অন্যায়ের নয়। না আমি সত্য কথাই বলব। ভগবান আছেন। আমার স্বামী যাই বলুক, আমার ছেলেমেয়ে যাই বলুক ওদের অবস্থা যাই হোক আমি সত্য কথাই বলব। তাতে যদি আমি খেতে না পাই···খিদের জ্বালায় যদি আমাকে কাঁদতে হয় তাতেও আমার মনে সুখ থাকবে। মনে অশান্তি হবে না। আমি সত্য কথাই বলব।" নীলি যেন সিদ্ধান্ত নিল।

তার পরের দিন পুলিশ এসে নীলি ও মল্লুকে থানায় নিয়ে গেল। মল্লুর সামনে দুজনকে দাঁড় করিয়ে সেদিন রাত্রে পুল্লাইয়ার সঙ্গে কে কে ছিল চিনতে বলল। মল্লু রেগে গিয়ে বলল, "আমি কিচ্ছু বলব না।" ওর ধারণা ঐ সব পুলিশগুলোই তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। নীলি ছেলেকে বুঝিয়ে বলল, অনেক ভাবে বুঝিয়ে বললেও ঐ দুজনের কাউকে চিনি না বলে দিল।

এতক্ষণ পরে পুলিশ ইন্সপেক্টর নিজের বুদ্ধির খেলা শুরু করল। একটি ভেঁপু মল্লুর

হাতে দিয়ে বলল, "তুমি এই ভেঁপু বাজাতে পার ?" ইন্‌সপেক্টর নিজে ভেঁপু বাজিয়ে মল্লুর হাতে দিল। মল্লু তার চেয়ে জোরে ভেঁপু বাজিয়ে শোনাল। "লজেন্স আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি খেতে পার ?" বলে ইন্‌সপেক্টর নিজে দুটো লজেন্স নিল ও মল্লুর হাতে দুটো দিল। মল্লু লজেন্স নিয়ে চোখের পলকে শেষ করে ফেলল। তারপর সে বলল, "দেখলে তো তোমার বাবা কি করেছে। তোমার বাবা কিন্তু চোর নয়। তোমার বাবাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ছেড়ে দেওয়ার পরে ও কি করল জান ? সোজা ঐ দুজনের বাড়ি চলে গেল। তোমার বাবা তো ঐ দুজনের বাড়ি গেল কিন্তু তুমি ঐ দুজনের বাড়ি চেন ?"

"আন্নার বাড়ি চিনি।"

"চন্দ্রাইয়ার বাড়ি চেন না ?"

"উঁহু।"

"তোমার বাবার সঙ্গে কোথায় কোথায় যেতে তোমার মনে আছে ?"

"হ্যাঁ।" মল্লুর বলার সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌সপেক্টর তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চায়ের দোকানদারকে দু ধমক দিতেই সে বলল, "বাবু, এই ছেলেটার সঙ্গে দুজন আসত। ওদের মধ্যে একজনের বাড়ি চিনি।" বলে সে দূর থেকে আন্নার বাড়ি দেখিয়ে দিল।

"আর একজনের বাড়ি চেন না ? ঠিক করে বল না হলে তোমাকে হাজতে পুরব।"

চায়ের দোকানদার জোড় হাত করে বলল, "সত্যি বলছি জানি না। ইন্‌সপেক্টর আন্নার ঘর দেখে নিয়ে মল্লুকে বলল, "এখানে তো তোমার বাবা আসেনি, মনে হচ্ছে চন্দ্রাইয়ার বাড়িতে তোমার বাবা গেছে।" বলে মল্লুকে নিয়ে ইন্‌সপেক্টর থানায় ফিরল।

ওদের ফেরা পর্যন্ত নীলি সেখানেই বসে ছিল। নীলির দিকে তাকিয়ে, না জানি কেন, ইন্‌সপেক্টরের মনে করুণা জাগল। ওকে যে সব প্রশ্নগুলো করছিল নীলি তার জবাব যেভাবে দিচ্ছিল, তাতে তার মনে নীলির প্রতি আরও দরদ বাড়ল। একটি কথাও সে মিথ্যা বলছে বলে তার মনে হল না। নীলিকে যে কোন ভাবে সাহায্য করতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু ইন্‌সপেক্টরের চাকরি করতে গেলে করুণা দয়া মায়া হয়ত সরিয়ে রাখতে হয়। তাই নীলি যা বলছিল তাই সে লিখে নিল।

যেতে যেতে নীলি ফিরে এসে বলল, "বাবু, যার মাথা ফেটে গিয়েছিল সেই দয়ালু মানুষটি কেমন আছে বাবু ?"

"ওর ফাঁড়া কেটে গেছে। বেঁচে যাবে।"

"ভগবান ওকে বাঁচাক বাবু। ভালো লোককে ভগবান নিশ্চয়ই দেখবে।"

ইন্‌সপেক্টর মাথা তুলে নীলির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঐ লোকটা ভালো ? ওর টাকা-পয়সা দেখে বলছ নাকি ?"

ভাল লোক না হলে চোরের উপরেই তো গুলি চালাত বাবু।" বলে নীলি ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে গেল। ফেরার পথে সে কয়েকটা বাড়িতে কাজের সন্ধান করল। ওদের

কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী বলল।

এক বাড়ির বড় গিন্নী খুব অল্প টাকায় তাকে রাখতে রাজী হল। লম্বা একটা কাজের ফিরিস্তি দিল। ঐ গিন্নীর গলা শুনে নীলির মনে হল ওর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। সে যা বলল নীলি তাই করতে রাজী হয়ে গেল। তক্ষুনি তাকে কাজে হাত দিতে হল। কাজ সেরে ফেরার সময় অন্য এক ঝি নীলিকে বলল, "তুমি আর বাড়ি পেলে না ? এদের বাড়িতে কাজ ধরেছ ?"

"কি করব মা !"

"ওরা আবার মানুষ নাকি ! দু পয়সা দিয়ে গায়ের রক্ত শুষে নেবে। ওদের বাড়িতে কোন ঝি টেঁকে না। প্রত্যেক মাসে ওদের বাড়ির ঝি পালিয়ে যায়। যারা একবার ওদের কথা শুনেছে তারা ওদের বাড়ির ত্রিসীমানায় যায় না।"

"কি করব মা। কষ্টের দিন যখন এসেছে কষ্ট করতেই হবে।" বলে নীলি ঘরের দিকে পা বাড়াল।

একচল্লিশ

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিচার শুরু হল। তিনজন আসামীকে একদিকে দাঁড় করানো হল। তিন জনেই নিজেকে নির্দোষ বলে জানাল।

তারপর পাবলিক প্রসিকিউটরের সাক্ষীর বক্তব্য পেশ করার পালা। প্রথম সাক্ষী হিসেবে নীলাম্মার ডাক পড়ল। নীলি কোর্টের বাইরে গাছের নিচে মেয়ে আর মল্লুকে বসিয়ে রেখে সেখানে এল। ছেঁড়া শাড়িগুলোর মধ্যে যেটি ভাল ছিল সেটি পরে সে কোর্টে হাজির হল। সমস্ত শরীরটা যত্ন করে ঢেকে নিয়ে কোর্টে দাঁড়াল। ভীষণ রোগা দেখাচ্ছিল তাকে। তার মুখে একটুও রক্ত আছে বলে মনে হল না। মাথার খোপাটা কাকের বাসা হয়েছিল।

মাথা নিচু করে কাঠগড়ার দাঁড়াবার সময় তার পা দুটো ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে ধরে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাতেই তার চোখ পড়ল স্বামীর দিকে। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়েছিল। মুহূর্তে তার ভেতরটা কেমন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে তার স্বামীর দিকে তাকাতে তার লজ্জা করল। চোখ ফেটে তার জল আসার উপক্রম হল। তখুনি তার মনে পড়ে গেল দিদিমার কথা। সে ধৈর্য ধরে সোজা হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

বউ আর ছেলের বক্তব্যের ভিত্তিতেই যে আসামীদের দোষী প্রমাণ করা যায় এটাই পাবলিক প্রসিকিউটারের বিশ্বাস। সরকারী উকিল দাঁড়াল। পুল্লাইয়ার ধারণা ছিল যেখানে যত খরচ করার চন্দ্রাইয়া করেছে। সে নিশ্চিত ছিল ছাড়া পাবে। এই বিশ্বাস

নিয়ে পুল্লাইয়া দাঁড়িয়ে ছিল।

একজন এগিয়ে এসে নীলিকে বলল, "মা, শপথ করে বল, আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, যাহা বলিব সত্য বলিব···"

নীলি বাধা দিয়ে বলল, "ভগবান সব সময় আছে বাবা। তাকে ছাড়া আমরা কথা বলতে পারি নাকি!"

"এটাই নিয়ম মা!"

তারপর নীলি ঐ লোকটা যেভাবে শপথ করতে বলল, সেভাবে শপথ করল। কাঠ গড়ায় দাঁড়ানোর সময় যে ভয় সঙ্কোচ ছিল তা এখন কমে গেছে। কথাগুলো পরিষ্কার বেরোচ্ছে গলা থেকে। ভয়ের ভাব কেটে গেছে বলা চলে।

এ্যসিটেণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটার তাকে সওয়াল করা শুরু করল।

"তোমার নাম?"

"নীলাম্মা।"

"তোমার স্বামীর নাম?"

"পুল্লাইয়া।"

"এই তিন জনের মধ্যে তোমার স্বামীকে চিনতে পার?"

"পারি। মাঝে আছে।"

তারপরের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব নীলি ঠিক এইভাবেই দিয়ে গেল। পুল্লাইয়ার চোখ জলে যাচ্ছিল। সে ভীষণ রেগে যাচ্ছিল। দুঃখে ফেটে যাচ্ছিল তার বুক।

নীলি সব বলল। স্টেশনে পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়া থেকে; রাত্রে জাহাজ থেকে মাল নামানো; হঠাৎ একদিন নতুন শাড়ি কিনে আনা; দেশের বাড়িতে প্রক্যুর-মেণ্টের ধান দেওয়ার ব্যাপার; এই ঘটনা ঘটার রাত্রে, সকালে ছেলে যা করেছিল তা সব কিছু, একটুও না ঢেকে নীলি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলে দিল। অন্য দুজনকে সে কোনদিন দেখেনি এবং ওরা তার ঘরে কোনদিন আসেনি বলে জানিয়ে দিল।

এই সব সত্য কথাগুলো বলার সময় তার গলা পরিষ্কার ছিল। এমন ভাবে সে একটার পর একটা ঘটনা বলে গেল যে তার বলার পর উকিলের আর কোন প্রশ্ন ছিল না। তবু দাঁড়িয়েছে যখন কিছু প্রশ্ন না করেই বা তার ভাল লাগবে কেন। তাই সে নীলিকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোমার স্বামীর বুদ্ধিসুদ্ধি কি রকম আছে?"

নীলি কোন কথা বলল না।

"ঠিক আছে। লোকে তোমার স্বামীর সম্পর্কে কি ধরণের কথা বলত?"

"আমার দিদিমা মরার আগে বলেছিল হাত পুড়ে গেছে বলে সে যদি ভাতের হাঁড়িটা ছেড়ে দেয় তুমি কিন্তু ছেড়ে দিও না।···এই শহরে আসার পর ওর সম্পর্কে কে যে কি বলেছে জানি না বাবু।"

"এই ধরণের লোকের উপর, মানে তোমার স্বামীর উপর তোমার রাগ ছিল না?"

"রেগে গিয়ে কাকে ভাল করা যায় বাবু! যে রেগে যায় তারই তো ক্ষতি হয় বাবু…"

"তোমার স্বামী তোমার উপরে চটেমটে যেত ? যখন চটতো তখন কি তার উপর রাগ হয়নি ? হয়েছে নিশ্চয়। কি বল ?"

"এই ধরণের কথা কেন বলছেন বাবু!"

"তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে তোমাদের ভেতর বনিবনা ছিল না। ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকত।"

"না। আমি তা স্বীকার করি না। আমার স্বামী আমাকে কখনও গালাগাল করেনি। কোনদিন মারেনি। আপনারা ওকে যাই বলুন আমি ওকে চিনি জানি। দেশের গ্রামে কোন্‌কালে গুড্ডি ভেঙ্কান্না চুরি করেছিল বলে এ তাকে সব সময় ঘৃণা করত। ঐ রকম লোক যে কেন এরকম হয়ে গেল আমি তা বুঝতে পারছি না। ওকে বিশ্বাস করি। তাই ও যা বলেছে তাতে আমার মনে সন্দেহ জাগেনি। গাঁয়ের বাড়িতেই আমি বাড়ি বাড়ি কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও রাজী হয় নি। কাজ করতে পারলে কোন রকমে বেঁচে থাকতাম। এই পাপ পথে আজ ওকে পা বাড়াতে হতো না।"

পুল্লাইয়া ভীষণ রেগে যাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, যার জন্যে করেছি চুরি সেই বলে চোর। তার ইচ্ছে করছিল ধমক দিয়ে নীলিকে থামানোর। কিন্তু সে আগেই জেনেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে ওভাবে কথা বলা যায় না। নীলিকে প্রশ্ন করার পালা শেষ হল। মল্লুকে কোর্টে হাজির করার আগে প্রসিকিউটর ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দিল যে মল্লু বাপ বলতে অজ্ঞান। তাই সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাপকে দেখতে পেলে কেঁদে ভাসাবে। বাপের কোলে উঠতে চাইবে। বাপের কাছ থেকে তাকে ছাড়ানো কষ্ট-সাধ্য হবে। সবচেয়ে বড় কথা তার কাছ থেকে কোন কথা বের করা যাবে না। তাই মল্লুর সাক্ষী নেওয়ার সময় আসামী পুল্লাইয়াকে যেন আড়ালে রাখা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট এই আবেদনে রাজী হল।

মল্লু কাঠগড়ায় দাঁড়াল। তার মাথাটা একটু জেগে আছে। বাকি সবটাই কাঠ-গড়ায় ঢেকে আছে। হাতে ছোট ছড়ি ছিল। বার বার বলা সত্ত্বেও মল্লু ঐ ছড়িটা ফেলে দেয় নি। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঐ ছড়িটা একবার এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে নিল। প্রসিকিউটর হেসে মল্লুকে বলল, "বা, তুমি তো লক্ষ্মী ছেলে। তোমার নাম কি ?"

"মল্লু।"

"তোমার বাবার নাম ?"

মল্লু তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমার বাবার নাম জানো না ? পুল্লাইয়া।"

"বা, ভাল নাম তো!"

"আমার বাবা খুব ভাল। আমার বাবার নামও খুব ভাল। তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম গোবিন্দ রাও।"

তেতো খাওয়ার মত মুখ করে মল্লু বলল, "এ্যা কি নাম! এত্ত বড়!"

"ঠিক আছে, নামটা ছোট করে নেব। এবার বলতো, সেদিন রাত্রে তুমি আর তোমার বাবা তো বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলে…"

"আমি সব সময় বাবার কাছে ঘুমোই। বাবার বুকের উপর না শুলে আমার ঘুমই আসে না। খুব ভাল লাগে আমার। বাবার ভাল লাগে আমারও ভাল লাগে।" বলে মল্লু কি ভাবে হাসতে লাগল।

"বা, তাহলে বল দিকি সেদিন কি হয়েছিল?"

"কোন্‌দিন?"

"তোমার বাবা যেদিন দেয়াল বেয়ে উঠেছিল, সেই—সেই রাত্রে। বল!"

"ওখানে বলেছিলাম তো…এখানেও বলতে হবে?"

"এই দেখ না এরা সব নাকি শোনেনি। তোমার মুখে শুনতে চায়। তুমি তো ভাল ছেলে। আর একবার বলে দাও।"

মল্লু পায়ের নিচে বেতটা রেখে কাঠগড়ার কাঠটা ধরে সকলের দিকে একবার দেখে নিল। তার জামার দুই কাঁধ ছেঁড়া। মুখের উপরে চুল পড়ছিল। দাঁতগুলো ইঁদুরের দাঁতের মত সরু। কথাগুলো মিষ্টি…

"সেদিন রাত্রে মার পাশে বসেছিলাম। মা বসেছিল পাশের ঘরের বউয়ের পাশে। তারপর বাবার কাছে এসে…গান গেয়েছি। দুপুরে ঘুমোইনি তো—আমার ঘুম আসছিল না…বাবাও ঘুমোয়নি…অন্ধকার…গুটগুটে অন্ধকার…কখন ঘুমিয়ে পড়েছি…বাবা পাশে শুইয়ে দিল আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল।…দাঁড়িয়ে পড়লাম…বাবা আবার বুকের উপরে নিয়ে হাত চাপড়াতে লাগল…বাবা তো আমাকে যেতে দেবে না…বাবা যে কি করে দেখতে হবে তো…আমিও মিথ্যে মিথ্যে ঘুমিয়েছিলাম…তারপর বাবা চলে গেল…আমিও পিছু পিছু গেলাম।"

"তোমার বাবার সঙ্গে আরও দুজন ছিল তো? ওদের নাম জান?"

"আন্না—চন্দ্রাইয়া।"

"ঐ দুজন? বলে ঐ দুজনের দিকে তর্জনী তুলে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই মল্লু আন্নাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি তো আমার বাবাকে বণ্ডা চা খাওয়াতে?"

তখন প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করল, "ভাল কথা, তুমি তো ওদের পেছনে গেলে, তারপর কি হল?"

"কি হল?" কিছুক্ষণ ভেবে মল্লু বলল, "ওদের পেছনে পেছনে গেলাম। থামের আড়ালে দাঁড়ালাম। বাবা দেখলে মারবে তো? তাই পা টিপে টিপে, আস্তে আস্তে ওদের পেছনে পেছনে গেলাম। ওরা উঠতে লাগল। আমি উঠলে কত ভাল হত। উঠলে তো বাবা মারবে। বাবার রাগ হবে তো। কুকুর ঘেউ ঘেউ করল। ভয়

করল। কি লোক! ঐ নোংরা জায়গায় লুকোলাম। দেখছি, বাবা আসবে, বাবা আসবে, বাবা এল না।" বলে মল্লু তার পরের দিন যা যা ঘটেছিল সব থেমে থেমে বলল। রাত্রে বাপের সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত সব ভাল ভাবেই বলে গেল। তারপর তার গলা দুঃখে ভার হয়ে গেল।

মল্লু বলল, "পুলিশ বাবাকে নিয়ে গেল। কত কেঁদেছি। বাবা এল না! বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না! এখানে আছে—সেখানে আছে—ওখানে আছে বলে। আসুক বাবা···আমার কাছে মিথ্যা কথা। বাবাকে বলব ওদের দুম্‌দুম্ করে মারতে। আমার বাবা খুব ভাল লোক। মা জানে না বাবা কোথায়। মা বলে কোথায় গেছে। বাবা কোথায় যাবে? গেলে আমাকে নিত না। আমাকে ছেড়ে বাবা কোথাও যায় না। আমাকে ছেড়ে বাবা থাকতেই পারে না···" বলতে বলতে মল্লুর গলা রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে ফুলে উঠছিল। পায়ের তলা থেকে বেত তুলে কাঠগড়ার উপরে তিন চারবার মেরে চিৎকার করে বলল, "পুলিশ তোমরা আমার বাবাকে নিয়ে গেছ। ফেরত দাও। না হলে এই বেত দিয়ে সপাং সপাং করে মারব। তোমাদের সবাইকে কামড়ে দেব। আমার বাবাকে এনে দাও···আমার বাবা কোথায়?" বলে হাউমাউ করে মল্লু কাঁদতে লাগল। আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল পুল্লাইয়া। আর সে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মুহূর্তের জন্য সে নিয়ম শৃঙ্খলা, আইন কানুন সব ভুলে গেল। "মল্লু, এই যে বাবা" বলে পুল্লাইয়া চিৎকার করে উঠতেই মল্লু "বাবা" বলে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে তার কোলে উঠতে গেল।

কোর্টের লোক মল্লুকে ধরে নিয়ে গেল বাইরে। পুলিশ নিয়ে গেল পুল্লাইয়াকে।

বিয়াল্লিশ

কোর্ট থেকে বেরিয়ে কয়েদ থানায় ঢুকতে সন্ধ্যে হয়ে গেল পুল্লাইয়ার। এসেই এক কোণে বসে পড়ল সে। তার মন রাগে জ্বলছিল। সামনের ঐ লোহার গরাদগুলো না থাকলে সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে বউয়ের গলা টিপে শেষ করে দিত।

স্থান কাল পাত্র ভুলেই যেন সে বলে যেতে লাগল, "ওর জন্যই তো এত কাণ্ড হল। আমার মল্লুকে ও যদি বুঝিয়ে বলত, 'তোর বাবা বারণ করেছে, কোন কথা বলবি না!' তাহলে কি আমার মল্লু কোর্টে এই ধরণের কথা বলত! বউ হয়ে ও আমার বিরুদ্ধে যা করেছে শত্রুও তা করে না। ওর জন্যই আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আদেম্মা কত করে বারণ করেছিল, তার কথা শুনিনি। মহাজনের কথাই ফলল। তার কথা মতই এ আমাকে ধোঁকা দিল। লোককে খাইয়ে আর ভিক্ষে দিয়ে আমার ঘর ফাঁকা করে দিয়েছে। রাজুর কাছে আমাকে মাথা নোয়াতে বলেছে। ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে আমার

একেবারে শেষ করে দিয়েছে। আগে আমি ওকে বুঝতে পারিনি। জিদের বশে আমি ওকে বিয়ে করেছি। না হলে ওকে বিয়ে করতে কে যেত। কেউ তো ওকে বিয়ে করতে এগিয়ে যায়নি। করিনি করিনি শেষে কিনা এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করলাম! কত ধনী পরিবারের মেয়ে ছিল ঐ রম্ভা। কত ধন দৌলত পেতাম ওকে বিয়ে করে। অমন সুন্দর নদী আর গাছে ভরা গ্রাম ছেড়ে আজ আমাকে এখানে আসতে হত? এখানে মেঝের উপর গড়াগড়ি খেতে হত? এই বউটাই তো সর্বনাশের মূল। একে গালাগাল দিলে, মারলে এমন কি মেরে ফেললেও আমার পাপ হবে না।" বলতে বলতে সে মেঝেতে শুয়ে ছটফট করতে লাগল। দুঃখে তার বুক ভরে গিয়েছিল। তাই সে রাত্রে কিছু খেয়ে পেট ভরায় নি। অন্ধকার আরও ঘন হল।

মাঝে মাঝে সে কয়েদঘরে পায়চারি করতে লাগল। তার কথাগুলো মাঝে মাঝে জোরেও শোনা যাচ্ছিল। তিন তিনবার সে ঐ লোহার রডগুলোকে বেঁকিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। কয়েদঘরের দরজাটা কি ভাবে ভাঙ্গা যায় তাই সে ভাবছিল।

পাশেই ছিল আর এক আসামী। সে অনেকক্ষণ ধরে পুল্লাইয়াকে লক্ষ্য করে বলল, "কি হল বাবা?"

"যা হল সব ওর জন্যই হল। জেল ফটক ভাঙ্গতে পারলে সোজা গিয়ে ওর গলায় একটা কোপ মেরে দিয়ে আসতাম।"

"কাকে বাবা?"

"ঐ ওকে··ঐ ছোট লোকের মেয়েটাকে···ও নাকি আমার বউ···জানেন সারা গাঁয়ের লোক আমায় বারণ করেছিল। তবুও আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম। আর আজ সে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে···"পুল্লাইয়ার রাগ বাড়তে বাড়তে কান্নায় রূপান্তরিত হল। ঝরঝর করে তার চোখ দিয়ে জল বেরোতে লাগল। সে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার মল্লুকে সে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে···আমার এই ছোট্ট বাবাটির জন্যে কাঁদতে কাঁদতে আমার কি যে অবস্থা হবে তা জানি না।"

কাঁদতে কাঁদতে পুল্লাইয়া ঐ লোকটার কাছে চলে গেল। সে পুল্লাইয়ার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে লোকটা নিজের জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পুল্লাইয়ার সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছিল। শিরা উপশিরায় অসহ্য যন্ত্রণা। তার সমস্ত শরীরটা ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছিল। ভাবতে ভাবতে সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। চোখের পাতা এক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্নে দেখল কোর্ট, বউ, ছেলে··· তার জীবনের সমস্ত দুঃখের ঘটনাগুলো ছায়া-ছবির মত দেখা দিতে লাগল। হঠাৎ এক সময় স্বপ্ন ভঙ্গ হল। চোখ কচলে এদিক-ওদিক তাকাল। কয়েদের দরজায় দেখতে পেল জওয়ান। এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে। বারান্দার

আলো তার কোঠরে এক ফালি পড়ছিল। পুল্লাইয়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে, তাকে যে লোকটা সান্ত্বনা দিয়েছিল মনে মনে তাকে খুঁজল।

তার হঠাৎ মনে হল জুজুবুড়ো সামনে দাঁড়িয়ে আছে! ঐ না-ঘুম-না-জাগরণের মাঝে তার মনে হল জুজুবুড়ো নয়, রামু! কিন্তু রামু তো অনেকদিন আগেই মারা গেছে। তাহলে কে সে? জুজুবুড়ো! হ্যাঁ তাইত! কিন্তু জুজুবুড়ো এখানে আসবে কোথেকে। কিন্তু ওকে কয়েদে ঢোকাবে কেন? তাহলে এখানে এল কি করে জুজুবুড়ো?

ঐ লোকটা পুল্লাইয়াকে প্রশ্ন করল, "মন একটু হাল্কা হয়েছে বাবা?"

তক্ষুনি জওয়ান তেড়ে না এলেও "হুঁ" বলে ধমক দিল সে। আবার আগের মত ঐ জওয়ান এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছিল আর ওদিক থেকে এদিকে ফিরছিল। মাঝে মাঝে সে এক কোণে বসেও পড়ছিল। রাত বাড়লেও পুল্লাইয়ার ঘুম এলো না। তার সঙ্গে যে কয়েদী ছিল সেও ঘুমোয় নি। কিছুক্ষণ পরে ঐ কয়েদী আবার প্রশ্ন করল, "ঘুম আসছে না বাবা?"

তার গলা কানে যেতেই পুল্লাইয়ার শরীর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনে হল ঐ ধরণের স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বর সে এর আগেও কোথায় যেন শুনতে পেয়েছে। সেই গলা তার রাগের আগুনে যেন জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে পুল্লাইয়া উঠে বসল। ঐ কয়েদী কাছে এসে বলল, "তোমার আজ এই দশা কেন হল বাবা!" এই প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুল্লাইয়ার ইচ্ছে করল তার জীবনের সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে। তার নাম ধাম না জানলেও সে ছাড়া তার দুঃখ বোঝার লোক আর সেখানে কে আছে। পুল্লাইয়া তার জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনা ঐ কয়েদীকে শোনাল। সব কথা শুনে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। পুল্লাইয়া তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে বলল, "অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এবার ঘুমিয়ে পড় বাবা।" বলে সে নিজের জায়গায় চলে গেল।

তার যাওয়ার পরেও পুল্লাইয়া অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিল। লোকটার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে করছিল তার। পরে সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর রাত্রে পুল্লাইয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। গভীর ঘুম তার চোখে ছিল না। ঘুম ভাঙ্গলো স্বপ্নের মাঝখানে। নীলাম্মা মন্দির সে স্বপ্ন দেখছিল···রামুর উপর নীলাম্মা দেবী ভর করেছে···রামু হাত পা ছুঁড়ে কি যেন বলছে···এমন সময় "বাবা" বলে লোকটা পুল্লাইয়াকে ডাকল। সে তার কাছে গেল। লোকটা এমন ভাবে পুল্লাইয়ার দিকে তাকাচ্ছিল যেন তার কোন বক্তব্য আছে।

কাছে যেতেই সে পুল্লাইয়ার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "বাবা, আমারও অন্যের উপর রাগ হত। এক একটা লোককে অসহ্য লাগত। যখন-তখন যার তার উপর চটে যেতাম। তখন আমার নিজের বলতে কিছু সম্পদ ছিল। কিন্তু পারলাম না মানুষের

মত বাঁচতে। কোত্থেকে যে কি ঘটে গেল···যাক এখন আমার নিজের বলতে কিছু নেই। তবুও আমার লোক সমাজে চলাফেরা করতে, কাজ করতে, বাঁচতে, ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আলো, বাতাস, রোদ, জল সব আবার বেশি করে পাব। আসলে জান ভাই, প্রত্যেক মানুষের একটা ধর্ম থাকা চাই। নীতি-ধর্ম না থাকলে অহেতুক অন্যের উপর বার বার দোষ চাপাতে ইচ্ছে করবে। সত্যি কথা বলতে কি জান ভাই, আমার মনে হয় তোমাকে কেউ ধোঁকা দেয়নি। মিথ্যা কথা বলে তুমি নিজেকেই নিজে ধোঁকা দিয়েছ। এখন তোমার উপর গ্রহ চেপেছে। ধৈর্য ধরে থাক।"

সে পুল্লাইয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে চিবুক ধরে বলল, "তোমার বউ সত্য কথা বলেছে এতে কি তোমার গর্ব হচ্ছে না বাবা? তোমার ছেলে কত বড় সাহসী হয়েছে। এখন থেকেই সে চোর ধরতে পারছে। তোমার ছেলে কেমন নিরপেক্ষ দেখ? তোমার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে আছে বাবা?···শোন বাবা, আমাদের সব এই জন্মেই শেষ হয়ে যায় না বাবা! একটা কাঠি দিয়ে কি চাকা তৈরি হয়? চাকা তৈরি হয়ে পথে বেরোতে অনেক বার জন্ম নিতে হয় বাবা! তুমি ভাবছ, এই কয়েদখানায় তুমি পড়ে থাকলে ওদের কি ভাবে চলবে, তাই না?···ধর্মই তোমার ধর্মপত্নীকে রক্ষা করবে বাবা! তোমার বউ তো কোন পাপ করেনি। তার কোন ক্ষতি হবে না···আমি যা বলেছি ভেবে দেখো বাবা!" এই কথা গুছিয়ে বলে ঐ কয়েদী উঠে পড়ল। তারপর কয়েদ-ঘরের দরজা খুলে গেল। সে বাইরে চলে গেল। পুল্লাইয়া ঐ ঘরেই বসে রইল। সকালে পুল্লাইয়াকেও ঐ ঘর থেকে বেরোতে হল। যতক্ষণ না আবার সে ফিরে এল ঐ ঘরে ততক্ষণ তার কানে ঐ কয়েদীর কথাই বাজছিল। সারারাত ঘুম না হওয়ায় তার চোখ লাল হয়েছিল। তখন আর তার ঘুমোনোর সুযোগ নেই। কাজ করতে বেরোতে হবে তাকে। কাজ করতে করতেও তার সব সময় ঐ কয়েদীর কথাই মনে পড়ছিল।

বিকেলে ফিরে এসে পুল্লাইয়া মনে মনে ঐ কয়েদীকে খুঁজল। অনেকক্ষণ তার কথা ভাবতে ভাবতে বসে রইল। কিন্তু সে এলো না। শেষে দরজায় যে জওয়ান যাতায়াত করছিল তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, "ওকে সকালেই ছেড়ে দিয়েছে।" শুনে পুল্লাইয়ার খুব কষ্ট হল। সে ভাবল, সকালেই তাকে আর একটু ভালভাবে দেখা উচিত ছিল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হতেই তার মনে নানা কথা জাগতে লাগল। এলোমেলো চিন্তাগুলো তার মগজে ঘুরপাক খেতে লাগল। এক ফালি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে সে তাকাল। ঝড় বইছে। উত্তর দিকের মেঘ কালো হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে আকাশটা কালো হয়ে গেল।

অন্ধকার ঘর। পুল্লাইয়ার আবার নতুন করে মনে পড়ল তার জীবনের ঘটনাগুলো ···বিয়ের আগে সে স্বপ্ন দেখেছিল ছেলের···তার স্বপ্নের ছেলে আর যে ছেলে তার

হয়েছে এই দুই ছেলের মধ্যে কত মিল।…মল্লুও বড় হবে।…তার চুলও কাঁধে পড়বে।… চারজনের মধ্যে তার নাম হবে।…কোন কিছুকেই সে ভয় পাবে না। লেঠেল হিসেবেই নাম করবে…এক কথার মানুষ হবে…জীবন গেলেও তার কথার নড়চড় হবে না… চোরদের ধরবে…তাইত আমার ছেলে তো চোরকে ধরে ফেলেছে।…জ্যোতিষী যে বলেছিল আমার ছেলের মত ছেলে কোটিতে একটি হয়! হয়েছে তো তাই। আমি যেমন ছেলে চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটি হয়েছে মল্লু। আমার মনের মতন ছেলে তো হয়েছে তাহলে আর আমি মন খারাপ করছি কেন?

পুল্লাইয়া যখন ছেলের কথা ভাবছিল তখনই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল নীলির মুখ। কত ঠাণ্ডা বউ…কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কি ভাবে সব বলল…একটুও ভয়ে কাঁপল না। মুখে কি তেজ ছিল…কাঠগড়ায় যখন উঠছিল তখন তাকে দেখে তো মনে হল ও কোন কথা বলতে পারবে না। অত লোকের মধ্যে লজ্জায় ভয়ে সে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকবে।

সেদিন রাত্রে তার পেটে এক মুঠো ভাতও গেল না। ভাত খাবার সময় পুল্লাইয়ার মনে হল তার বউ ছেলে মেয়ের পেটে কিছুই পড়েনি। মুখে ভাত তুলতে যাওয়ার সময় তার চোখ ফেটে জল আসছিল।

সেদিন রাত্রেও পুল্লাইয়ার চোখে ঘুম ছিল না। দুশ্চিন্তার পোকাগুলো তার মগজে কিলবিল করছিল। কয়েদঘরের কোণে সে যেন নিজেকেই শোনাতে লাগল, "আমার বউ-এর ছেলে, ঠিক কথাই বলেছে। সেই জন্যই তো ঐ লোকটা অতবড় আঘাত লাগলেও বেঁচে উঠেছে। আমি খারাপ হয়ে গেছি। খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে জুয়ো খেলেছি। আমি আগে কেমন ছিলাম, এখন একেবারে বদলে গেছি। একেবারে আগে যেমন ছিলাম সে রকম থাকলে আমার কি বউ ছেলেমেয়ে হত? এই বেশ হল। জেলই ভাল। আমার বউ আর ছেলে যা করেছে আমার ভালর জন্যই করেছে। আর চারজনের মত আমিও এখানে গায়ে গতরে খেটে কাজ শিখে নেব। আমাকে বাঁচতে তো হবে?"

পুল্লাইয়া আকাশের দিকে তাকাল। কোথায় আকাশ? শুধু তার চোখে পড়ছিল অনেকের চেহারা। সকলের সামনে ছিল ছেলের চেহারা। নিজের কথা ভেবে হাসতে থাকে সে। ছেলের জন্মের আগে সে ছেলে ছেলে বলে কি লাফান না লাফিয়েছিল। হওয়ার পর তার মনে হয়েছিল সে যা ভেবেছে তাই হয়েছে। সব সময় সে ছেলেকে কাছে রাখত। কত আদর করত তাকে। ভাবতে ভাবতে শুয়ে শুয়ে পুল্লাইয়া ছেলেকে চুমো খাওয়ার মত মেঝের উপরে চুমো খেতে লাগল। তার চোখের জলে সিমেন্টের মেঝে ভিজে গেল। দরজার গরাদের ওপার থেকে জওয়ান বলল, "এই কাঁদছ কেন? ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়।"

তাড়াতাড়ি লোহার দরজার কাছে গিয়ে পুল্লাইয়া বলল, "ঐ তো বন্দরের কাছেই

আমার ঘর। আমার ছেলেকে এনে একবার দেখাও না ভাই। ভগবান তোমার মঙ্গল করবে।"

"এই হৈ-চৈ করবে না। টের পেয়ে জেলর এলে কি হবে বুঝতে পারছ। যাও ঘুমোও।" বলে আর কোন কথা না শুনে জওয়ান পায়চারি করতে লাগল।

পুল্লাইয়া গরাদ ধরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

তেতাল্লিশ

কড়া রোদে নীলি ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেসন কোর্টের সামনের গাছতলায় বসেছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল তবু তার ডাক পড়ল না।

পেটে খিদের জ্বালা। কোলের মেয়েটা কাঁদছিল। এদের যে কি ভাবে পেট ভরাবে তাই ভেবে ভেবে নীলি মনে মনে ভগবানকে ডাকছিল। যাও বা একটা বাড়িতে কাজ পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কাজ করতে গেলে ঐ বাড়ির বড় গিন্নী বলল, "এখন নয়, এখন তোমার দিন এগিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় কেউ কি কাজ করতে পারে? বাচ্চা হওয়ার পরে এসো।" কিন্তু বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত কি খাবে! ছেলেটা যদি একটু বড় হত, কিছু একটা করতে পারত। আগের দিন রাত থেকে নীলির মনে নানা দুশ্চিন্তা দানা বাঁধছিল। রাতে এক ঘটি জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কোন কাজ করার শক্তি তার ছিল না। থেমে থেমে এক-পা এক-পা করে সে কোন রকমে কোর্টে এল। তার মাথা ঘুরছিল। চোখে সে সব কিছু ঝাপসা দেখছিল।

এমন সময় আসামীকে কোর্টে হাজির করা হল। জজসাহেবের কোন প্রশ্ন করার আগেই পুল্লাইয়া বলল, "এজ্ঞে, আমি যা বলব সত্য বলব। আপনারা দয়া করে আমার একটা কথা রাখুন। এমন কিছু বড় কথা নয়, ঐ আমার ছেলে মল্লু বাইরে গাছ তলায় আছে। ওকে একবার কোলে তুলে নিতে চাই। ওকে একটু আদর করব। ভগবান আপনাদের ভাল করবে।"

জজসাহেব তাতে রাজী হয়ে পুল্লাইয়াকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলল। জজসাহেব রাজী হওয়াতে পুল্লাইয়ার খুব আনন্দ হল। অন্য সময় হলে সে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলে হয়ত আসল ঘটনা বলা শুরু করত। কিন্তু তখন তার সব কথা তাড়াতাড়ি বলে দিতে ইচ্ছে করল। সে বলল, "পাইপ ধরে সব্বার শেষে আমি উঠেছিলাম। ঐ মালিকের হাতে বন্দুক ছিল। ওদের দিকে তাক্ করে গুলি চালাতে গেছিল। আমার মাথা ঘুরে গেল। ওদের গায়ে গুলি লাগলে তো ওরা মরে যাবে। জ্ঞান বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। কাছেই একটা কাঠ পড়ে ছিল। সেটা তুলে ওর মাথায় মেরেছিলাম। এমন সময় চারদিক থেকে চেঁচামেচি কানে এল। ধরা পড়ার ভয়ে চুরিটুরি না করে

পালিয়ে গেছি।"

"তোমার সঙ্গে এই দুজনই ছিল তো ?"

পুল্লাইয়া কোন জবাব দিল না।

জজ আবার প্রশ্ন করলে পুল্লাইয়া বলল, "এজ্ঞে আমাকে ক্ষমা করুন। এই কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।"

"সত্য কথা না বললে তোমার কাছে ছেলেকে এনে দেব কি করে ?"

পুল্লাইয়া মাথা নিচু করে ফেলল। তার মন ছটফট করতে লাগল। এমন সময় আন্নার গলা শোনা গেল, "আর ঢেকে কি হবে। সত্য চিরকাল ঢাকা থাকে না। আমরা তিনজনেই এই কাজ করেছি।"

আন্নার উপর পুল্লাইয়ার ভীষণ দুঃখ ও অভিমান হল। এতদিন মিথ্যাকে রক্ষা করতে তাকে কি কম কষ্ট পেতে হয়েছে!

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর মল্লুকে কোর্টে ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে সে "বাবা" বলে ডেকে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে অথবা দুঃখে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

তার বাবা প্রাণ ভরে ছেলেকে আদর করতে লাগল। সেও বাচ্চা ছেলের মতন হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে, "বাবা···আমার মল্লু···আমার নাম রেখেছিস বাবা···" তারপর আর তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। ছেলেকে কাছে পেয়ে অনেক কথা বলবে ভেবেছিল। মার কথামত চলার কথা বলবে ভেবেছিল সে। কিন্তু আর কোন কথাই তার বলা হল না। বাপ আর ছেলের এই কান্না যারা দেখল তাদেরও চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

আর বাপের কাছ থেকে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনা গেল না। পারা যাচ্ছিল না··· যতবার ছাড়ানো হল ততবার সে চিৎকার করে কেঁদে বাপের কাছে ছুটে যেতে লাগল। ছেলের ঐ কান্না শুনে নীলি তাড়াতাড়ি কোর্টের ভেতরে ঢুকল। ঢুকেই দেখল স্বামী কাঁদছে। সেই কান্না মাখা মুখে নীলি যেন তার স্বামীকে খুঁজে পেল—তার সেই নিষ্পাপ স্বামীকে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় নীলির পেটে খিদে ছিল না। ঠায় সে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। তার দু চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে নীলির মনে অতীতের কত স্মৃতি ভেসে উঠল। সেই প্রথম রাত্রির ঘটনা···তার মাথার সেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল,···তার মুখের কথাগুলোতে কত তেজ ছিল···কত মিষ্টি ছিল। যেদিন ছেলে হয়েছিল সেদিন এই মুখ কত উজ্জ্বল ছিল। কত আনন্দ ছিল এই মুখে।

ইন্‌সপেক্টর মল্লুকে বাইরে এনে নীলির হাতে দিয়ে বলল, "তোমার কর্তা তো সত্য কথা বলে দিয়েছে। আর তোমাকে এখানে বার বার আসতে হবে না।" এই কথার যে কি মানে তা বুঝতে না পেরে নীলি কি যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল এমন সময়

ইন্‌সপেক্টর বলল, "তিন-চার বছরের শাস্তি তো হবেই।" শুনেই নীলি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নীলি সেখান থেকে চলে যেতে যাবে এমন সময় মল্লু আবার "বাবা বাবা" বলে কান্না জুড়ে দিল। পেটের বাচ্চাটি নিয়ে, কোলে মেয়েকে রেখে, মল্লুকে ধরে নীলি পা টানতে টানতে বড় রাস্তায় পড়ল।

"ও মা, মা, ঐ দেখ, বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে···" বলে সে রাস্তায় বসে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে "বাবা" বলে আর্তনাদ করতে লাগল। রাস্তায় যারা যাতায়াত করছিল তারা মল্লুকে দেখে অবাক হল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না।

চার-পা এগোতেই নীলির সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে তার মন পেট সব যেন ভরে গিয়েছিল আনন্দে। তার পেট খিদের জ্বালায় জ্বলছিল। তার পায়ে একেবারে শক্তি ছিল না। চোখ ফেটে জল আসছিল তার। আবার চেষ্টা করল দুপা এগোনোর। না, পারল না সে। তার ঘর আরও অনেক দূরে। ঘরে যাবে কি? ঘরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো বাড়িওয়ালী ভাড়া চাইবে। ভাড়া না দিলে অনেক কথা শোনাবে। ঘরের জিনিস একটিও বের করতে দেবে না। ঘরে তালা লাগিয়ে চলে যেতে বলবে।

সন্ধ্যের সময় বহু লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি, বাস, রিক্সা ছুটে চলেছে। কিন্তু হাঁটতে পারছিল না নীলি। শুধু যে তার পেটে খিদে তাই নয়, ছেলেমেয়েদের পেটে খিদের জ্বালায় আগুন জ্বলছে। এমন কি যে বাচ্চাটি পেটে ছিল তারও ছিল রাক্ষুসে খিদে।

মনের জোরে আরও কয়েক পা এগোল নীলি। শেষে শিব মন্দিরের কাছে পথের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ডাইনে বাঁয়ে বহু ভিখিরীকে নীলি দেখতে পেল। ওরা বসে বসে ভিক্ষে করছে। ওদের সামনে পড়ছে চাল কলা আর পয়সা। নীলি দেখল পট্টবস্ত্র পরে বহু ভক্ত মন্দিরে যাচ্ছে···আশেপাশে গাড়ি রেখে, গাড়ি থেকে নেমে বহু ভক্ত মন্দিরে যাচ্ছে। নীলি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই বসে পড়ল। আশপাশের ভিখিরীরা বলে উঠল, "ওরে আর একটি এল।" দু-একটি ভিখিরীর মুখে বিরক্তির ভাব দেখা দিল।

নীলি জুবুথুবু হয়ে বসে বাচ্চাদের দিকে তাকাল। মল্লু তখনও কাঁদছিল। পেটের বাচ্চাটি "মাগো, ও মা" বলে যেন চেঁচামেচি আর ঘোরাঘুরি করছে।

এই মেয়েটা, বাপের বাড়িতে পেট ভরে খেতে পায়নি, কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু তার কিপ্‌টেমি ছিল না। যৌবনে হেলেদুলে, নেচে কুঁদে গান গেয়ে আর খেলা করে কাটিয়ে দিয়েছে। বিয়ের সময় লজ্জাবতী লতার মত গুটিয়ে বসে ছিল। বিয়ের পর এক একটা ব্যাপারে জেদী স্বামীর চোখ খুলে দিয়েছিল সে। বউ হয়ে সে সংসার গুছিয়ে পেতেছিল। কোনদিন সে কারও কাছে হাত পাতেনি। অভাবের দিনেও সে হাত উপুড় করেছে।

এতদিন তার হাত উপুড় হতেই অভ্যস্ত ছিল, হাত চিৎ হয়নি কারও কাছে। এহেন পবিত্র হাত…আজ…এই মুহূর্তে…ভিক্ষে চাওয়ার দিকে ঘুরছে। চিৎ করার সময় তার হাত কাঁপছিল। বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার হাত নেমে আসছিল। শেষে অনেক চেষ্টার পর তার হাত উপরের দিকে উঠে ভিক্ষে চাওয়ার মত হল। তার সেই চিৎকরা হাতে…দুচোখ বেয়ে মাত্র দু ফোঁটা অশ্রু পড়ল !!!